ভোরবেলার ভালবাসা

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
নববর্ষ ১৩৭০
এপ্রিল ১৯৬৩

প্রকাশিকা :
আরতি জানা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০৯

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

মুদ্রক :
জে ডি. প্রেস
মদনমোহন চৌধুরী
৫২/এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রীমতি শিলাবতী শূর

ও

শ্রীপ্রলয় শূর

স্নেহাস্পদেষু

এক

আমার এই জীবনটা কিরকম? কেমন করে শুরু হয়েছিল? এ কথা মনে করার চেষ্টা করল মানিক মিত্তির। আজকাল সে প্রায়ই পিছনে ফিরে গিয়ে নিজের জীবন, মা-বাবা, বন্ধুবান্ধব, দেশ ইত্যাদি রিমেক করে দেখে। অনেকটা যেন তার মাথার ভেতর নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিও রয়েছে। আর্ট ডিরেক্টর, কাঠের মিস্ত্রি, পেইণ্টার—সবই সে নিজেই। জীবনের এক একটা সময়ের সেট ফেলে সে। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক মানিক মিত্তির—তার মাথার ভেতর একবার সেট পড়লে—সে সেই সেটের সময়কার মানুষ হয়ে যায় পলকে—তা সে তার অফিসে নিজের ঘরে বসেই থাকুক—আর বম্বে মেলে গভীর রাতে ভুসোয়ালের ভেতর দিয়ে ট্রেন ছুটবার সময় সে জানলার পাশে বসেই ঢুলুক। এইভাবেই সে তার জীবনের এক এক সময়কার বিরাট সেট ফেলে—আর সেই সেটের লবকুশদের ওপর নিজেই চড়া ওয়াটের আলো ফেলে জীবনটাকে ফিরে বানিয়ে ফিরে ফিরে দেখে। আর শেষ পর্যন্ত নিজেকেই বিড় বিড় করে বলে—এই জীবনের মানে কি? এই জীবন লইয়া আমি কি করিব?

মানিক মিত্তির কোন দার্শনিক নয়। নয় সে কোন ভয়ঙ্কর সফল মানুষ। বরং বলা যায় একটুর জন্যে তার অনেক কিছুই হয়নি। আবার কোন হেরে যাওয়াকেই আজকাল তার হেরে যাওয়া বলে বোধ হয় না। মনে হয়—এমন তো খেলাতে থাকেই। মানে জীবনে। আবার কোন জিতে যাওয়াকেও তার জিতে যাওয়া বলে মনে হয় না। কেন না এমন তো জীবনে থাকেই। আসলে জীবন জিনিসটাই বড় আশ্চর্যের! কী বিশাল সারা রাত জুড়ে যাত্রাগান। রাত দশটায় ক্ল্যারিওনেট, ফ্লুট, হারমোনিয়াম, বেহালা সহযোগে মুখপাত। রাত একটায় তরবারির সঙ্ঘর্ষ। সাড়ে তিনটেয় দুর্গপ্রাকারে শত্রুসেনা। ভোর পাঁচটায় বিবেকের গান। আলো ফর্সা হতেই রানীর পদাঘাত। সময় মিলিয়ে আবহসঙ্গীত—ঝাঁঝরের ঝম্-ঝম্ঝমাঝম্।

মানিক মিত্তিরের মাথার ভেতর ফেলা কয়েকটি সেটের নমুনা নিচে দেওয়া হল। এর থেকে তার ভাবনা-চিন্তার ছুটোছুটি—জীবনের ধাঁচ বোঝা যাবে।

এইমাত্র দিল্লি থেকে বেড়াতে আসা দিদি, মাসিমা কলকাতা যাবার ট্রেনে উঠল। ট্রেন ছেড়ে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল যখন পার হচ্ছে—তখন দেখা গেল লাল মোরেম বিছানো প্ল্যাটফর্মে একখানা মেরুন রঙের রুমাল পড়ে আছে। আট বছরের ছেলেটি রুমাল কুড়িয়ে গন্ধ শুকলো। সুগন্ধী। সঙ্গে সঙ্গে কলেজে পড়া দিল্লির দিদির বুকের ওপরকার শাড়ির পাড়, জোড়া বেণীর সপাং করে পিঠের ওপর পড়া, ব্লাউজের কালচে বোতাম সব সব একসঙ্গে মাথার ভেতর দুলে উঠল। ছেলেটি প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েই দেখল, ভারত ছাড়ো-

ভারত ছাড়ো—স্লোগান দিতে দিতে তার দাদারা—দাদাদের বন্ধুরা মিছিল করে যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে অনেক খাকি। লাল পাগড়ি—

মফস্বলের একটা সিনেমা হলে পর্দা জুড়ে একজন নায়িকা গান গাইছে।

'জানি জানি তুমি যাবে চলে
জানি জানি'

কাননদেবী গাইছে আর চামড়ার স্যুটকেসে জামা-কাপড় তুলছে। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট। কাননদেবীর ঠোঁট আর চোখ ভীষণ কালো। ছেলেটি বসে গান শুনছে মন দিয়ে। কাননদেবীও দেখছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ খুব লজ্জায় পাশে বসা এক মহিলাকে বলল, মা একটা কথা বলব?

মহিলাও মন দিয়ে গান শুনছিলেন। পর্দায় চোখ রেখে বলল, কি?

তুমি রাগ করবে না তো মা?

বল না কি বলবি?

আমি কাননদেবীকে বিয়ে করব।

বেশ তো করিস।

ছবি ভাঙার পর মহিলার হাত ধরে ছেলেটি বেরিয়ে এসে দেখল, চারদিক অন্ধকার। রাস্তার আলোয় ঠুলি পরানো। আকাশে বহু উঁচু দিয়ে এরোপ্লেন যাচ্ছে। মাছির মত। বিজ বিজ বিজ—মত তার একটা ভনভনানি নিচে নেমে আসছে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই বছর ষোলর একটি ছেলে ল্যাডলি মিত্তিরের কেমিস্ট্রির বই থেকে ক্যাটালিটিক এজেণ্ট পড়ছিল। মলিবডেনাম। ৭৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এইসব। এমন সময় একজন আধবুড়ো লোক এসে বলল, কাল রাতে ঘরের দোর আটকাসনি? হাট করে খোলা রেখে ঘুমিয়েছিলি?

না তো বাবা—

নিশ্চয় খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওই ছাখ্—

ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেটি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সত্ত গোঁফ উঠছে। মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। চওড়া কাঁধের দুদিক স্যাণ্ডো গেঞ্জিতে ঢাকা। দেখল, একটা ভাঙা ট্রাঙ্ক। আর কিছু কাগজ কুচি কুচি করে ছেঁড়া।

সেই ছেলেটির বাবা কুচি কুচি কাগজগুলো কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, আমাদের সব্বোনাশ হয়ে গেছে। কিছু না পেয়ে চোর শেষে রাগে রাগে

আমাদের সবার রেফিউজি সার্টিফিকেট এভাবে ছিঁড়ে রেখে গেছে। আমরা কোন লোন পাব না। কোন জমিও পাব না।

শীতকালের বেলা দুটো। সাইকেল রিকশয় একজন মাঝ বয়সী লোক একটা নির্জন পিচ রাস্তা দিয়ে এসে একটা গেটের সামনে নামল। তার পেছনে ভৈরব নদী। ডান হাতে বড় মসজিদ। সিভিল সার্জেনের বাড়ি। কাঠবাদাম আর হরিতকী গাছের মাথা ঘাড় না হেলালে দেখা যায় না। গেটের ভেতরে বড় লাল বাড়ির মাথায় লেখা—KZS.

দেখেই সে মনে মনে বলে উঠল খুলনা জিলা স্কুল—

এল প্যাটার্নের লম্বা বাড়ির পয়লা ঘরে ক্লাস হচ্ছিল। একজন মাষ্টারমশাই ক্লাস নিচ্ছেন। মাস্টারমশায়ের মাথার পেছনের দেওয়ালে ছবিতে মহম্মদ আলি জিন্না।

মাঝবয়সী লোকটি মাস্টারমশায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, মে আই কাম ইন স্যার ?

স্যার অবাক হয়ে তাকাল। আপনি ?

মাঝবয়সী লোকটি অবাক হল। স্যার—আমি রোল টুয়েলভ্—ক্লাস থ্রি—

কবে ভর্তি হয়েছেন আপনি ?

এইটথ জানুয়ারি। নাইনটিন ফর্টি।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠল। মাস্টারমশাই বললেন, আজ কত তারিখ ?

তেইশে জুলাই স্যার—

তেইশে জুলাই নাইনটিন এইট্টি! আপনি চল্লিশ বছর লেট!!—বলতে বলতে মাস্টারমশাই উঠে দাঁড়ালেন।

মাঝবয়সী লোকটি মরীয়া হয়ে বলল, দেখুন স্যার—ওই তো থার্ড বেঞ্চে খুদে লিখেছিলাম—এম এম। ওখানটায় আমি বসি—

কী লেখা আছে -

এম এম মানে—মানিক মিত্তির স্যার—আমিই লিখেছি—

ইমপসিবল্!

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল মাঝবয়সী লোকটির। চারদিক অন্ধকার। শুধু টেলিপ্রিন্টারের ঘোড়া খটাখট ছুটে চলেছে। চারদিক অন্ধকার। শুধু টেবিলে আলো জলছে। টেবিল ল্যাম্পের ফোকাস। লোডারের হাতে গরমা গরম কাগজ পাঠিয়েছে প্রিন্টার। সই করুন—

মাঝবয়সী লোকটি দেখল সাব-এডিটররা সবাই টেবিলজোড়া দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিউজরুম শুনশান অন্ধকার। পয়লা পাতা আর পাঁচের পাতা

খুঁটিয়ে দেখল লোকটি। দেখল সম্পাদকের নাম আর প্রিণ্টার্স লাইন ঠিক ঠিক ছাপা হয়েছে কিনা। তারপর তারিখ দেখল—২৫শে জুলাই। আনন্দবাজার পত্রিকা। লিখল—প্লিজ প্রিণ্ট আফটার নেসেসারি কারেকশন। বাঁধা গৎ। তারপর সই করল—এম এম। মানিক মিত্তির। এবার ঝড়ের বেগে কাগজ ছাপা শুরু হয়ে যাবে—

মানিক মিত্তিরের মাথার ভেতর পর পর ভেসে ওঠা সব সেট গুলিয়ে গেল। সে তার অফিসের হলঘরের মুখোমুখি চার-পাঁচখানা ঘরের একখানায় একা বসে। যেসব কারণে ভাবনায় ডুবে থাকা মানুষের চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায়—সে সব কারণ এখন মানিক মিত্তিরকে ছুঁতে পারার কথা নয়। আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল, বসুমতী মিলিয়ে প্রায় তিরিশ বছর নিউজপ্রিণ্টের ভেতর বাস করার পর বছর দুই হল মানিক মিত্তিরকে এই দৈনিক সুপ্রভাতে আনা হয়েছে। আচ্ছা এসব কথা থাক এখন। কেন আনা হয়েছে? মানিক মিত্তির কেন আসে? আসার পর কী হল—তা তো পরেও বলা যাবে। বরং বলি—কী করে মানিক মিত্তির তার মাথার ভেতর ফেলা সেট থেকে এইমাত্র বেরিয়ে পড়ল। কিংবা বলা যায় অফিসের হলঘরের মুখোমুখি নিজের অ্যালকোভে বসা মানিক মিত্র তার মাথার ভেতরে ফেলা সেটের সময়কার মানিক থেকে কী করে একেবারে এখনকার মানিকে চলে এল।

একই ছাদের নিচে দৈনিক সুপ্রভাতের সাহের বড় ভাই দ্য ডেইলি হেরাণ্ডে সিনেমা নিয়ে লেখে ইন্দুলেখা যাচ্ছিল। অ্যাপ্রেণ্টিস-ট্রেনি। কী বা বয়স। গলাটা মরালের মতই। মানিক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার কালকের লেখাটা ভাল লাগল—

ইন্দুলেখা হেসে দাঁড়াল। খবরের কাগজে দুই রকমের লোক থাকে। একদল যারা কাগজে কাজ করে কিন্তু কোনদিন কিছু পড়ে না। আরেকদল কাজ করে যারা, কাগজে যা বেরোয় তাই পড়ে। মানিক মিত্তির শেষের দলে। তাছাড়া নতুন ঢুকেছে—উৎসাহ দেওয়া দরকার।

ভাল লেগেছে?

খুব ভাল। বলে উৎসাহ দিতে গিয়ে মানিক নিজেই উৎসাহিত হয়ে পড়ল। আজ তোমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে—

যেদিন দেখা হয়—সেদিনই তো এ কথা বলেন।

বলেছি নাকি! তা সুন্দর দেখালে বলব না?

রোজ তো সুন্দর দেখাতে পারে না। আমি জানি আমি কেমন দেখতে—

তুমি বেশ সুন্দর—

ইন্দুলেখা প্রেসে যাচ্ছিল। যেতে যেতে হেসে বলল, আজও তো ছাতা আনেননি নিশ্চয়—

হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?

কাল দেখলাম অফিস থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিতে পড়ে ভিজছেন। অমন ভিজলে অসুখে পড়বেন কিন্তু।

মানিক মিত্তির ইন্দুলেখাকে ডেকে দাঁড় করাল ফের। শোন, শোন। আমাদের অমন ভেজা অভ্যেস আছে—বুঝলে!

ছিল হয়ত একসময়। কিন্তু এখন তো—বলে কথা শেষ করল না ইন্দুলেখা। মানিক মিত্তির হলঘরে একগাদা চেয়ার টেবিলের সামনে চুপ করে গেল। ইন্দুলেখা প্রেসের দিকে বাঁক নিল। লম্বা পিঠে লম্বাবেণী। ফর্সা মুখে ঘন কালো দুই চোখ—এক এক সময় এমন টানে—

টয়লেটে গিয়ে আয়নায় মুখ মাথা দেখল মানিক মিত্তির। মুখখানা গোল এবং ভারি। মাথায় চুলের গোড়ায় গোড়ায় আগুন ধরে ওঠার মত করে সাদা। আমি যে ইন্দুলেখার চেয়ে অনেক বড়। আর এও তো সত্যি ইন্দুলেখাকে আমার সুন্দর লাগে। তাই বলে—ও মনে করিয়ে দেবে?—আমার এই বয়সে আর বৃষ্টি ভেজা সাজে না? ইংরিজির তাজা এম. এ। মানে বড়জোর তেইশ-চব্বিশ। আমার ছোটছেলে সৌম্যর চেয়েও ছোট। আঃ! আমি কতকাল আগে তেইশ-চব্বিশ ছিলাম। তখন যদি আসতে ইন্দুলেখা—তাহলে তুমি কিছুতেই বিনা ছাতায় ভিজে যাওয়ার কথা তুলতে পারতে না। পারতে না কথা বলতে বলতে প্রেসে চলে যেতে। ও হরি! আমার তেইশ-চব্বিশে তো ইন্দুলেখা তুমি পৃথিবীতেই আসনি।

এরকম আরও কিছু কথা মানিক মিত্তিরের মনের ভেতরে বিদ্যুৎ হয়ে খেলে গেল। আর তারপরই সব ভুলে গিয়ে সে তার নিজের কাজ নিয়ে পড়ল।

পাঠকের মতামত। আশি বছর বয়স এখন দৈনিক সুপ্রভাতের। বহু পুরনো পুরনো পাঠক করিমগঞ্জ, শিয়াখালা, ছাতনা, আদ্রা থেকে চিঠি লিখেছে। কাগজের দাম যা বাড়াইয়াছেন—তাহাতে স্থির করিলাম সুপ্রভাত ছাড়িয়া দিব। আবার একজন লিখেছে—বনপাশ বাজার থেকে গুসকরা যাবার রাস্তা এখুনি না সারালে বাস বন্ধ হয়ে যাবে। একখানা চিঠিতে কিডনির জন্যে আবেদন। চেতলার সবজিবাগান লেন থেকে এক প্রেমিকের চিঠি—সাগোয়া দেবকান্ত বকসি লেনের বাসন্তীকে সাবধান করা দরকার। সে না জেনেশুনে পাড়ারই মহা চালিয়াৎ অশোকের সঙ্গে খুব মিশছে। এরপর অশোক যখন সর্বনাশ করবে তখন বাসন্তীর আর ফিরে আসার কোন পথ থাকবে না। ইতি—শুভানুধ্যায়ী।

মানিক মিত্তিরের বুঝতে কোন অসুবিধাই হল না—শুভানুধ্যায়ী স্বয়ং দেবকান্ত বকসি লেনের বাসন্তীর একজন মহাপ্রেমিক। কিন্তু এ চিঠি কি ছাপতে

দেওয়া যায় ? শুভামুধ্যায়ীর ইচ্ছা—তার চিঠি ছাপা হলে কাগজ থেকে তো পড়ে বাসন্তী যদি এখনও সাবধান হয়।

দোতলায় ঢুকবার মুখে বোনাস বাড়ানোর দাবিতে রিলে অনশনের কয়েকজন সারা দিনরাত শতরঞ্চি পেতে শুয়ে। মুখ তুলতেই দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার। সাংবাদিক অসাংবাদিক ঐক্যই জয়ের চাবিকাঠি। শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। মালিক তুমি জবাব দাও—বেলগাছিয়ার বস্তি কেন বিক্রি হচ্ছে না। বকেয়া টাকার পাই পয়সা হিসাব চাই—হিসাব চাই।

অবাক হয় মানিক মিত্তির। এরা কাগজেও আছে—আবার বস্তিতেও আছে ? বস্তির ব্যাপারটা তো তার জানাই ছিল না। হয়ত সস্তায় বস্তি কিনে সেখানে হাই-রাইজ তৈরির মতলব আছে।

এমন সময় পার্সোনেল অফিসার দেবেন সরকার এসে উঁকি দিল। পড়লাম গল্পটা—

কোন গল্পটা ?

এ মাসের প্রসাদে যেটা লিখেছেন। সবই মিডিল এজ প্রবলেম।

ও কথায় না গিয়ে মানিক মিত্তির জানতে চাইল, শেষে বোনাস নিয়ে কি লকআউট হবে ?

হলে হবে। আপনার তাতে কি ? মরব তো আমরা। অফিসই আমাদের ভরসা।

কী বলছেন ? লকআউট হলে খাব কি ?

আপনার তো কলম রয়েছে। চুটিয়ে গল্প উপন্যাস লিখবেন। আপনার তো রেপুটেশন আছে।

সব সময় কি লেখা যায় ?—না, লেখা আসে ? এই তো বললেন, গল্পটায় মিডল এজের প্রবলেম এসে গেছে।

ভালই লেগেছে আমার। তবে গল্পটা পড়ে মনে হল ; মাঝবয়সে পৌছে আপনার ক্ষোভ এসেছে—কেন আগের মত—কেন সেই যৌবনের মত সবকিছু হচ্ছে না। আসলে আর্টিস্ট বলে এই বয়স হয়ে যাওয়াটা আপনি মানতে পারছেন না—মানতে কষ্ট হচ্ছে—কিছুতেই স্বীকার করতে পারছেন না—তারই কনফেশন সারাটা গল্প জুড়ে মানিকবাবু।

মানিক মিত্তির পার্সোনেল অফিসারের চোখে তাকাল। ম্যানেজমেন্টের লোক। বছর তিরিশেক আগে এদিক ওদিকে নাকি কিছু গল্প লিখেছিলেন। তারপর আর লেখা হয়নি কাজে ঢুকে গিয়ে। মানিক মিত্তির মুখে বলল, হবেও বা—, বলে একটু থেমে বেশ অধীর হয়েই সে জানতে চাইল, আচ্ছা—আপনি তো পার্সোনেল ম্যানেজার—আপনিই জানবেন—বলুন তো এরা কি আর ব্যবসা করতে চায় না ?

আমিও বুঝে উঠতে পারছি না মানিকবাবু। এত দিনকার দুখানা ডেইলি —এমন গোল্ড মাইন – অথচ অবহেলায় অবহেলায় কোন্ অবস্থায় ঠেলে এনে ফেলেছে সব।

চাকরি জীবনের শেষে এসে যে এমন অবস্থায় পড়ব—তা ভাবতে পারিনি কোনদিন। এখন কোথায় হাসতে হাসতে গুডবাই বলে বাড়ি চলে যাব তা না ঠিক এইসময় এখন আনসার্টেনটি—পি এফ, গ্রাচুইটি এসব তো শুনছি বিশ বাঁও জলে—

সব বড় ইণ্ডাস্ট্রিতেই এই অবস্থা এখন। দেখুন জুট, টেক্সটাইল সব জায়গায় এই এক হাল। আপনার তো নবনীতার সঙ্গে আলাপ আছে। শুনি আপনার লেখাও ওর পছন্দ। ওকে কোয়েশ্চেন করলেই তো সব জানতে পারবেন মানিকবাবু—

বলতে বলতে পার্সোনেল ম্যানেজার তার ঘরের দিকে চলে গেল। আর ঠিক তখনই ইন্দুলেখাও ফিরে আসছিল প্রেস থেকে। ওর হাঁটায় একটা গ্রেস আছে। আজকাল তাকিয়ে তাকিয়ে এই সবই দেখতে ইচ্ছে করে মানিকের। অফিসের চেহারাটা অনেকটা শোকসভার। চালু দুটো ডেইলিকে রোজ কম ছেপে—খারাপ ছেপে—দেরিতে ছেপে – যতটা পারা যায় কোথাও না পাঠিয়ে—গলা টিপে মারার আয়োজন চলছে। এর ভেতর কার লিখতে উৎসাহ থাকে। নেহাত বাঙালী অনেকদিন ধরে এদুটো কাগজ পড়ে বলেই—আর সুপ্রভাত ছাড়া অন্য কাগজ পড়ব না বলে কিছু পাগল বাঙালী থাকায় বারোতলা এই পালচৌধুরী হাউস এখনও ধসে পড়েনি। আর আশ্চর্য। লক্ষ্মী মানে যাকে বলে বিজ্ঞাপন তার আসারও কামাই নেই।

কাগজ হবে লাউডগার মত। রোজই লকলক করে বাড়বে। এগোবে। তা নয়—এখানে এ যেন রোজ রাতে ছাগল এসে মুড়িয়ে খেয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এখানে মানিক মিত্তির তার মনের মত করে লিখতে পারে না। লেখা আসে না।

পালচৌধুরী হাউসের মেয়ে নবনীতা শ্বশুরবাড়ি থেকে রোজ এই শোকসভায় আসে। ফুলহাতার ব্লাউজ গায়ে। ব্রোকেড লাগানো শাড়ি পরে। প্রেস, পি টি এস, রিপোর্টার নিয়ে সারাদিন খাটে। শোকসভাকে সে আলো ঝলমলে বিয়ে বাড়ি করে তুলতে চায়। দূর থেকে নিজের চেয়ারে বসে সব দেখতে পায় মানিক মিত্তির। নিজের অ্যালকোভ থেকে। মাঝে মধ্যে তারও ডাক পড়ে। ডাক পেয়ে ওর ঘরে গিয়ে বুঝতে পারে নবনীতা অথৈ জলে। সে যে এগিয়ে গিয়ে কাজে আসবে কোন – তারও বিশেষ উপায় নেই। কেননা কাজে আসতে গেলে আরও অনেকগুলো জিনিসের দরকার পড়ে।

ইংরাজি সানডে ম্যাগাজিনের রিপোর্টার সুসান আসছে। তামিল-খ্রীষ্টান। শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ট্রাউজার – সবই পরে। আবার বাঙালী মেয়েদের

মত পায়ে পায়জোড়াও থাকে। তাই হাঁটার সময় নিয়মিত ঝনাৎ ঝনাৎ। আমার মেয়ে দেখতে এত ভাল লাগে কেন? সেদিন এক মেথরানিকে দেখলাম। রাস্তার মোড়ে বাঁক ঘুরছে। হাতে ঝাঁটা। না তাকিয়ে পারিনি। ভগবান এই যে একটা খেলা খেলে রেখে গেছে –

দূরে রিপোর্টার্স টেবিলে দুটি তাজা যুবক খুব মন দিয়ে কপি লিখছে। তারপর জ্যোতিবাবু আরও বলেন—নিশ্চয় এরকম কিছু।

সুসান মালিকের ঘরের সামনেটা পার হচ্ছিল। হয়ত তানঝিভরম্ কিংবা প্রপার মাদ্রাজের মেয়ে। এদিককার গালে অপূর্ব কয়েকটি মাদ্রাজী ব্রন।

আ:! কতকাল কোন বড় গল্প লিখিনা। লিখতে লিখতে তার ভেতর জমে যাওয়া হয় না কতদিন।

দুই

তুমি অত হাসছ কেন? এতবড় মেয়ে হয়েছ—বুঝতে পার না? যোগমায়া কলেজে তেতলায় চৌদ্দ নম্বর ঘরে অনার্সের ইকনোমিক হিস্ট্রির ক্লাস। মিঠু কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না। কিন্তু ভোরবেলা একঘর স্টুডেণ্টের সামনে প্রফেসর জে. কে তাকে যে এমন কঠিন করে দাবড়াবে তা ভাবতে পারেনি মিঠু। তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কোনরকমে মাথা নিচু করে সে সিটে গিয়ে বসল। স্রেফ শম্পার জন্যেই তার এই অবস্থা। ও দিব্যি সময়মত চুপ করে গেছে। হাসির কথাটি বলে। কিন্তু একবার হাসি এলে মিঠু কিছুতেই তা চাপতে পারে না।

প্রফেসর জয়ন্ত কর রীতিমত ভাল পড়ান। গম্ভীর হয়েই পড়ান। আজও পড়িয়ে কারও দিকে না তাকিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন। এটা ছিল তাঁর ভোরের দিকের ক্লাস।

আবার বেলা সাড়ে ন'টায় জয়ন্ত কর টিউটোরিয়াল নেবেন। স্পেশাল ক্লাস। জনা পাঁচেককে নিয়ে। ছোট্ট ন'নম্বর ঘরটায়। মিঠু মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে সিটে এসে বসল। বসে দেখল জে. কে উঠে গিয়ে দরজায় খিল দিচ্ছেন।—আর ক্লাসে স্টুডেণ্ট বলতে, শুধু সে একাই আছে। একটু অবাকই লাগল মিঠুর। জয়ন্ত কর দরজায় খিল দিয়ে সোজা ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কী যেন হল। মিঠু বেশ ভয় পেয়েই উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিন স্যার –

না। খুলব না—

এমন গলা তো জয়ন্ত করের নয়। মিঠুর কানে এ গলা কেমন কাঁপা কাঁপা লাগল। ধুতি পাঞ্জাবিতে মানুষটি যতই গম্ভীর হতে চান না কেন—যতই রাশভারি ভাবটা আনুন না কেন—বড়জোর বছর তিরিশ বয়স হবে স্যারের।

এবার মিঠু বলল, দরজা খুলে দিন—নয়ত আমি চ্যাচাব। তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পার। আমার কিছু যায় আসে না—বলে জয়ন্ত কর চেয়ারে বসে পড়ল ধপ করে। মিঠু আরও অবাক হল। কেমন যেন ক্লান্ত। নিরাশ। মাথা নিচু করে টেবিলে রাখল স্যার।

মিঠু সোজা উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলল। তারপর ক্লাস থেকে গট গট করে বেরিয়ে এল। স্যার তখনও টেবিলে মাথা দিয়ে বসে। যেন কত ক্লান্ত। বেরিয়ে এসে মিঠু দেখল, বৃষ্টিতে কলেজের সামনে ছাতা মাথায় ফুচকাওয়ালা। লোকটা তার চেনা। টাকায় পাঁচটা দেয় তাকে।

আরও একটা ক্লাস ছিল মিঠুর। তাতে না গিয়ে সোজা বাড়ি চলে এল। ট্রাম লাইন। বাসরুট। মিনিবাসের হর্ন। অটোদের নৌকোর মত ভেসে যাওয়া। মিঠুর মনের ভেতর চশমা চোখে জয়ন্ত করের মুখখানা জলছবি হয়ে উঠছিল। আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক এই পৌনে এগারটা নাগাদ মিঠুদের বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। দাদা অফিসে চলে যায়। বাবা পাড়ার মোড়ে কানাইয়ের চা দোকানে গিয়ে বসে। ফাঁকা বাড়ি। মা ছবি থেকে তাকিয়ে আছে। কোন্ এক বিয়ের গ্রুপ ফটো থেকে মায়ের এ-ছবিটা বড় করা হয়েছে।

বইখাতা রেখে মিঠু বহুদিন পরে মায়ের ছবির অ্যালবামটা খুলল। কলেজে ন' নম্বর ঘরে জয়ন্ত করের ক্লাসটা আজ কেমন অদ্ভুতভাবে একদম হলই না—স্যারই বা অমন বেপরোয়া গলায় কথা বলেই চুপসে গেলেন কেন? অমন তো নয় জয়ন্ত কর। বরং তাকে বেচাল দেখলেই স্যার দাবড়াতেন। বেশ কঠিন করেই। সেই মানুষটা কেমন হেরে যাওয়া ভঙ্গিতে টেবিলে মাথা দিয়ে চুপ করে গেলেন। আশ্চর্য! একদম ধাঁধা।

এই পৃথিবীতে সে যতই বড় হয়ে উঠছে—ততই কোথাও না কোথাও তার মনে হবেই—আমার কোন আশ্রয় নেই—মাথায় কোন শেড্ নেই। আর যখনই এমন হয় মনটা—তখন মিঠু একা একা মায়ের ছবির অ্যালবাম খোলে।

মা বিয়ের আগে স্কুলে পড়াত। বিয়ের পর আর পড়ায়নি গায়ে সুতীর ব্লাউজ। লাইন টানা। একখানা ছবিতে মায়ের পাশে দাদা। চোখে রোদ চশমা। এপাশে মিঠু। পায়ে মোজা দিয়ে সু। পরনে ফ্রক। হাঁটুর মালাইচাকি রীতিমত কালো। কেমন ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে ভয় দেখা দিলেই মিঠু এই ছবিগুলোর ভেতর নিজের জন্যে ছায়া খুঁজে বের করতে চায়। পরে সে ভেবে দেখেছে—এই সব ছবির মা যখন বেঁচে ছিল—তখন মিঠু কোন ভয় পেত না।

পরদিন কলেজে গিয়ে একটা খবর শুনে মিঠু অবাক। জয়ন্ত কর স্যার কলেজে এসেই রিজাইন দিয়ে চলে গেছেন। শুনেই প্রথম মিঠুর মনে পড়ল—আগের দিন সকালে ছোট্ট ন' নম্বর ঘরে স্পেশাল ক্লাসের কথা। টেবিলে মাথা

দিয়ে জয়ন্ত করের বসে পড়া। এই আচমকা রিজাইনের কথা তাকে ভেতরে ভেতরে নাড়া দিলেও জয়ন্ত করের অমন দরজা আটকে দাঁড়ানো সে প্রাণের বন্ধু শম্পাকেও বলল না।

তার একবার মনে হল – তবে কি আমার জন্যেও কেউ মরীয়া হয়ে পড়ে? আমি তো এমন কিছু সুন্দরী নয়। আর আমি তো জয়ন্ত স্যারের বকুনিই খেতাম শুধু। কোনদিন তিনি তো আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেননি। তাহলে কি আমায় দেখে চোরা টান হত ওঁর বুকের ভেতর? সেই টান চাপা দিতেই অমন রাগ রাগ ব্যবহার করতেন স্যার? নিজে ধরা পড়ে গিয়ে ন' নম্বর ঘরে একই সঙ্গে মরীয়া আর হতাশ হয়ে পড়ে ছিলেন? তাই সামাল দিতেই রিজাইন করলেন?

এসব ভেবে সারাদিন তার মনের ভেতরটা ভারি হয়ে থাকল। বারবার চোখ ফেটে জল আসতে চাইছিল। একবার জয়ন্ত করের চশমা চোখে মুখটাও ভেসে উঠল। তার মন বারবার বলল, স্যার যদি সেইভাবে কখনও বলতেন - আমি অন্তত মন দিয়ে ওঁর কথা শুনতাম। কোন অপমান করতাম না। ভয়ে, আতঙ্কে, হতাশায় মানুষটার ভালবাসার কথাই বলা হল না। ভালবাসা কী অদ্ভুত জিনিস। মানুষ একা একা ভয়ঙ্কর সব সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। অথচ আমি এর কিছুই জানতাম না। আমার তো কিছুই হয়নি। হয়নি বলেই জয়ন্ত স্যারের চেয়ে তার নিজেকেই যেন বেশি অভাগা বলে মনে হতে লাগল।

এরকম হবার আগে অবধি মিঠু ছিল ডাকাবুকো। হাসিতে রীতিমত সচ্ছল। কথায় কথায় দৌড়ঝাঁপ। স্কুলে শেখা পি টি সে কলেজে উঠেও বাড়িতে ভোরবেলা প্র্যাকটিস করে আসছিল। ছাইরঙয়ের শাড়ি ছাড়া আর যে কোন রঙই তাকে মানায়। পায়ের জুতো নিয়ে সব সময়ই একটা খুঁতখুঁতি থাকায় সে রাসবিহারীতে গিয়ে ক্যানসিতে পছন্দ করে জুতো কেনে। জয়ন্ত স্যার অমন হঠাৎ চলে যাওয়ায় সে একা একাই নিজের কাছে থাকতে লাগল। কারও কাছে তার কিছু বলার ইচ্ছেই হল না। দাদা অফিস যাবার সময় তার তৈরি টিফিন নিয়ে যায়। অফিস থেকে ফিরেই পাড়ার ক্লাবে ক্যারাম পিটতে যাবে। পোর্টেবেল টি-ভি'টা সব সময় সঙ্গী হতে পারে না মিঠুর।

মা চলে গিয়ে বাড়িটা কেমন নির্জন হয়ে গেছে ক'বছরে। মিঠু যেবার স্কুলফাইনালে বসে সেবার একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। বাবার রিটায়ার— আর মায়ের কিডনি ফেল। রিটায়ার করে বাবা পাকাপাকি চলে গেল ব্রিজ খেলার ক্লাবে। নাওয়া খাওয়ারও সময় পায় না বাবা। তাসে তার এত বন্ধু। আর মা একদম চলে গেল। তখন থেকেই মিঠু প্রেসারকুকারে গ্যাস জ্বালিয়ে বাবা আর দাদার জন্যে ডাল রান্না করে। দাদার টিফিন বানায়। কারিপাতা যোগাড় হলে হিং আর বাদাম ভিজিয়ে রেখে কোন কোনদিন সুজি দিয়ে উপমা

বানায়। কিংবা কিসমিস দিয়ে পেঁপের ডালনা। সামান্য জিরে, হলুদ আর ঝাল দিয়ে। একটু আলু দিলে তরকারিটা জমে।

এসব রান্না সে মাকে একসময় রাঁধতে দেখেছে। জয়ন্ত স্যার আচমকা চলে যাওয়ার পর মিঠু ভীষণ ঘরকুনো হয়ে পড়ল। কথায় কথায় সে আর হাসিতে ভেঙে পড়তে পারে না শম্পাদের সঙ্গে। এক ধরনের চাপা যন্ত্রণায় সে মনে মনে আনন্দ পায়। অথচ জানে না এ যন্ত্রণা কিসের? অজান্তে কখন তার চোখে জল আসে।

বিকেলে অভ্যেসবশে গা ধোয়। চুল বাঁধে। বাবা সওয়া চারটে বাজলেই কানাইয়ের দোকানের চা খেতে ছুটবে। মিঠু কতদিন বলেছে, এস বাবা—আমি আর তুমি একসঙ্গে চা খাই—আমি বানাব।

নারে! তুই একা খা। নয়ত সন্তু অফিস থেকে ফিরলে চা চাইবে—তখন তার সঙ্গে খাস—

কেন? তুমি আমার সঙ্গে চা খেতে পার না বাবা?

তোর চা তোর মায়ের মতই হয় না—

মায়ের মত পারব কি করে! কানাইয়ের চা মায়ের মত হয় বুঝি?

না। তাও হয় না। ওখানে আমাদের ব্রিজ খেলার ক'জন চা খেতে আসে। তাদের সঙ্গে চা খেয়ে দুর দুর হাঁটতে যাই—শরীরটা তো ঠিক রাখতে হবে। তোর এখনও বিয়ে বাকি। সন্তুর জন্যে মেয়ে দেখতে হবে।

দাদার বিয়ে দাও। আমার বিয়ের দরকার নেই। আমি বিয়ে করব না।

তা হয় নাকি মিঠু।

খুব হয়। আমি যখন বিয়ে করার তখন করব। তুমি ওই রিটায়ার বুড়োদের সঙ্গে গিয়ে চা খাওয়াটা ছাড়।

দূর বোকা! আমিও তো বুড়ো। আমিও তো রিটায়ার করেছি।

তুমি তো বাবা সেদিন রিটায়ার করেছ। কাঁচ রিটায়ার্ড!

আর কথা না বাড়িয়ে অমিয় পালিত বেরিয়ে পড়েছেন। তার তাসের বন্ধুরা কানাইয়ের দোকানে চারটে বাজলেই জড়ো হয়। এক কাপ করে চা। তারপর সবাই মিলে এপাড়া ওপাড়া করে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে আগের দিনের খেলার ওঠাপড়া নিয়ে জোর তর্ক জমে ওঠে। কন্ট্রাক্ট ব্রিজের কূটকচালি চলতে থাকে মুখে মুখে। আর এইভাবে মাইল চার-পাঁচ হেঁটে অমিয় পালিতের বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে উতরে যায়। কোন কোনদিন সাড়ে সাতটাও বাজে।

বাবার ওপর মিঠুর একটা চাপা রাগ আছে। বাবা বুড়ো নয়। কিন্তু মা আন্দাজে বেশ বড়ই বাবা। বাবা যেন কেমন। মিঠুর এক এক সময় মনে হয়—বাবা মায়ের ওপর তেমন মনোযোগ দেয়নি। ছোট থেকেই সে দেখে

এসেছে অফিস আর তাস – এই দুই হল গিয়ে বাবার ধ্যান আর জ্ঞান। সেই কবে একবার সবাই মিলে পুরীতে গিয়েছিল। বাবার বন্ধু দীনেশ কাকা কোণারকের ব্যাকগ্রাউণ্ডে মায়ের একখানা ছবি তুলেছিলেন। ক্যামেরা বাগিয়ে। দাদার চোখে রোদচশমা। বাবা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবারও জলে নামেনি। মা, দীনেশকাকা, আমি, দাদা – আমরা সবাই গলা জল অবধি নামি। মা অফিসের হলিডে হোমের ডেকচিতে খিচুড়ি রেঁধেছিল। বাইরে সমুদ্রের বুকে বৃষ্টি তখন। কী তার গন্ধ। এখনও যেন সে গন্ধ মিঠু পায়। মায়ের রান্নার সময়টা সে আর দীনেশকাকা আগাগোড়া এটা ওটা এগিয়ে দিয়েছিল। দীনেশকাকা তো কোত্থেকে খানিক মাখন যোগাড় করে এনেছিল। বাবা সারাক্ষণ হলিডে হোমের রেডিওতে কলকাতা ধরার চেষ্টা করছিল। চোখ বুজলেই সব দেখতে পায় মিঠু। রেডিওতে কলকাতা আসছিল না। আসছিল স্রেফ ঘড়ঘড়।

একদিন মায়ের ছবির অ্যালবামের পাশে বড় রুমালে বাঁধা একটা পুঁটুলি পেল মিঠু। তার পাশেই তিন চারখানা বই। কী খেয়াল হতে পুঁটুলি খুলে দেখল -- মায়ের হাতে লেখা কয়েকখানা চিঠি। মায়ের হাতে লেখা। ডাকে দেওয়া হয়নি। চিঠির কাগজ হলুদ হয়ে এসেছে। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে কালো কালিতে মায়ের হাতের লেখা —

মান্যবরেষু,

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। যা পরিচয় তাহা আপনার লেখা বই পড়িয়াই। গতকাল সকাল হইতে আপনার 'স্মৃতি বিস্মৃতির সৌরভ' উপন্যাসখানি পড়িতেছি। খানিক পড়ি আর বই বন্ধ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকি। কী এক অজানা ব্যথায় চোখ ভরিয়া জল আসে। এ কি আনন্দ—না দুঃখের তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একথা কাহাকেও যে বলিব তেমন কেহ কাছাকাছি নাই। আমি অনেকদিনই হইল আপনার লেখা গল্প উপন্যাস খুঁজিয়া খুঁজিয়া পড়ি। আপনার লেখায় নিজেকে যেন খুঁজিয়া পাই। স্মৃতি বিস্মৃতির সৌরভে বিকালের রঙ আসিয়া মিশিয়াছে। পড়িতে পড়িতে বই বন্ধ করিয়া আকাশে তাকাইলে চোখ ভাঙিয়া জল আসে।

চিঠির নিচেই মিঠু মায়ের মাথার একটা চুলের কাঁটা পেল। সেই সঙ্গে ফিতে। এক পাতা চীনে সিঁদুর। কতকালের। সিঁদুরে আর লেখায় মাখামাখি। মা লিখে আর ডাকে দেয়নি। পড়া যাচ্ছে না এত পুরনো। মায়ের হাতের ভাঙা কাচের চুড়ি। প্রায় ন' বছর আগে লেখা চিঠি। ওপরে লেখা তারিখ তাই বলছে।

আরও একখানা চিঠি। আরও পুরনো। সেখানাও মা লিখে রেখে দিয়েছিল। ডাকে দেয়নি। স্মৃতি বিস্মৃতির সৌরভ। বইখানার নাম যেন শোনা

শোনা লাগল মিঠুর। মা প্রায়ই ওই খাটের কোণে বসে বসে পড়ত। মিঠুর মনে পড়ল—কোন্ লেখকের বই পড়তে পড়তে মা যেন বলেছিল—মিঠু—বড় হয়ে পড়িস এঁর লেখা। তোর ভাল লাগবে।

চিঠির পাশেই মলাট ছেঁড়া তিন চারখানা বই। মায়ের জিনিসে এ বাড়িতে কেউ হাত দেয় না। বইগুলো বের করল মিঠু।

স্মৃতি বিস্মৃতির সৌরভ। লেখক—মানিকলাল মিত্র। এ নাম তো মিঠুর জানা। সেও এর দু'এক খানা বই পড়েছে। সৌরভের পরের বইখানার নাম—গতজন্মের রাস্তা। বিদঘুটে নাম তো! তার মানে আগের জন্মে যে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি। বা যে রাস্তা দিয়ে সাইকেল রিকশয় করে হারসভায় এসে নেমে বাকি পথটুকু হেঁটে তবে বাড়ি ফিরেছি। মিঠুর মনে হল এখনই তো মায়ের হাতের কাচের এই ভাঙা চুড়ি দেখে মনে হয় বুঝি বা গতজন্মের জিনিস। তার পরের বইখানা হল—স্বর্গের পরের জংশন।

বাঃ! লেখকটির নাম যেমন কাপড়ের দোকানদারদের মত - মানিকলাল জওহরলাল, পান্নালাল! বইয়ের নাম তো তেমন সোজা নয়। এবার তার মনে পড়তে লাগল একটু একটু করে। হ্যাঁ—মা এঁর লেখা পড়তে ভালবাসত। পুজো সংখ্যায় এঁর লেখার সঙ্গে কোন কাগজে যেন ওঁর ছবিও থাকত। ছবিও দেখেছে মিঠু। হাফ বাস্ট। চোখে চশমা। গোঁফ নেই। কাঁধে চাদরের আভাস। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। মা তাহলে এই মানিক-লালকেই চিঠি লিখে লিখে জমিয়ে রাখত। কোনদিন ডাকেও দিত না।

পর পর গুনে দেখল মিঠু। সবসুদ্ধ এগারখানা চিঠি। সবচেয়ে পুরনো চিঠিখানাও এগার বছর আগে লেখা। তার মানে মায়ের বয়স ছিল তখন চুয়াল্লিশ। মনে মনে হিসেব কষে দেখল মিঠু। মা বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত এখন পঞ্চান্ন। তার মানে এগার বছর আগে একদিন।

তিন

রোজ শ'য়ে শ'য়ে চিঠি আসে সম্পাদকের নামে। কোন চিঠির সঙ্গে থাকে রিপ্লাই কার্ড বা খাম। থাকে নানা রকমের অনুরোধ। শাসানি। দাবি। নালিশ। অভিমান। কখনো স্টেশন চাই, রাস্তা চাই বলে চিঠি আসে। আবার পঞ্চায়েত প্রধান রাতারাতি দোতলা বাড়ি তোলার টাকা পেল কোথায়? এখুনি তদন্তের দাবি নিয়ে চিঠি। কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। জনৈক প্রতিবেশী এই নামেই চিঠি লেখে কেউ কেউ। অফিসের জানলায় মানিক মিত্তির এইমাত্র একরকমের শব্দহীন বৃষ্টি দেখতে পেল। সারা কলকাতা তাহলে ভিজে কাই।

সুপ্রভাতে পাঠকের মতামতের কলমে ছাপার জন্যে চারখানা চিঠি অনেক চিঠির ভিড় থেকে বেছে বের করেছে মানিক মিত্তির। তার মনে হচ্ছিল—এই

চিঠি চারখানায় এখনকার বাঙালী জীবন আর টিপিকাল বাঙালী মন উঠে এসেছে। মানে আর কি—অবতার, পুলিস, বেকার, গুরু আর সেক্স।

হেডিং সমেত চারখানা চিঠি একই দিনে চারের পাতায় বেরলে সুপ্রভাতের পাঠকরা নিজেদের মুখ দেখতে পাবে আয়নায়। দৈনিক কাগজও প্রায় শামুকের গতিতে পাঠকের মনে এই ভাবনাটাই তুলে ধরে—কী করা উচিত কোনটা অনুচিত আসলে আমরা কোথায় আছি - আমরা কি রকমের মানুষ। - ঠিক এর পর থেকেই বোধহয় সাহিত্যের শুরু। যা ঘটে তা সাহিত্য নয়। যা ঘটলেও ঘটতে পারে—তাই-ই সাহিত্য। তাই তো মনে হয় মানিকের।

প্রথম চিঠি—

আমিই খনা—আমিই কুন্তী

গত ৭ই মে কলকাতার প্রেস ক্লাবে আমি একটি প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম। আমি নীল সরস্বতীর মানস কন্যা নীলিমা। সত্য যুগে আমি খনা ছিলাম এবং দ্বাপরে সতী নারী কুন্তী ছিলাম। অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবের মা ছিলাম। আর এ জন্মে আমি নীলিমা দেবী। আমি সব দেবদেবীর দর্শন পেয়েছি। আমার দিব্য কর্ণ ও দিব্য চক্ষু আছে। আমি দর্শন চাইলে দর্শন পাই এবং এদের বাণী শুনতে পাই। আমি দেব দেবী সম্পর্কে সত্য তথ্য জানতে পেরেছি। নেতাজীর গোপন রহস্য এবং ভারতের সব গোপন চক্রান্ত আমি জানতে পেরেছি। নীল সরস্বতী ও অন্যান্য সব দেবদেবীর নির্দেশে এসব তথ্য সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করার জন্য আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম! রিপোর্টাররা আমার বক্তব্য বিষয়ের লিখিত কপি চেয়েছে। আমি সব পত্রিকায় ছাপানোর জন্য একটি কপি পাঠাচ্ছি। আপনার পত্রিকাতেও একটি কপি পাঠালাম। আপনি আপনার পত্রিকায় ইহা ছেপে দেশের ও বিশ্বের মঙ্গল করুন। আমি একখানা ছবি পাঠালাম। এ ছবি নিয়ে অনন্তকুমার চক্রবর্তীর বাড়ি গিয়ে আমার পরিচয় নেবেন এবং সব কথা জানবেন। তারা এ ছবি নিয়েই আমাকে পূজা করে। আমার পুত্রকে শিব রূপে পূজা করে এবং নীলিমার অবতার ভগবান অশান্ত ও প্রশান্তর পূজা করে।

আমি নেতাজী এবং দেশের সব চক্রান্তের কথা জেনে গোয়েন্দাদের বলেছি। অনন্তকুমার চক্রবর্তী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পরীক্ষা করে সবকিছু জানতে পেরেছে।

অনন্তকুমার চক্রবর্তীর বাড়ি কলকাতায়। তার ঠিকানা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানে। অনন্তকুমার চক্রবর্তী ত্রিপুরার এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভায়রাভাই। সে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের গোয়েন্দা ডিরেক্টর ছিল। আমি শ্রীপুর উচ্চ মাধ্যমিক

বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। স্কুলটি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় অবস্থিত। আমার বাড়ি আগরতলার শান্তিপাড়ায় অবস্থিত।

ইতি—

বেলারানী ঘোষাল

(নীলিমা দেবী)

চিঠির সঙ্গে আসন করা অবস্থায় একজন পিসীমা টাইপের মহিলার ছবি। মাথায় ঘোমটা। ক্যামেরার দিকে চেয়ে আছেন। আর এক লাখ ছাপা বুকলেট। সত্যের উদ্ভাস। বেলারানী ঘোষাল। শিক্ষয়িত্রী। শ্রীপুর উচ্চ-মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। আগরতলা। ত্রিপুরা। মূল্য : দশ টাকা।

মানিক মিত্তির চিঠিখানা এণ্ট্রি করে কম্পোজে পাঠালেন। তার 'সত্যের উদ্ভাস' পড়তে পড়তে তাতে ডুবে গেলেন। নীলিমা দেবী লিখছেন—

আমার লৌকিক নাম বেলারানী ঘোষাল। আমার স্বামী দ্বাপর যুগে রাজা পাণ্ডু ছিল। সে এ জন্মে নারায়ণের মানসপুত্র হয়ে এসেছে। আমার কন্যা খুকুই দ্বাপরের সাবিত্রী। সাবিত্রীর স্বামী সত্যবানের জন্ম হয়েছে মহারাষ্ট্রের এক সম্ভ্রান্ত বৈশ্য পরিবারে। তার নাম এখন অশোক ঘোরপাদে।

৪৩ শনিবারি বাজারের পাশে অশোক ঘোরপাদের বাসা এখন। আমার পুত্রদ্বয় অশান্ত ও প্রশান্ত – দু'জনই নীল সরস্বতীর অংশাবতার। ওরা দু'জনই ভগবান। আই বি. অফিসার অনন্তকুমার চক্রবর্তী দ্বাপর যুগে আমারই বড় পুত্র কর্ণ ছিল।

সরকার আমার বাক্য নিয়ে কাজ করে। কিন্তু আমার কথা প্রকাশ করে না। অনন্তকুমার চক্রবর্তী, আমার স্বামী দ্বাপরের পাণ্ডু এবং অন্যান্যরা মাইণ্ডস্ টেলিপ্রিণ্টার যন্ত্র নিয়ে দিনরাত আমার সঙ্গে কথা বলে। এরা সবাই এখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা। এরা আমার কথা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়। এদের ভেতরে একজন দ্বাপর যুগে শকুনির পুত্র কুন্তল ছিল। অনন্তকুমারের স্ত্রী উষসী দ্বাপর যুগে দুঃশলা ছিল। সত্য প্রকাশের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি ধরায় এসেছি।

পড়তে পড়তে মানিক মিত্তিরের মনে হল—এ যে উপন্যাসের চেয়েও বেশি টানে। কিন্তু এসব তো সুপ্রভাতে ছাপা যাবে না। একই সঙ্গে ভগবান আর গোয়েন্দা - সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির মিকশ্চার আর কোথায় পাওয়া যাবে! হায় সুপ্রভাতের পাঠক! আপনাদের তো এসব পরিবেশন করা যাবে না।

আমার বিয়েতে অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু শিব আমার গর্ভে আসবে—ইহা পূর্ব নির্ধারিত। এজন্য আমার বিয়ে হয়। আমার বিয়ের পর শঙ্কর দেহত্যাগ করে চলে যায়।

মাঝে মাঝে কয়েক জায়গায় মানিক মিত্তিরের চোখ আটকে গেল যেমন –

ভগবান অশান্ত ও প্রশান্ত ১৯৫০ সালের ১লা আগস্ট পুনরায় সত্যযুগ ধরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমিই ওদের নির্দেশে এ সত্য যুগের ঘোষণা দিয়েছি।

...এই নারায়ণই মানুষের সঙ্গে চুক্তি করে বিশ্বেপ্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই রাষ্ট্রে নারায়ণ ছিল রাজা, রানী ছিল লক্ষ্মী, জনসাধারণ ছিল প্রজা।

মানিক মিত্তির মনে মনে বলল, চমৎকার! একেবারে অবতারের আত্মবিশ্বাসে কথাবার্তা বলেন নীলিমা দেবী – নীল সরস্বতীর অংশাবতার। যে আত্মবিশ্বাস কোন আবিষ্কারকেরও থাকে না।

আবারও—

১৯৫০ সনে আমি প্রথম নরচক্ষে নীল সরস্বতীর (কালী) দেখা পাই। এলোকেশে জিব্ কামড়িয়ে সন্ধ্যার পর অন্ধকার রাতে আমাকে দেখা দিয়েছিল। জায়গাটা আলোয় ভরে গেল। মা জানতে চাইল সে পুজা পাবে কিনা? আবার বলল, বেদ লেখা না হলে সত্য যুগ ফুরতো না। অন্যান্য যুগ সৃষ্টির জন্যেই বেদ লেখা।

১৯৫০ সালের ১২ এপ্রিল আমি আমার বাক্যের দ্বারা সমাজ থেকে অবৈধ জাত ভেদ দূর করেছি। ১৯৮৫ সালের ১৪ জানুয়ারি হতে যারা জন্মেছে - তারা এই নিয়মেই জন্মাচ্ছে।

১৯৫০ সালের ১২ জুন নৈহাটির সাহেব কালোনিতে অমল গুছাইতের বাড়ির গৃহমন্দিরে আমি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। ওদের হাঁস, পেঁচা, ময়ূর বা ইঁদুর নেই। ওসব কলিযুগে যোগ করা হয়। এখন তো আবার সত্যযুগের শুরু।

...শিশুকালে আমাকে দুর্গার অবতার বলে স্বপ্নে দেখিয়ে গোয়েন্দা ব্রাহ্মণদের দিয়ে আমার পূজা প্রচার করিয়েছিল।

কৃষ্ণের সঙ্গে কারও দৈহিক সম্পর্ক হয়নি। হতে পারত রাধার সঙ্গে। তাও হয়নি। কারণ ওদের বিয়েই হয়নি। আমি স্বয়ম্বর সভায় রাজা পাণ্ডুকেই পতিরূপে গ্রহণ করেছিলাম। তাই কর্ণের পিতা পাণ্ডু। আমি এভাবেই জন্ম দিয়েছি ব্যাসদেব ও যিশুখ্রীষ্টকে। হজরত মহম্মদ আল্লার মানসপুত্র। আর আমি আল্লার মানসকন্যা। সব জানিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এরশাদকে আমি দু'খানি পত্র দিয়েছি। এরশাদ দ্বাপর যুগে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। যিশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, নানক এরা সবাই নারায়ণের মানসপুত্র। বিশ্বে একটি ধর্ম থাকবে।

আমি বাক্য দিয়েছি ১৯৫০ সালে অনন্তকুমার ভারতের রাষ্ট্রপতি হবে। সি পি আই এম, কং (আই), ফ.ব. আর এস পি মিলে একদল হবে। বাকিরা

সবাই মিলে হবে জনতা দল। তখন যে সংবিধান হবে—তার কপি রাজীব গান্ধীকে পাঠিয়েছি। আর এক কপি আছে গোয়েন্দা অফিসারদের হাতে।

মিখাইল গরবাচভ আমারই প্রতিনিধি। সে দ্বাপরে সাবিত্রীর পিতা রাজা নরেন্দ্র ছিল।

অসাধারণ লেখা। মানিক মিত্তির ছাড়তে পারল না। সুপ্রভাতে মালিকরা পি. এফ-এর টাকা ভেঙেছে। গ্র্যাচুইটি দেয়না রিটায়ার করলে। এল. আই. সি-র টাকা জমা দেয় না। পি. টি. আইকে টাকা দেয়নি। টেলিফোনকে দেয়নি। দেয়নি কালির দাম। এখন মাস মাইনে হয় ১৮ তারিখ। স্লোগানের আওয়াজ—চোখ তুললেই পোস্টার—মালিক তুমি কতকাল আর দিল্লি বসে থাকবে। কার ভাল লাগে এই শোকসভায় রোজ আসতে। এর ভেতর এমন লেখা যে উপন্যাসের চেয়েও উপাদেয়।

এ সবের ভেতর এই লেখা যেন চুম্বক।

ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান ও ভুটান নিয়ে একটি মহাভারত সরকার হবে।···নেতাজী সুভাষ বসু দ্বাপর যুগে আমার ছোট কাকা ছিল। তাকে নেহরু দিল্লিতে তিনমূর্তি ভবনে বন্দী করে রাখে। ওখানে বসে নেতাজী বহু বই লেখে। সেগুলো সামান্য পাল্টে নেহরু নিজের নামে প্রকাশ করেন। আসলে ওসব বই নেতাজী তার কন্যাকেই লিখেছিলেন। নেহরু একমাত্র তার আত্মজীবনী লিখেছে। এভাবে নেতাজীর লেখা প্রকাশ করে নেহরু পণ্ডিত নেহেরু হয়েছে।

ভারতের সব ডাকাতি এবং বড় বড় চুরির মূলে রয়েছে গোয়েন্দারা। এরা যন্ত্র দিয়ে ডাকাতদলকে সাহায্য করে এবং অর্থ স্বর্ণের ভাগ নেয়। সবার উপর থেকে গোয়েন্দা তৎপরতা তুলে নেবার জন্য আমি অনন্তকুমার চক্রবর্তীকে ভারতীয় গোয়েন্দার সর্বোপরি ডিরেক্টর নিযুক্ত করেছি। সঞ্জয় গান্ধী মারা যাবার পর আমি জানতে পেরেছি সে আমার পুত্র যুধিষ্ঠির ছিল। নেতাজী সুভাষ বসু তিনমূর্তি ভবনে বন্দী ছিল। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। দেশের লোক একথা জানল না বলে সে মাঝে মাঝে চোখের জলে বুক ভাসাত। তার কষ্টের কথা জানতে পেরে আমার চোখে জল পড়েছে।

আমার জন্ম হয়েছে ১৩৫০ সালের ১১জ্যৈষ্ঠ (১৯৪৩ সালের ২৬মে) বুধবার অষ্টমী তিথিতে সকালে—বাংলাদেশের খুলনা জেলার ভোগিরহাটে। তখনই গোয়েন্দা ব্রাহ্মণেরা আমায় পুজা করে।

কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি ১৯৫০ সালে আমার পিছনে লাগে। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এটম, ম্যাগনেট, রঞ্জন রশ্মি দিয়ে আমায় শক দেয়। ইন্দিরা নিজেই সন্তোষী মায়ের অবতার হতে চেয়েছিল। পারেনি। তার গোয়েন্দারা শক দিয়ে আমার পায়ের নখ, দাঁত নষ্ট করে দিয়েছে। সে

সময় আমি শান্তি পাড়ায় অঘোর ঘোষের বাড়ি ভাড়া থাকতাম। গোয়েন্দারা এমন চক্রান্ত করেছে যে আমার মেয়ে দু'বার উচ্চমাধ্যমিক দিয়েও ফল একই হয়েছে। আমার ছেলে ভগবান—সে মাধ্যমিকে ফার্স্ট হতে পারত—কিন্তু হাই সেকেণ্ড ডিভিশন পেয়েছে। আমি ১৯৫০ সালে ইংরেজিতে এম. এ দিই। কিন্তু গোয়েন্দা চক্রান্তে আমার ফেলের রেজাল্ট এসেছে। আমার স্কুলের সব মেয়ে পাস করবে—দু'জন ফার্স্ট ডিভিশন পাবে বলে বাক্য দিয়েছিলাম। গোয়েন্দা চক্রান্তে মাত্র সতেরজন থার্ড ডিভিশনে পাস করেছে। আর সবাই ফেল করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী দ্বাপরে শকুনি ছিল। অনন্তকুমার চক্রবর্তী ছিল ধৃতরাষ্ট্র। আর ইন্দিরা গান্ধী ছিল আমার বড় মাসীমা। দিল্লি মসজিদের শেখ জামাল দ্বাপরে ছিল শল্যবান। মাদার টেরেসা ছিল সাত্যকী। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চাণক্য ছিল। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন দ্বাপরে ছিল বিচিত্রবীর্য—আমার শ্বশুর। লালবাহাদুরের স্ত্রী ললিতা শাস্ত্রী ছিল অম্বালিকা—আমার শাশুড়ি।

দেশের জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধী দ্বাপরে আমার দাদুভাই ছিল এবং মাও সেতুং-এর স্ত্রী আমার দিদিমা ছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ মহাত্মা গান্ধীর ভাই ছিল। নাম্বুদিরিপাদ গতজন্মে নিত্যানন্দ ছিল। গফ্ফর খাঁ ছিল রাজা দ্রুপদ। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত আর পি. এল. ও-র প্রেসিডেন্ট আরাফত তার দুই ছেলে ছিল। এই দুজনই দৌপদীর দাদা। জনাব ফজলুল হল গতজন্মে আমার ঠাকুর্দা আর মহারানী ভিক্টোরিয়া গত জন্মে আমার ঠাকুরমা ছিল। তার নাম ছিল সর্বমঙ্গলা দেবী। ফজলুল হকের ছেলে ফয়জাল হক আমার সেজ কাকা ছিল। নেতাজী ছিল ছোট কাকা। সে ছিল পরাশর। তার স্ত্রী ছিল রুদ্রাণী—আগরতলার তুলসীবতী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অসীমা দত্ত ছিল ঐ রুদ্রাণী। মেজর ডালিম ছিল ফজলুল হকের নাতি। দ্বাপরে নসরত ভুট্টো ছিল আমার বড় পিসিমা। এরশাদ গতজন্মে ছিল পাকিস্তানের জিয়াউল হকের স্ত্রী বেগম সফিক জিয়ার গতজন্মের দাদা। তখন এরশাদের নাম ছিল নিকুঞ্জ। সাফিকের নাম ছিল লিপিকা। ফজলুল হকের মেয়ে গতজন্মে ছিল দেবীকা—আমার মেজ পিসি। মিসরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নাসের গতজন্মে ছিল তার স্বামী। আমার পিতা ত্রেতা যুগে ছিল দশরথ। আমার বড় জেঠিমা ছিল কৈকেয়ী। মেজ জেঠিমা ছিল সুমিত্রা। মাদারীপুরের নবগ্রামের কমলা হাওলাদার সত্যযুগে ছিল আমার সতীন মাদ্রী।

আমি সবার সব জন্ম দেখতে পাই। এদের সবাইকে নিয়ে আমার পরিবার—এইই আমার পরিবার। চারযুগ ধরে আমি একইসঙ্গে সবটা দেখতে পাই—আর সব মনেও পড়ে যায় আমার।

বুকলেটখানা বন্ধ করে চোখ বুজল মানিক মিত্তির। এত জন্ম যে জানে—কার সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল যে মনে করতে পারে একই সঙ্গে—সে তো দুনিয়ার সব ধর্মের জয়েণ্ট চিত্রগুপ্ত। মহাব্যাস। ট্রিপলটলস্টয়।

নীলিমা দেবীর কত ইচ্ছে। শিক্ষয়িত্রী হয়ে সে কত স্বপ্ন দেখে। আর আমি একজন বাঙালী লেখক—আমি অফিসের পর বাড়ি ফিরতে হবে ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে। সেই একই নিয়মে খাব। শোব। ঘুমিয়ে পড়ব। কাল ভোরে ভোর হবে। নিজের হাত পা-গুলোই আজকাল কত পুরনো লাগে। কতদিন আর তেমন করে বিস্মিত হই না। অবাক হবার জগৎটাই ফুরিয়ে গেল। আরও খাব—আরও সুখ করব—সেই ইচ্ছেটা কবেই উবে গেছে।

লেখায় কি সেইভাবে আর ডুবে যাই। একযুগে অনেক লেখক আসে। হই হই করে। তারা লেখে। কিছু লেখায় হই হই হয়। সময় লেখাগুলোকে পাশ কাটিয়ে আরও স্পীডে বেরিয়ে যায়। লেখা, স্বপ্ন, মেধা সময়ের রাস্তার পাশে এলিয়ে পড়ে থাকে। সময়কে ধরতে পারে না। ওই দেখা যায়—সময় যাচ্ছেন—মহা মজাদার ভুলো এক দৈত্য।

এখন কোথাও বসে খালি পেটে শুধু সোডা দিয়ে সে যদি চারটে নিতে পারত—তাহলে ঠোঁটের নিচে মনে হতে পারত—চিবুক একটু কাঁপছে—টান টান স্নায়ু-ছিলা ঢিলেঢালা হয়ে আসছে। সেই সময় কুমার গন্ধর্বের ফাটি যায় ছাতিটা আঃ! আর মুখোমুখি বসে থাকবে কেউ যার ভেতর রহস্য আছে। সে কি হয়? সে কি হবার!

চার

দ্যাখ, সুব্রত তোর কথায় আমি বি. কম পড়লাম। কী লাভ হল?

কিছু ভুল করিসনি মিঠু। কোম্পানি সেক্রেটারিশিপটা দিয়ে দে। দেখবি চাকরি তোর পেছনে পেছনে ঘুরছে। পরীক্ষায় বসবি না তো কি হবে!

আমার কি তোর মত পেসেন্স আছে?

একটু ধৈর্য ধরে পরীক্ষাটা দিয়ে দ্যাখ—আমি বলছি—বলতে বলতে সুব্রতর কাশির দমক এল। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে কাশি। শরীরটা স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠতে চায়।

থাক আর কথা বলিস না।—বলে মিঠু উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ডগ রেস কোর্সে সরকারি এই ফ্ল্যাটবাড়ির জানলা আটকাতে গেল। জানলার বাইরে শীতের শ্যাওলা ধরা আরও সব ফ্ল্যাটের হলদে গা। অনেক আগে—যখন সুব্রতরা এ বাড়িতে প্রথম উঠে আসে—তখন নাকি এ জানলা দিয়ে দেখা যেত—ইলেকট্রিক ট্রেন মাঝেরহাট স্টেশনে ঢুকছে। তখন ব্রিজটা ছিল কাঠের। আমি আর সুব্রত ক্লাস সিক্স অব্দি একই বাসে স্কুলে গেছি। ও আর কি তখন সিক্সে। আমি ফাইভে। কতদিন বাসের ভেতর সুব্রত আমার ফ্রকের ওপর

বেল্টের টিপ বোতাম এঁটে দিত। আমি কোনদিন বেল্ট ঠিক রাখতে পারতাম না। এলেবেলে হয়ে যেত। মাদার প্রিফেক্ট বলতেন—ইউ কেয়ারলেস!

জানলা দিয়ে শীতের বাতাস ঢুকছিল। সেই সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা ছোটবাজারের সামনে লটারিওয়ালার ঘন ঘন মাইক ঘোষণা। আনন্দ সংবাদ। আনন্দ সংবাদ। আমাদের কাউন্টার হইতেই কুবের লটারির ফার্স্ট প্রাইজের টিকিট··· আর শোনা গেল না।

জানলা আবজে দিয়ে বিছানার কাছে ছুটে এল মিঠু। এ কাশি থামবার নয়। বুকে হাত বুললেও সুব্রত কাশতে থাকবে। চোখ লাল হয়ে উঠেছে। মিঠু আস্তে সুব্রতর মাথার পেছনে হাত দিয়ে ওকে একটু তুলে ধরল। তাতে কাশির বেগ কমে এল। তখন সুব্রত এই শীতেও ঘামতে ঘামতে বলল, এই মিঠু—আমায় একটা চুমু দিবি?

মাসীমা স্কুল থেকে ফিরেছেন।—বলে মুখ সরিয়ে নিল মিঠু।

ফিরে তোকে দেখেই খুব খুশি মা। তাই চা টা বানাতে বসেছে নিশ্চয়। —দে না একটা—

মিঠু কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে নিয়ে মুখটা এগিয়ে আনতেই সুব্রত তার ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে ডান গাল এগিয়ে দিল। যেই মিঠু ওর গালে ঠোঁট রেখেছে আলতো করে—অমনি সুব্রত প্রায় স্ট্যাচুর মত মুখ করে দেওয়ালে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল, আমার হাঁপানি কোনদিন সারবে না মিঠু—

আলতো করে গালে চুমু রেখে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে মিঠু বলল, কোথায়! আগের চেয়ে তো অনেক কম এবারে—

না রে মিঠু। আজ নিয়ে একুশদিন শুয়ে আছি। চান করার উপায় নেই। একবার টান উঠলে চোখ বেরিয়ে আসতে চায়।

চান যে করিসনি তা জানি!

কেন?—বলে ফোলা ফোলা চোখে সুব্রত ফিরে তাকালো। দুই চোখের কোণই লাল। মাথায় কোঁকড়া, রুক্ষ চুল ঘরের কম ভোল্টেজের আলোয় সাপের ফণার মত লক লক করছে। গালে ফাঁকা ফাঁকা দাড়ি। অন্তত দশদিনের বাসি।

নাঃ। এমনি।

বলনা—

তোর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বোটকা গন্ধ পেলাম যে—

এবারে হেসে ফেলল সুব্রত। ছোটবেলায় তোর গা দিয়ে অ্যারারুটের গন্ধ বেরতো।

আঃ! বলে আবদেরে গলায় মিঠু বলল, আমার দোষ কি? মা স্কুল ইউনিফর্মে অ্যারারুটের মাড় দিত।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। ছোট দু'ঘরের সরকারি ভাড়ার ফ্ল্যাট। সামনেই ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে ছুটন্ত বাস, মিনিবাস, ট্রামের ছাদ দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে সুব্রত বলল, ভাগ্যিস বাবা এই ফ্ল্যাটটা ভাড়ায় পেয়েছিল। নইলে—

নইলে এখন তোকে হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে বাড়ি খুঁজতে হত।

তা আমি এখন পারি মিঠু।

সি. এ. পাস করেছিল বলেই পারছিস।

এবারে সি. এ পাস করলাম—এটা আমার ক্রেডিট নয়?

খুব হয়েছে। সি. এ পাস করলে হাজার টাকা ভাড়া সবাই দিতে পারে। চাকরি তোকে এখন খুঁজে বেড়ায়—

চাকরি আমি চিরকাল করব না মিঠু।

কি করবি?

বড় বড় চোখ তুলে তাকাল সুব্রত। খাসমহলের কাছাকাছি শুয়ে থাকতে থাকতে—ওষুধ খেতে খেতে—মুখ ফোলা—চোখ ফোলা। চোখ যেন স্বপ্নের মরামে তেলতেলে।

সুব্রত বলল, কি করব?

হু—কি করবি?

সুব্রত দু'হাত বাড়িয়ে বিছানার ওপরেই দু'হাঁটুতে শরীরটা ঠেলে তুললো—তার সঙ্গে সঙ্গে মিঠুর দিকে ঝাঁপ দিল। টালমাটাল শরীর ব্যালান্স হারিয়ে দলামোচা পাকানো লেপের ঢিবিতে পড়ল।

মিঠু এসে শক্ত হাতে ধরল। করছিস কি? পাশের ঘরে মাসীমা।

উপুড় হওয়া অবস্থায় সুব্রত যেন কেঁদে উঠল। আঃ! আমি পারি না। কিছু পারি না। আমার শরীরটা—আমার কাশি—

মিঠু ওর মাথায় চুমু খেয়ে বলল, সেরে যাবি। ঠিক সেরে উঠবি। দেখিস—ক'দিন বাদেই ঠেলে উঠবি।

সুব্রত একটা গাছকে ধরার মত মিঠুর পাতের মত কোমর জড়িয়ে সামান্য মাথা তুলে কোন আধখানা ভাঙা মূর্তি হয়ে প্রথম কথাই বলল, চাকরি আমি বেশি দিন করব না মিঠু। সেরে উঠেই প্রথম তোকে বিয়ে করব।

বেশ। তারপর?

একটা স্কুটার কিনব।

এই শরীরে আর স্কুটার কিনতে হবে না। তুই স্কুটার নিয়ে রাস্তায় বেরলে আমি চিন্তায় থাকব।

স্কুটার আমার লাগবেই। অনেক ঘুরতে হবে যে আমায় গোড়ায় গোড়ায়। নিজের ফার্ম করব। তুই অফিস দেখবি। আমি বাইরে ঘোরাঘুরি করব।

মেসোমশায়ের স্কুটার ছিল না?

ছিল। বাবা মারা যেতেই মা বেচে দিল। কে চালাবে? তখন তো তুইও ছোট—আমিও ছোট মিঠু—

তোর মনে আছে—তুই যখন ছেলেদের বাসে চলে গেলি—তখন একদিন আমার পায়ের জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়েছিলি।

তুই খুব ভুলো ছিলি মিঠু। ফিতে বাঁধতে ভুলে যেতিস। নয়তো খুলে যেত।

সেকেণ্ড ট্রিপের বাসে আমি মেয়ে হয়েও টম বয় ছিলাম।

একথায় এমন করে তাকালো সুব্রত যেন—ফ্রক পরা সেই অগোছাল মেয়েটাকে এখনই দেখতে পাচ্ছে! অথচ তখন তার খাটের পাশেই শাড়ি পরা রীতিমত গোছাল মিঠু দাঁড়িয়ে। চুলের হর্সটেল রূপোলি ধাতুর ধনুক উথলে পিঠের চুনে হলুদ ব্লাউজে পড়েছে। সেই রং মিলিয়ে শাড়ির জমির রং। দুই ভ্রূর মাঝেও চুনে হলুদ টিপ।

তোর মনে আছে—তুই কোনদিন তোর রেজাল্ট দেখতে যেতি না। আমার সাহস ছিল। আমায় দেখতে পাঠাতিস।

হ্যাঁ মিঠু। এবার তোকে বিয়ে করে আমার সাহস হবে—ওকথা থাক। তুই চক্রবর্তী স্যারকে মনে করতে পারিস? সেই যে ম্যাণ্টন মোড়ের টিউটোরিয়াল—

তুই অ্যাকাউণ্টেন্সির অঙ্ক কষতে যেতিস।

হাসিতে ভরে গেল সুব্রতর মুখ। আমিই তোকে ভর্তি করে দিয়েছিলাম মিঠু। চক্রবর্তী স্যারের উচ্চারণে গোলমাল ছিল। মেদিনীপুরের বীনপুরে বাড়ি ছিল।

গোলমাল মানে! পারচেজিংকে বলতেন পারচিং। শুনে আমি হেসে কুটিপাটি। তখন স্যারের ত্রিশ বত্রিশ। সিটি সাউথে তুখোড় প্রফেসর। আমার হাসিতে একদম ভ্যাবাচেকা—

সে কার না হয় বল মিঠু? তুই হাসলে এখনো আমি চোখ ফেরাতে পারি না। বুক টিপ টিপ করে। বিশেষ করে তুই পার্ট ওয়ানে ঢোকার পর থেকেই।

চুপ কর। তা চক্রবর্তী স্যার একদিন বাড়িতে এসে হাজির। সন্ধ্যেবেলা। বাবা হাঁটতে বেরিয়েছে। দাদা অফিস থেকে ফেরেনি। আমি দরজা খুলেই দেখি অরিজিনাল জিনিসটি এসে হাজির!

তার মানে?

সেই পারচিং! এসে বলে কি—মিঠু তুমি অনেকদিন ক্লাসে যাওনা কেন? আমি তো ঘাবড়ে গেছি। গলার স্বর যেন অন্যরকম। কোথায় আমায় ডেকে কথা বলবেন—তা নয়—গলা কাঁপছে চক্রবর্তী স্যারের।

আমি দরজার কপাটের আড়ালে এসে দাঁড়ালাম। যদি কিছু করে বসে তো আমি এক দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব।

তার মানে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না মিঠু–

বাকিটা শোন। চক্রবর্তী স্যার তখন তার টিপিক্যাল উচ্চারণে বলে চলেছেন –জানো মিঠু– তুমি কতদিন ক্লাসে যাও না—তমাকে না দেখে আমার চোখে জল আসে–

আমি তো হাসি চাপতে পারছি না কিছুতেই। অথচ চক্রবর্তী স্যারের পক্ষে আমি ব্যাপারটা যে এত গুরুতর তাও কখনো বুঝতে পারিনি।

তখন তুই কি করলি মিঠু?

ঠাণ্ডা গলায় বললাম, আপনি এখন যান। বাবা ফিরবেন এখুনি।

কি করলেন চক্রবর্তী স্যার?

তাও কি যেতে চান! তখনো হড়বড় করে বলে যাচ্ছেন—আমায় না হলো নাকি তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে—। কপাটের আড়াল থেকে কড়া গলায় বললাম—যান বলছি। মুখটা অ্যাতোটুকু হয়ে গেল স্যারের—হাত দু'খান কাঁচের দু'পাশে ঝুলে পড়ল। খুব আস্তে সিঁড়ি ভেঙে নামলেন। আমাদের লোহার গেটটা খুলে বেরিয়ে গেলেন—

পাশের ঘর থেকে পুরনো প্রাইমা স্টোভের হিস হিস শব্দ আসছিল। উঠে বসা সুব্রত পাশ বালিশ আঁকড়ে পায়ের কাছের চাদরটা কোমরে টানল। চোখে কণ্টাক্ট লেন্সের মতই খুব পাতলা জলের প্রলেপ বোধহয়। তাই তো মনে হল মিঠুর।

খুব শান্ত গলায় সুব্রত বলল, তোর কষ্ট হয়েছিল মিঠু?

আমার কেন হবে?

চক্রবর্তী স্যার খুব কষ্ট পেয়েছিলেন—

পেতে পারেন। আমি কি করতে পারি? আমি কি তাহলে জগৎ- সংসারের কষ্ট কমানোর জন্যে দয়াময়ী ঠাকরুণ হয়ে যাবো!

তোর তাহলে ভাল লেগেছিল বল?

জানিনা—বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল মিঠু।

তোর কেমন লাগছিল তখন?

একথায় টুলে বসা মিঠু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। মাথা নামিয়ে সুব্রতর পাশ বালিশে নিজের ভিজে চোখ ঠেসে ধরল। সুব্রত আগের মত জোর পায় না শরীরে–বিশেষ করে শীতের মুখে হাঁপানির এই টান উঠলে। তাই সে শোয়া অবস্থাতেই ডান হাতখানা মিঠুর মাথায় রাখল। তারপর আস্তে বলল, আমার দোষ হয়েছে মিঠু। ক্ষমা করে দে আমায়–আর কোনদিন এমন কথা বলব না–

ঠিক এমন সময় কোমরে শাড়ি পেঁচানো এক মহিলা হাতে থালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। বলল, ও মিঠু—তোর জন্যে লুচি ভাজলুম—আর তুই মাথা নামিয়ে? কি বলেছিস ওকে ব্রত?

মিঠু সঙ্গে সঙ্গে পাশ বালিশে চোখ ঘষে মুখ তুলল, কিছু না মাসীমা। এমনি—

তাই বল। ব্রতর যা স্বভাব হয়েছে আজকাল. ভুগে ভুগে—সবাইকে খিটিরমিটির করছে।

চোখের পলক না মেলে ভীষণ শান্ত গলায় সুব্রত বলল, আমি না বুঝে বলে ফেলেছি মা—

ঠিক জানি আমি। তুই কিছু বলেছিস বলে আমার ভাল মেয়েটা কাঁদছিল—

না মাসীমা। সুব্রত তো খারাপ কিছু বলেনি। দিন - লুচি বেগুন ভাজা আমি ভীষণ ভালবাসি। আপনি স্কুল থেকে এসে এসব আবার করতে গেলেন কেন?

ওমা! কতদিন পরে তুই এসেছিস দেখেই তো আমি রান্নাঘরে ঢুকলুম। সন্তু অফিস থেকে ফিরলে খাবারটা এগিয়ে দিসনা তুই?

একমুখ হাসল মিঠু! তাই দেখে মাসিমা ফের বেরিয়ে গেলেন। খেয়ে নে—তোর চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে এসে বসছি।

মা বেরিয়ে যেতে সুব্রত আবারও সেই শান্ত গলায় বলল, মায়ের খুব ইচ্ছে তুই আমার বউ হয়ে এ বাড়িতে এসে উঠিস—

মুখের লুচিটা গিলে খুব চাপা গলায় মিঠু বলল, তা কি করে হয়?

ওর এ-গলা সুব্রতর কানে ষড়যন্ত্রের মতই নিচু কিন্তু ধারাল লাগল। সে আচমকা উঠে বসল, তার মানে? কি বলতে চাইছিস মিঠু?

মিঠু ভাল করে সুব্রতর মুখে তাকাল। ভুগে ভুগে চোখ দুটো ধারাল কিন্তু কেমন ভেজা ভেজা। একসাইটেড্ হোস্ নে। ভাল করে শোন।

কি বলবি বল?

তুই আমার চেয়ে দু'বছরেরও বড় নয়—

তাতে কি হল মিঠু। আমি যে তোকে চাই। আমি যে তোকে কত—

শোন! আমার চব্বিশ হয়নি এখনো! তোর ছাব্বিশ হবে আসছে মাসে।

তাতে কি হল মিঠু

আঃ! এখুনি কাঁদতে শুরু করেছে ত্যাখো—বলে উঠে দাঁড়িয়ে মিঠু নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে গেল। পারল না। চোখ সরিয়ে নিল সুব্রত।

মিঠু সরে গিয়ে দূরে দাঁড়াল। চোখ মোছ। নইলে আমি কথাই বলব না। কী পুরুষমানুষ তুই? অ্যাঁ? কথায় কথায় কেঁদে ফেলিস?

দু'হাতে চোখ ডলে সুব্রত বলল, তোকে ছাড়া আমি বাঁচব না মিঠু।

ভাল করে শোন। আমার যখন চুয়াল্লিশ হবে—তখন তোর প্রায় ছেচল্লিশ। তখন আমাকে তোর ভাল লাগবে।

যতদিন বাঁচব—ততদিন তোকে আমার ভাল লাগবে।

ওরকম মনে হয় ব্রত। আমরা মেয়েরা তোদের চেয়ে একটু বেশি বুঝি।

হাত তুলে সুব্রত কি বলতে যাচ্ছিল। চায়ের কাপ হাতে মাকে ঢুকতে দেখে একদম চুপ করে গেল।

সুব্রতর মা চা দু'কাপ নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় একবার মিঠুর মুখে তাকাল। এই তো আমার মেয়ের মুখে হাসি—

তিনি বেরিয়ে যেতে মিঠুর মুখের হাসি নিভে গেল। সে মনে মনে একবার ভাবল, মাসীমাকে আমি যদি সুখী করতে পারতাম। তারপর সুব্রতর মুখে তাকিয়ে বলল, ও হয় না সুব্রত।

খুব হয় মিঠু। বলতে বলতে সুব্রতর চোখ আবার জলে ভরে গেল। সে খুব আস্তে জানতে চাইল, তবে তুই কাকে ভালবাসিস মিঠু?

তোকে। যেমন এতকাল ভালবেসে এসেছি।

না। সে ভালবাসা নয় মিঠু। ছোটবেলার ভালবাসা আলাদা। আর এখনকার ভালবাসা আরেক রকমের—

সে যদি বলিস তো আমি ভালবাসি মানিকলালকে—

কে? কার কথা বললি মিঠু?

মানিকলাল মিত্র—সাহিত্যিক—

সেই লেখক মানিকলাল? যার লেখা কেউ পড়ে না—যার নাম বিশেষ কেউ জানেও না—বলতে বলতে সুব্রত চোখ সরু করে মিঠুর মুখে তাকাল। এ মুখ তার ক্লাস সিক্স থেকে চেনা। ভয় পেলে—আনন্দ হলে কেমন হয়ে যায়—তাও জানে সুব্রত। কিন্তু কি আশ্চর্য! এখন যে এ মুখের কোন ঢেউ—কোন রেখাই তার চেনা ঠেকছে না।

মানিকলাল নামটাই কেমন পোপটলাল ধরনের। যেন কোন ভুজাওয়ালার নাম। এই নামে কোন লেখক হয়? লোকটা হয়ত আসলে নটবরলাল। মিঠুকে লেজে খেলাচ্ছে। মিঠু কিছুই বুঝতে পারছে না। আমিও তো কোনদিন কিছু লিখিনি। লিখতে পারি না। মিঠুর মুখ পালটে গেছে। চোখ নামানো। যেন এ ঘরের মেঝেতে তার স্বপ্নটা পড়ে আছে। সেদিকেই মিঠু এখন তাকিয়ে। স্বপ্নের নাম কি মানিকলাল?

মিঠু খুব গাঢ় গলায় বলল, বিশেষ কেউ নাম না জানলেও—যাদের জানা

দরকার – তারা মানিকলাল পড়ে—

একথায় সুব্রতর বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। লেপের নিচে তার পায়ে এখন কোন সাড় নেই। মানিকলাল তাহলে কতদূর? মিঠুর ভেতরে কতদূর চলে গেছে মানিকলাল? তোর সঙ্গে আলাপ হল কবে? আমি তো কিছুই জানি না —

জানবি কি করে! আলাপ হলে তো।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সুব্রত। তাহলে?

মানিকলালের বই পড়েছি আমি। বোধহয় মা বেঁচে থাকতে একখানা পড়িয়েছিল।

ওঃ! এতদিনে তাহলে সব ভুলে গেছিস!

না। আবার পড়লাম। স্মৃতি বিস্মৃতির সৌরভ। স্বর্গের পরের জংশন। গতজন্মের রাস্তা। পড়তে পড়তে বুকের ভেতরটা কেমন ভারি হয়ে আসে। মনে হবে বুকের ভেতর কেউ পর পর থান ইট সাজিয়ে যাচ্ছে—আর বুকটা ক্রমেই ভারি হয়ে উঠছে। একসময় নিঃশ্বাস আটকে আসে–

তাই বুঝি?

বিশ্বাস কর আমায়। মায়ের দেরাজ ওই থেকে তিনখানা পড়ার পর লাইব্রেরি থেকে যোগাড় করে এনে পড়েছি আর ও কয়েকখানা। দারুণ লেখা। কেন যে সবাই পড়ে না – তা বুঝি না।

অনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের চেয়ে ও?

ছ্যাখ ব্রত – লেখা এক একজনের এক একরকম। কারও সঙ্গে কারও তুলনা করা ভুল। আমি অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পড়েছি। পড়েছি সনৎ নন্দী -- আরও অনেকের। কিন্তু মানিকলাল পড়লে মনে হয়—আমি এসব জানতাম – কিন্তু ওকে পড়ার আগে তা লক্ষ্য করিনি। দাদা ফুটপাথ থেকে ওঁর গল্প সংগ্রহ দু'খণ্ড কিনে এনেছে সস্তায়—কে?

সন্তুদাও মানিকলাল পড়ছে নাকি?

আমাকে দেখে শুরু করেছিল দাদা। এখন পেলেই পড়ে। নিজেই যোগাড় করে আনে। অথচ মানুষটার চেহারার সঙ্গে লেখার কোন যোগ নেই। কোন মিল পাবি না।

এই যে মিঠু বললি—মানিকলালের সঙ্গে তোর আলাপই হয়নি এখনো?

হয়ইনি তো। নবকল্লোল পূজো সংখ্যায় একখানা ছবি ছাপা হয় কি বছর। হাফ বাস্ট। দেখলে মনে হবে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। কিন্তু কীসব রেয়ার অভিজ্ঞতা। আনক্যানি জগতের কথা লেখেন। পড়লে তোর ভীষণ ভাল লাগবে ব্রত।

শুনতে ভাল লাগছিল না সুব্রতর। তবু বলল, কোনদিন পড়িনি। পড়ে দেখতে হবে তো। কত বয়স?

ছবিটা বোধহয় অল্প বয়সের। মানে আগেকার মনে হয়। কেননা—অনেকদিন লিখছেন নিশ্চয়। বেশ পাকা লেখা। বইয়ের ভেতর ওঁর লেখা বইয়ের লম্বা লিস্ট থাকে তো।

পড়তে হবে। তোর এত ভাল লেগেছে যখন মিঠু—

আমি তো যা হয় হবে ভেবে একখানা চিঠি ফেলেছি।

ঠিকানা জানতিস?

নাঃ! স্রেফ আন্দাজে। শুনেছি সুপ্রভাতে কাজ করেন। দিলাম ডাকে ফেলে।

শীতের বাতাসে খানিক আগের বন্ধ করা জানলাটা ঠকাস করে খুলে গেল। বাইরে হিম আকাশ অন্ধকারে আবছা। সুব্রতর ভেতরটা তখনো কাঁপছে। মানিকলালের বয়স কত? কত বয়স? আমি তো কোনদিন রচনা ছাড়া কিছুই লিখিনি।

পাঁচ

'আশ্রয়প্রার্থী'

আপনার কি অকাল বৈধব্য ঘটেছে? কিংবা আপনি কি কোন কারণে স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছেন? অথবা যদি আপনি আজও কোন ব্যর্থ প্রেমে বা অন্য কোন কারণে বিয়ে করেননি—বয়স হয়েছে তবু কুমারী রয়ে গেছেন এবং সর্বদাই বড় বেশি দুঃখপূর্ণ আন্তরিকতায় যেন কোন অসহায়া ও অবহেলিতা দুঃখী জীবন যাপন করছেন—তাহলে নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুন; পার্শ্বসঙ্গী কিংবা অন্য যে কোন স্নেহশীল সম্পর্কের ভিত্তিতে আপনার শূন্য জীবনকে কিছুটাও সাময়িক সান্ত্বনা দিতে একজন চির নির্যাতিত বেকার যুবককে কি আপনি আশ্রয় দিতে পারেন?

শুনুন—আমি কোন ক্ষমতা চাই না, আমি চাই মানুষের মত বাঁচতে, কিছুটা মমতা, সারা জীবনে আমি আপনজন কিংবা আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে বড় অসহ্যরকমের দুর্ব্যবহার পেয়েছি ও প্রয়োজনীয় মাত্রায় স্নেহমমতা লাভে বঞ্চিত হয়েছি।

গত তিন বছরের অধিকসময় ধরে কোন এক বিশেষ দুষ্টচক্রের দ্বারা খুবই গুপ্ত ও অভ্যন্তরীণ কায়দায় সর্বদা—সর্বত্রই খুবই অসহ্য ও যথেচ্ছ অপমানকর লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছি—এমনকি যত্রতত্র মানুষকে দিয়েও বহু কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের শিকার আমাকে হতে হচ্ছে গত তিন বছর ধরে; এমনকি গত তিন বছর ধরে একপ্রকার ওষুধের সাহায্যে আমার মানসিক যন্ত্রণাও খুবই তীব্র করছে। কখনও কখনও অনেক দিনেই খুবই চিৎকার করি যন্ত্রণায়, এমনকি কেঁদে মানুষের পায়ে ধরেও এহেন মানসিক নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাইনি।

হ্যাঁ, বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু স্ত্রী যথেচ্ছভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় ক্ষমতামত্ত হওয়ার জন্যে খুবই স্বেচ্ছাচারিতায় আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছ' বছর আগে বাড়ি

ছেড়েছে। বারবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও প্রতিবারেই আপন ক্ষমতার জোরে কুকুরের মতই ঘৃণ্যাচারে ওদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি অর্ধচন্দ্র দিয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিতেও এরা পিছ-পা হয়নি। যাই হোক, এরা বলেছে—তাঁদের মেয়ে পাঠাবে না, এমনকি মেয়েও খুবই জেদের সঙ্গে বলেছে যে আসবে না।—এবং আমি বিয়ে করে বা অন্য যে কোনও মেয়ের সঙ্গে যে কোন নতুন আশ্রয়ে থাকতে পারি। অতএব ওদের দিক থেকে কোনপ্রকার বাধা-বিপত্তির সম্ভাবনা নেই।

আমার বয়স ত্রিশের বেশি। স্বাস্থ্য ও রঙ মাঝারি। আজ থেকে প্রায় এগার বছর আগে বি. এ. পাস করেছি। আজও বেকার। বাড়িতে আমরা মাত্র দুজন—মা ও ছেলে।

আপনি যদি নিঃসঙ্গ অবস্থায় এবং শূন্য হৃদয়ে দুঃখী জীবন যাপন করেন—আপনার যদি ছেলেমেয়ে থাকে—তাহলেও কোন আপত্তি নেই—বিদেশে বসবাসকারী কোন মহিলা বা বিদেশিনী হলেও কোন আপত্তি নেই—তাহলেই আপনার পূর্ণ জীবনপঞ্জী জানিয়ে পত্র মাধ্যমে সত্বর যোগাযোগ করুন। আপনার অবস্থা বা জীবনচর্চা মনোমত হলেই আপনাকে লিখে জানানো হবে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাতের জন্যে।

মনে রাখবেন, আমি আশ্রয় চাই ও কিছুটা শান্ত পরিবেশ ও ভাল ব্যবহার সহ কিছু ভাল খাবার চাই। ভাল খাবার বলছি এই জন্য, যেন ঐ খাবারে কোন প্রকার কোন ওষুধ-ফোষুধ না থাকে।

নইলে ঐরকম খাবার খেয়ে গত তিনবছর ধরে খুবই অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছি ও খুবই চিৎকার করছি এবং অশ্লীল ভাষায় একে ওকে গালিগালাজও করছি।

যাই হোক, যে কোন জাতির এবং যে কোন দেশে বসবাসকারী মহিলার কাছে আমি বর্তমানে আশ্রয় চাই; আমি বাড়ির যে কোন কাজ, পড়াশোনা-লেখালিখি কিংবা আরও অন্যান্য অনেক কাজ করতে পারব।

মনে রাখবেন, সুদীর্ঘ তিন বছরের বেশি সময় খুবই অসহায়ভাবে ও খুবই নির্মমভাবে আমি মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছি—এহেন দুরবস্থায় আমি একটু আশ্রয় চাই—এতে আপনিও যেমন আমাকে আশ্রয় দেবেন, তেমনি আপনিও কিছুটা আশ্বস্ত হবেন। আমি এখন অনেকটা সেরে উঠেছি।

ইতি

নলিনাক্ষ পুরকায়েত

গ্রাম: বাহাদুর

পোঃ ভালুকগোড়িয়া

জেলা: জলপাইগুড়ি

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ব্রোমাইড গ্যালিতে টেন-অন-টেন টাইপে ছাপা চিঠিখানা পড়া শেষ হতেই পালচৌধুরী হাউসের নবনীতা ইন্টারকমে একটা চেনা নম্বরে ডায়াল করল। চেনা গলা ভেসে উঠতেই বলল, নবনীতা বলছি। একবার আসুন তো মানিকবাবু—

ঢালা নিউজরুমের মাঝখানেই কাঠের পার্টিশনের আড়ালে নবনীতা বসে। শীত বলে ফুলহাতার ফ্লানেলের ব্লাউজ, তার ওপর ব্রোকেড করা আঁচল। মানিকলাল মিত্র ঘরে ঢুকে দেখল, মূর্তিমতী কন্ট্রাস্ট। লালচে ফর্সা গায়ের রঙের ওপর শাড়ি, ব্লাউজ, চোখ, চুল, নখ, মিলিয়ে নবনীতা নানা রঙের সমাহার।

ডেকেছেন ?

আচ্ছা মানিকবাবু। আপনি একজন সিনিয়র লোক। পুরনো জার্নালিস্ট। তাছাড়া লেখকও। এ চিঠি কম্পোজ করিয়েছেন ?

কোন্‌টা দেখি ?—বলে ব্রোমাইডের গ্যালি হাতে নিয়েই চিনতে পারল মানিক। সেই চারখানা চিঠির একখানা। হ্যাঁ—কী হয়েছে ?

এ তো পাগলের চিঠি ?

সাধারণ পাগল নয় মনে রাখবেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে যে সাফারিং আজ সবাইকে টেনে নামাচ্ছে—স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই—এমন একজন মানুষের কথা—এ চিঠি তো সবাই পড়বে। ভেতরে একটা না-বলা স্টোরি রয়েছে—যা কিনা সবাইকে এ-চিঠি পড়িয়ে ছাড়বে। আমার বিবেচনায় আমি তো ঠিকই করেছি—

বলছেন ?

একশ'বার। রীতিমত নাটকের ব্যাপার সারা চিঠিতে ছড়ানো। এর চেয়ে আলো নেই, রাস্তা চাই- চিঠি কি বেশি ইন্টারেস্টিং হত ?

আপনিই বলুন ?

মানিকলাল দেখল, নবনীতা যেন তার অ্যাঙ্গেল থেকে এবার চিঠিখানা বুঝতে চাইছে। তখন সে বলল, মানুষের ইতিহাস তো আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন—সাফারিংয়ের ইতিহাস।

খবরের কাগজ সাহিত্য ও নয়—উপন্যাসও নয়।

উপন্যাসের চেয়ে দীর্ঘায়ু সোসাল রিপোর্টিং আর কী আছে বলুন ? রোজ যে ছাপা হয়—রাজীব গান্ধী আরও বলেন—তাই ? আমরা যত বেশি করে মানুষের ভেতরকার গণ্ডগোল আকাঙ্ক্ষা, সাফারিং ছাপব—তত বেশি করে বিধানসভার রিপোর্ট স্টেল হতে থাকবে। স্টেল হতে থাকবে হাসপাতালের অন্তর্তদন্ত—

আপনি তো জানেন—সুপ্রভাতের অবস্থা।

জানি বলেই তো এ-সব চিঠি ছাপছি।

কিছুদিন আগে 'আমিই খনা—আমিই কুন্তী' ছেপেছিলেন—মনে আছে।

ছেপে তো ভাল রেজাল্ট পেয়েছি। পাঠক তো অবতার, দারোগা, বেকার, গুরু আর সেক্স নিয়েই মাথা ঘামায়। ভাবুন তো নবনীতা—আগরতলার এক শিক্ষয়িত্রী চারযুগ আর তাবৎ মানব সমাজকে তার এক্তিয়ার বলে ঘোষণা করেও—নিজেকে ভগবানের পার্টনার বলে দাবি করেও বারবার সশ্রদ্ধচিত্তে গোয়েন্দা আর পুলিসের কথা বলছেন। আমাদের পাঠকরাও তো তাই। অনেকেই মনে করে—লালবাজার থেকে ডি. সি. ডি. ডি. এসে দাঁড়ালে ক্রনিক ম্যালেরিয়াও পালাবার পথ পাবে না।

সুপ্রভাতের কথাও ভাববেন।

খুব ভাবি। এমনিতেই কম ছাপা হচ্ছে। নিউজপ্রিণ্টের অভাব। তারপর ইউনিয়নের গো স্লো। ডাক ফেল হয়ে সব জায়গায় কাগজ পৌঁছচ্ছে না।

আমিই বলছি মানিকবাবু। এর সঙ্গে যোগ দিন—খারাপ ছাপা। খারাপ ছবি। দাম বেশি—

কন্ট্রিবিউটররা পয়সা পাননি বছরখানেক। কেউ আর লেখা দেবে না। যারা কাজ করি—তাদের টাকা পয়সা জমা পড়ছে না—

আমরা মানিকবাবু ফাইনানসিয়াল ক্রাইসিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। যেখানে যুগান্তর, আজকাল, আনন্দবাজার, বর্তমান—সবাই এগিয়ে যাচ্ছে—সেখানে সুপ্রভাত ঘাড় গুঁজে পড়ে যাচ্ছে আমাদের তো এমন হবার কথা নয় নবনীতা—বলতে বলতে খবরের কাগজের বত্রিশ বছরের দাগী মানিক মিত্তির ভাল করে দেখল মেয়েটিকে। বরফের ওপর আলতা পড়ে গেলে যেমনই শীত আর রক্ত একসঙ্গে মনে আসে—তেমন ই মনে এল মানিকলালের। সে আস্তে বলল, সত্যি কথাই বলা ভাল। পাবলিকের চিঠি আসছে। দাম বেশি। ছাপা খারাপ। কাগজ পৌঁছয় না। আপনারা কি কাগজ চালাতে চান না?

নবনীতা সরাসরি মানিকলালের চোখে তাকাল। মানিকলাল দেখতে পেল, চার পুরুষ ধরে কাগজ চালানো বাড়ির মেয়ের চোখের কোণ লাল—ক্লান্ত বুঝি-বা খোঁচা খাওয়া। সে বলল, এভাবেই যদি কাগজ চালানো আপনাদের লক্ষ্য তাহলে আমায় এনেছিলেন কেন?

আপনি কি চান?

যে-কাগজে ডানা মেলে ওড়ার-এক্সপ্যানশনের টারগেট নেই—সেখানে আমি কি করব? আপনি কি চান মানিকবাবু?

থতমত খেয়ে গেল মানিকলাল। সে এখন আর যুবক নেই। জীবনের চারভাগের তিনভাগ তার বাঁচা হয়ে গেছে। এখন সে আর নতুন করে জেদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। একসময় তার নেশাই ছিল—ছিল কেন? এখনও সে নিজের রক্তের ভেতর—ইচ্ছের ভেতর যে দামামা শুনতে পায়—তার মানে

একটাই—ভাঙা হোক, ফুটো হোক—নৌকো হলেই হল—তাতেই সে পাড়ি দেবে। একখানা কাঠ হলেই হল। তা সে ভাসিয়ে নেবে। গড়ে নেবে। এই গড়ে তোলাই তার নেশা। অথচ নবনীতাদের পালচৌধুরী হাউস তাকে এনে এখানে বসিয়ে রেখেছে। ব্যবহার করেনি। তার হাতে কিছুই তুলে দেয়নি, যা নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

সে ভাল করে তাকাল নবনীতার মুখে। ছত্রিশ—সাঁইত্রিশ বা চল্লিশ-একচল্লিশও হতে পারে। বিয়ে হয়ে যাবার কয়েক বছর পরে চারপুরুষের কাগজবাড়িতে চেয়ার পেতে বসেছে। ওদের পয়লা পুরুষ বিদ্যাসাগরের চেলা ছিলেন। বাঙালীর জেগে ওঠার ইতিহাসের একটা দরকারি নাটবল্টু। সারা দেশের প্রথম ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টিংয়ে পয়লা রিপোর্টার। তার পরের পুরুষ কাগজের দুনিয়ায় এই বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। একদা যারা ভারত সরকারের মানিঅর্ডার ফর্ম ছাপত এখন তারা কত জায়গা থেকে কতরকমের কাগজ ছাপে—একখানার নাম দৈনিক সুপ্রভাত।

আপনি কি চান মানিকবাবু?

চাই তো অনেক কিছু। সবচেয়ে আগে দেখতে হবে যারা লিখতে পারে তাদের দিয়ে লেখাতে হবে।

আমাদের টাকা নেই। বাইরের কাউকে দিয়ে লেখাতে পারব না মানিকবাবু।

দরকার নেই। আমাদের এখানে যারা লিখতে পারে তাদের কথাই বলছি। সব কপি ব্রাশ আপ করতে হবে। রিপোর্টিংয়ের সবাইকে আগাম ব্রিফিং করতে হবে। তবে তৈরি কপি পাব। ঝকঝকে হেডিং চাই। চাই ঝকঝকে ছাপা—

সব একসঙ্গে হবে না মানিক বাবু। তবে সপ্তাহে তিনদিন কানাডিয়ান নিউজপ্রিন্ট দিলে—

অনেকটা এগিয়ে যেতে পারব আমরা।

আর সেই সঙ্গে টাইমলি ছাপা—টাইমলি ডেলিভারি—

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল নবনীতা। আর বাকি থাকল কি চাইবার আপনার!

এই ডুবন্ত সুপ্রভাতে এমন করে অনেকদিন কেউ হাসে না। তাই মানিক মিত্তির খুব মন দিয়ে হাসন্ত নবনীতাকে দেখছিল। ইংরেজিতে যাকে বলে Coy—সেরকম ছোটখাট টিপটাপ শরীর। বরফে আলতা পিছলানো গায়ের রঙ। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে এবার কলকাতায়। ফ্লানেলের ব্লাউজের ওপর চাদর চাপানোর জন্যে নবনীতাকে মনে হচ্ছিল সিংহাসন ছাড়াই কোন ক্ষমতার সোর্স।

মানিক মিত্তির খুব শান্ত গলায় বলল, কিছু জিনিস না দিলে তো সুপ্রভাতকে চাঙ্গা করা যাবে না।

হঠাৎ নবনীতা বলল, একটু কফি বলি। আপনার তো কোন তাড়া নেই?

মানিক হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না।

আপনি সুপ্রভাত নিয়ে খুব চিন্তা করেন—তাই না?

খবরের কাগজের চাকরি করি। এটা তো রাইটার্স বিল্ডিং নয় যে ফাইল ছেড়ে দিলাম আর অফিস ভুলে গেলাম? এখানকার রোজকার প্রোডাক্ট আমাদের পরিচয়—আইডেনটিটি। আমাদের স্বপ্ন, মেধা, স্বেদ—সব জড়িয়ে আছে যে—

আপনি তো খুব ভাল বাংলায় কথা বলেন। অবিশ্যি আপনি একজন লেখকও বটে—

সামান্য সামান্য লিখি।

আমি পড়িনি কিছু। মাফ করবেন। কিন্তু জানি—মানে সবাই জানে—সবার সঙ্গে আমিও জানি আপনি লিখে থাকেন। এত বিনয়ের কিছু নেই।

এবার কোন কথা বলল না মানিক মিত্তির। কি বলবে। নবনীতার জগৎ আলাদা। সেখানকার কিছুই সে জানে না। আর তার নিজের জগৎ আর একরকম। সে জগতের কিছুই জানে না নবনীতা।

কফি দিয়ে বেয়ারা চলে যেতেই নবনীতা সোজা হয়ে বসে প্রথম কথাই বলল, সুপ্রভাত যদি উঠেই যায়—তাতেই বা কি আসে যায়!

এ কি কথা বলছেন?

লেট হার ডাই অ্যা ন্যাচারাল ডেথ্! অনেকদিন তো কাগজে কাজ করলেন। অনেক বছর টেনশনে ভুগেছেন।

কি বলবে বুঝতে পারছিল না মানিক মিত্তির। কাগজ বাড়ির লোক হয়ে কাগজের মৃত্যু চায়?

আমার দাদা - কিংবা বাবা তো সুপ্রভাত নিয়ে এত মাথা ঘামায় না।

এবারও চুপ করে থাকতে হল মানিক মিত্তিরকে।

আমি তো কদিনের জন্যে বেরিয়ে পড়ছি। সুপ্রভাতের কথা একদম ভুলে গিয়ে একটা চা বাগানে উড়ে যাব। কটা দিন সেখানে কাটিয়ে আসব। চারদিন গ্রিন আর গ্রিন। আপনার হিংসে হচ্ছে না?

এবার লেখক মানিকলাল মিত্তির দেখতে পেল—তার নিজের মোটা মোটা হাতের আঙুলে—কালো রঙের হাতে আলতা পেছলানো বরফ রঙের হাত—আঙুল রেখেছে নবনীতা। অনেকদিনের বন্ধুর মতই টেবিলের ওপর রাখা তার হাতে হাত রেখেছে নবনীতা—পালচৌধুরী হাউসের বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ে।

এবারও কোন কথা বলতে পারল না মানিক মিত্তির। সুপ্রভাতের জন্যে উদ্বিগ্ন মানিকের মুখে তাকিয়ে নবনীতা। তার চোখে হাসি, কৃতজ্ঞতা সবকিছু একসঙ্গে মিশে রয়েছে। মানিক বুঝতে পারল না, একজন কর্মচারী হয়ে তার হিংসে হবে কোত্থেকে?

'এবার মানিকলাল মুখ খুলল। তার মুখে জড়তা ছিল। কেননা—তার এই বয়সে এখন যে-কথা সে বলতে যাবে—তা আদৌ মানাবে কিনা—সে ব্যাপারে তার ঘোর সন্দেহ রয়েছে। নিত্য শোকসভার মত সুপ্রভাতের এই অফিস বাড়িতে তার ইচ্ছে হল পালচৌধুরী হাউসের এই মেয়েটির মনে উৎসাহের বাতাস ভরে দেওয়া দরকার। তাই মানিকলাল বলল আজ আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে—

বলুন সুন্দরী। বাংলা ভুল হয়ে যাচ্ছে যে—

মানিকলাল জানে, সে ভুল বলেনি। কিন্তু নবনীতাকে সংশোধন করে কোন লাভ নেই। ওর পড়াশুনো ইংরাজি ঘেঁষা। পালচৌধুরী হাউসের বনেদ কিন্তু বাংলা—বাঙালীর ইতিহাসে শেকড় নামিয়ে দিয়েছে। এই কাগজ-বাড়ির প্রথম পুরুষ বিদ্যাসাগরের শাগরেদ। তার পরের জন—যিনি এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেন—তিনিও ষোলআনা বাঙালী।

মানিকলাল বলল, আপনাকে সেদিন তসরের শাড়ির ওপর ছাই রঙ চাদর গায়ে যা দেখাচ্ছিল—চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।

থ্যাঙ্কস্! এমন কথা আপনি ইন্দুলেখাকেও বলেছেন।

থতমত খেয়ে মানিকলাল বলল, কাউকে সুন্দর লাগলে আমি না বলে থাকতে পারি না—এখানে থেমে সে মনে মনে বুঝল, ইন্দুলেখাও বলে দিয়েছে নবনীতাকে।

নবনীতা বলল, ভাল লাগলে বলবেনই তো। কিন্তু বুঝেসুঝে বলবেন।

ঘরের বাইরে টেলিপ্রিন্টারের খটাখট। তার ভেতরেই নবনীতা জানতে চাইল, আপনি সুসানকে কি বলেছেন?

মনে পড়ছে না তো—

মনে করে দেখুন।

কি বলে থাকব হয়ত।

আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করে গেছে।

মানিকলাল মিত্র চুপ করে থাকল। নবনীতা হেসে বলল, তাকেও আপনি সুন্দরী বলেছেন। আরও যেন কি বলেছেন—

মনে পড়ছে না।

ভুলে যাওয়াই ভাল। স্তুতিতে আপনি এত ল্যাভিস্! আমাকে কমপ্লেন করে থেমে থাকেনি সুসান। জানেন তো অফিসের আবহাওয়া ভাল নয়। যেকোন সময় ফেটে পড়তে পারে।

এ কথা বলছেন কেন?

আপনার কথা আমি স্পোর্টিংলি নেব। কিন্তু সুসান নেয়নি।

তাই নাকি?

ও ইউনিয়নে কমপ্লেন করেছে—

ওরে বাবা!

হ্যাঁ। আমার যা খবর—ওরা সুসানকে বলেছে - এবার কিছু বললেই আমাদের জানাবেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেব।

কথাটা শুনে মানিকলালের মেরুদণ্ড দিয়ে একটা সাপ নেমে গেল। সে পরিষ্কার দেখতে পেল—বিরাট নিউজরুমের ভেতর দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে ইউনিয়ন এসে তার অ্যালকোভের সামনে দাঁড়িয়েছে। এবার কৈফিয়ৎ চাইবে। সুসানকে কি বলেছেন? অ্যাঁ?

মানিকলালের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ওরে বাব্বা!

নবনীতা বলল, সবটাই আসলে মিডল এজ প্রবলেম। ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ বা না—কিছুই না বলে মানিকলাল বলল, সন্ধ্যের দিকে মনে হয়—সারাটা অফিস কেমন অন্ধকার ছোট হয়ে আসছে। আমার যাবার কোন জায়গা নেই—

কেন? আপনাদের প্রেস ক্লাবে গেলে পারেন—

এক ঘেয়ে। একই মানুষজন। একই কথা। কোথায় যাব? এক এক সময় মনে হয় - আমিও আশ্রয়প্রার্থী—আমিও একজন নলিনাক্ষ পুরকায়েত—

কার কথা বলছেন?

ওই যে—আশ্রয়প্রার্থী বলে যিনি চিঠি লিখেছেন। আমার ইচ্ছে করে সুন্দর কোন জিনিসের ছায়ায় বসি। সুন্দর কোন জিনিসে হেলান দিয়ে একটু জিরিয়ে নিই। যেখানে রূপ আছে জোর আছে এমন কোন জায়গায় চলে যাই—

নবনীতা এতক্ষণ মানিকলালের মুখে তাকিয়েছিল। এবার বলল, এত টেনশন কেন আপনার। রিলাক্স করুন। সব সময় দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকার কোন মানে হয় না—

আমি থাকতেও চাই না। খানিকটা হুইস্কির পর ভাল রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে মনের মত বই পড়তে পেলে - আঃ! আর কিছু চাই না। আমার নার্ভ ঢিলে হয়ে আসে।

কিছু মনে করবেন না। মিসেসকে নিয়ে কোথাও যেতে পারেন।

অবাক হয়ে তাকাল মানিকলাল। সে তো একজন কর্মচারী। এ কথা এমনভাবে তো বলার কথা নয় নবনীতার। কিংবা এটাই হয়ত বলার কথা। এটাই মডার্ন ম্যানেজমেণ্ট।

নবনীতা বলল, তাকেও তো ওসব কথা বলতে পারেন।

কোন্ কথা?

ইন্দুলেখা, সুসানকে—আমাকে যা বলেছেন!

ওঃ! ভয় করে। আর বলি?

কেন? কেন?

যদি ইউনিয়নকে বলে দেয়!

প্রায় হো হো করে হেসে উঠল নবনীতা। আর সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রভাত সমেত সারা তল্লাট ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল।

নড়বেন না মানিকবাবু। কফির কাপ রয়েছে টেবিলে—এমারজেন্সি লাইটও আজ দুদিন জ্বলছে না।

মানিকলাল মিত্র অন্ধকারে সাহসী হয়ে উঠল। আলতা পেছলানো বরফ রঙ অন্ধকারে দেখা যায় না। শক্ত হাতে সে ছুঁয়ে দেখল। তার বুকের কাছে এখন দামী পারফিউমের গন্ধ ভুর ভুর করে ছড়িয়ে পড়ছে। মানিকলাল দু-হাতে চেপে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে নবনীতা তার আঙুলের নখ বসিয়ে দিল মানিকলালের হাতে—কনুইয়ের ওপরে যেখানে যেটুকু পারল। এলোপাথাড়ি। নিঃশব্দে।

ছয়

সুপ্রভাতের বিজ্ঞাপন বিভাগ একের নম্বরের অপদার্থ। আশি বছরের পুরনো দৈনিক। তাই বিজ্ঞাপন যা-আসে তার বেশির ভাগই আপনা-আপনি পায়ে হেঁটে আসে। মানিক মিত্তির পাঠকের মতামতেও এখন অনেক চিঠি পায় যার ভেতর বিজ্ঞাপনের খনি লুকিয়ে আছে। চিঠি পড়তে পড়তে সে একবার জানলায় তাকাল। এখন শীত যাবার সময় তার শেষ কামড় দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় বেরলেই কমলালেবু, উল, লাল-নীল-বেগুনী, জাম্পার। ক'দিনের জন্যে কলকাতা খুবই রঙিন। গরম নেই। পুরনো কথা খুব মনে পড়ে।

এত রঙের ভেতর আমার জীবনটা কেমন হল? তিরিশ বত্রিশ বছর বিকেল দেখিনি। টেলিপ্রিণ্টারের আওয়াজের ভেতর এত বছরে বিকেল কেটে গেল খবরের কাগজের অফিসে। যৌবনের সবচেয়ে সেরা সময়টা দুই কনুই নিউজ-রুমের টেবিলে রেখে খবর যাচাই, বাছাই করলাম। অন্যের খবর—অন্যের ব্যাপার নিয়ে মেতে রইলাম।

আমার খবর কি? আমি কেমন আছি? প্রয়োজন আর দরকারের গর্তগুলো ভরাট করতে কাগজে কাজ করেছি। গল্প লিখেছি। উপন্যাস লিখেছি। প্রবন্ধ। মতামত। কোনদিকে চলেছি জানি না।

লিখে লিখে পাঠক হয়েছে। পাঠিকা হয়েছে। লাইব্রেরিতে বই ইস্যু হয়। পুরস্কারগুলো কানের পাশ দিয়ে চলে যায়। ছবি করার জন্যে লোকে গল্প কেনে। ফাইনানসিয়ার পায় না। শেষ অব্দি ছবি ওঠে না।

আমার বড়ছেলে বর্ডারের রাস্তা বানায়। তাঁবুতে থাকে। ওদের মাকে

চিঠি লেখে। তাতে শুধু থাকে—বাবা কেমন আছে ? ছোট ছেলে মফঃস্বলে কলেজে পড়ায়। সেখানে নতুন বউ নিয়ে বাসা ভাড়া করেছে। সন্ধ্যেবেলা লোডশেডিং হলে আমি আর বেলা বারান্দায় অন্ধকারে বসে থাকি। বেতের চেয়ারে মুখোমুখি। বড়ছেলের একত্রিশ। তাকে বিয়ে দেওয়া দরকার। ছোটছেলের বাড়িতে একটি রান্নার লোক দরকার। বউমা স্কুলে পড়ায়। বড় আর ছোট অল্প বয়সে কেমন ছিল—কি করত—এই সব কথা মনে পড়ে। তাই নিয়ে আমি আর বেলা অন্ধকারে গল্প করি। কারেণ্ট এলে বেলা খট করে উঠে গিয়ে টি ভি-তে সিরিয়াল দেখে। আমি দেখি না। মাথায় আর গল্প ভাল লাগে না। আশ্চর্য! অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সনৎ নন্দীরা লিখে যাচ্ছে। পৃথিবীতে কত গল্প। আমার আর ভাল লাগে না বলেই যা লিখি তা খুব খারাপ হয়। ওদের মত ভাল হয় না। আসলে আমি ফুরিয়ে গেছি। বহুদিন ধরে নতুন থাকা যে কত কঠিন। নতুন কী করে থাকে ? কিসে মানুষ নতুন হয় ? এই শরীরটা তো চল্লিশেই পুরনো লাগে। তার পরেও ষোল সতের বছর চলে গেল। ব্লেডে হাত কেটে গেলে আমরা কত যত্ন করি। পোড়াবার সময় আবার এই শরীর বাঁশের বাড়ি দিয়ে আগুনের আওতায় ঠেলে দিই।

উঃ। বার বছর হয়ে গেল কোন ধারাবাহিক উপন্যাস লিখিনি। শেষেরটা লেখার সময় চল্লিশের রং সাইডে ছিলাম। দেড় বছর ধরে উপন্যাসের চরিত্রগুলো আমার ভেতরে বাসা করেছিল। কলকাতার বাইরে গিয়েও তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি—বুঁদ অবস্থা—তারা আমায় তাড়া করিয়ে লেখাত।

এখন আমি কিছুতেই বুঁদ হই না। পুরনো হয়ে গেছি ? নতুন হয় কিসে ?

খাম খুলে নতুন চিঠি খুললেন মানিক মিত্তির।

District Judge Court

Purnea

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

অনুরোধের সহিত আমি আপনাকে জানাতে চাইছি যে আমি পূর্ণিয়া জর্জ কোর্টে বড়বাবুর পদে চাকরি করি। আমার ১০ বৎসর চাকরি এখনও বাকি আছে। আমি সরকারি ঘরে থাকি ২৪০০, টাকা মাইনে পাই। আমার নিজস্ব গাড়ি বাড়ি আছে। আমার দুই মেয়ে বড়। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা খুব সুখে আছে। আমার তিন ছেলে। বড় B. Sc. final দিয়েছে। মেজ B. Sc. Admission নিয়েছে। ছোট এই মার্চে School Final দিবে। আমার সব কিছুই আছে। কিন্তু থাকতেও না থাকা অনুভব করছি। কারণ, আমার স্ত্রী (wife) গত ২৫শে ডিসেম্বর হঠাৎ Stroke হওয়ায় মারা গেছেন।

আমার ছেলেমেয়েরা খুব মাতৃভক্ত ছিল। তাই তারা খুব ভেঙে পড়েছে।

আমার ছোটছেলে মায়ের এত পেয়ারের ছিল যে তার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তার এই ক্ষতিটা পূরণ যে কি করে করি বুঝতে পারছি না। আমরা সকলেই এখন চাকরের হাতে। ঘরগৃহস্থ যেন অন্ধকারে ডুবা। ছেলেরা কেউ established নয় যে তাদের বিয়ে দিই। তাই আমার একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে অনেকেই গরীব-অনাথা মেয়ের বাবা আছেন। আমার বিয়ে করার কোন বিশেষ বয়স নাই বা sexual স্পৃহাও না থাকার মত তথাপি ছেলেদের মুখ দেখে একটা 2nd Marriage করতে পারি যদি কোন ভদ্রমহিলা তাদের মাতৃস্থ স্থান দিতে পারেন।

আমার বর্তমান বয়স ৪৮ বৎসর। মেয়ের বয়স ৩৫-৪০ মাঝামাঝি হওয়া চাই। কোন যৌবনবতী মেয়েকে বিয়ে আমি করব না। আমরা সৌকালীন গোত্র কায়স্থ। বাঙালী মেয়ে বয়স্থা বিধবা নিঃসন্তান হলেও চলবে। মেয়ে কিন্তু আদর্শ হওয়া চাই যেন এই ছেলে-মেয়েদের মায়ের চাইতেও বেশি আব্দার দিতে পারে। এই বিয়ে আদর্শ বিবাহ মন্দিরে হবে।

দাদা আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার ছেলেমেয়েদের উপর সহানুভূতিপূর্বক এই রকম একটা Advertisement ছেপে দিন। তার কি করতে হবে জানান। সেই জন্য আমার ঠিকানা দিয়ে খাম দিলাম। যদি কিছু একটা যোগাড় করে দিতে পারেন তাহা হইলে খুবই কৃতজ্ঞ হইতাম।

Short advertise করুন এবং সাক্ষাতে কেউ এলে তাদের সাথে detail বলে আমার সাথে যোগাযোগ করিতে বলুন।

ইতি
প্রণাম
বিমলকুমার দত্ত
Sherestadar
সিভিল কোর্ট-পূর্ণিয়া

কৃতজ্ঞ আর কৃতঘ্নের ফারাক গুলিয়ে ফেলেছে। বিয়ে পাগলা এখন মাতৃহীন ছেলেদের দোহাই পেড়ে ঝুলে পড়তে চায়। এ চিঠি ছাপা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞাপন হয় ভাল। বিজ্ঞাপন দফতর এই বিমলকুমারকে কাল্টিভেট করলে চাই কি সারা পূর্ণিয়ার প্রবাসী বাঙালী আস্তে আস্তে সুপ্রভাতের বিজ্ঞাপনের পাতায় উঠে আসতে পারে। প্রবাসীরা অনেকেই কলকাতার সম্পাদককে নিকটজন ভাবে।

ওই তো নবনীতা দূর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পি. টি. এস-এর ঘরে যাচ্ছে। বেশ ক'দিন মুখোমুখি হওয়া হয়নি। সে এই মেয়েটির—মেয়েটিই বা বলে কি করে! সাঁইত্রিশ হতে পারে। তেতাল্লিশও হতে পারে। সুপ্রভাতের ভাঙা হাল ছেঁড়া পাল মেরামত করতে বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তাঘাট সুলুকসন্ধান জানা

নেই। নিরাশ হয়ে পড়লে নিশ্চয় বলে বসবে—লেট হার ডাই অ্যা ন্যাচারাল ডেথ্।'

বিরাট হলঘরের এই মাথা থেকে আরেক মাথায় চলেছে নবনীতা। ধারালো, রঙিন, ক্লান্ত। বিয়ে পাগলা এই সেরেস্তাদারের চেয়েও আমি প্রায় দশ বছরের বড়। আমার ছেলেরা এসটাবলিশড্। শুধু বড়র বিয়ে দেওয়া বাকি। বেলা স্ট্রোকে মারা যায়নি। আমার গরীব কোন অনাথিনীর দরকার নেই একদম। কিন্তু আমি কি এই বিমলকুমার দত্তর মত যৌবনবতীতে ভয় পাই? আমারও কি ওর মত সেকস্যুয়াল স্পৃহা না থাকারই মত? কে জানে!

পৃথিবীতে সবাই ব্যস্ত। মাঝরাতে ট্রেন ছুটছে মাঠের ভেতর দিয়ে। পূর্ণিয়া সিভিল কোর্ট থেকে প্রবাসী বড়বাবু কোটিপতি মালিক সম্পাদককে দাদা স্থানে পার্সোনাল প্রবলেম জানিয়ে পরামর্শ চাইছে। রোজ টাইমলি সূর্য উঠছে। কতলোক সিগারেটে ভীম টান দিয়ে সুখ পাচ্ছে। আমি যেন ব্যস্ত হতে পারছি না সেরকম? একেবারে নেশার মত ঘুরপাক খাওয়া? ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া? কারও জন্যে একদম মরে যাওয়া? জেগে আছি তো জেগেই আছি। আবার ঘুমোচ্ছি তো ঘুমোচ্ছিই।

এই যে মানিকদা—

তুমি? এই সন্ধ্যেবেলা?

বাঃ! অফিসের পরে তো আসবো। কাল আমাদের অল ইণ্ডিয়া বন মহোৎসব। বটানিকালের বটগাছটাকে বাঁচাবার জন্যে সায়ান্টিস্টরা কী করছেন তাই জানতে এসেছি।

তুমি সেই অফিসেই আছ?

কোথায় যাব! প্রোমোশন পেয়ে আমি এখন পাবলিক রিলেশন ম্যানেজার। ইণ্ডিয়া গভমেণ্টের চাকরি। তাহলে তো অনেক টাকা মাইনে পাও। বিয়ে করিনি। সস্তার ভাড়ায় মাকে নিয়ে থাকি। সব পয়সাই জমাই। তাহলে দীপু আমায় বিয়ে করলে না কেন?

তুমি তখন জোর করনি কেন মানিকদা। সে তো অনেকদিনের কথা।

আমি তোমার দাদার ক্লাসফ্রেণ্ড। তুমি আমায় রিফিউজ করলে। আমি কী করে জোর করব?

তবু জোর করতে হয় মানিকদা। আমার তখন কী বা বয়স! কতটুকু বুঝতাম? যাক্ গিয়ে - এই হ্যাণ্ডআউটগুলো ছেপে দাও তো।

এটা বাংলা কাগজ। বাংলা করে নিয়ে এস। তাহলে ছাপব।

বাংলা তো করা নেই। তাহলে ইংরেজিগুলো? স্টেটসম্যান–টেলিগ্রাফে গিয়ে দিয়ে আসি।

মাসীমা কেমন আছেন?

মায়ের একটা সুখবর আছে। তুমি যে কাগজপত্র দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলে—তাতে মা গতমাস থেকে বাবার পেনশন পেতে শুরু করেছে। তুমি কোনদিকে যাবে ?

আমায়—চৌরঙ্গীতে নামিয়ে দিতে পার। গাড়ি আছে তো।

হুঁ, বেশ তো।

অনেকদিন পরে পাশাপাশি বসে দীপুর কাঁধে হাত রাখল মানিক। তোরও তো বয়স হল।

তা তো হবেই। শাড়ি সরিয়ে একটা টোকা দিয়ে ত্থাখো। একটুও টসকাইনি। জান মানিকদা—এখনও মনে পড়ে—কলেজ গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছ—আমরা সবে ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছি—কী সুন্দর ত্থাখাতো তোমায়—আমাদের ক্লাসের একটা পাঞ্জাবী মেয়ে তোমায় নাম দিয়েছিল—হ্যাপি প্রিন্স। অবিশ্বাস্য রকমের ঝকঝকে ছিলে—

তখনই আমি আনহ্যাপি প্রিন্স দীপু। ডিসকলোজয়েট্ হচ্ছি। গোলমেলে পলিটিক্স। তুই ভীষণ খারাপ ব্যবহার করছিস। জীবন যেমন হয়ে গেল শেষমেশ।

তোকে—পেলাম না—

কেন ? বেশ তো করেছো। ছেলেরা আয় করছে। বই লিখছ। লোকে পড়ে। বউদিকে সেদিন দেখলাম কোথায়। বেশ দেখতে আছে এখনো। সুন্দরী—ইচ্ছে করলেই আমায় পেতে পার। আমি এখনো কেমন আছি—কাপড় সরিয়ে ত্থাখ। একটুও টোল খাইনি।

হুঁ। সুন্দরী।

আমি নামি এখানে—

ভিড়ের ভেতর মিশে গেল মানিকলাল মিত্র। শীতের ধোঁয়া ঢালা সন্ধ্যায় চৌরঙ্গার চোখ উঠেছে মনে হবে। দূরে দাঁড়িয়ে মানিক দেখল, দীপুর গাড়িটা গিয়ে একটা মদের দোকানের সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার নেমে গিয়ে দোকানে ঢুকল। দীপুর জন্যে মানিকলালের ভেতরটা পাটকাঠি হয়ে ধক ধক করে জ্বলে উঠল। দীপুর দাদা বিয়ে করে কবে আলাদা হয়ে যায়। দীপুর ভাগে পড়েছিল বিধবা মা। আর একটা ছোট ভাই। তাকে চাকরি করে দিয়েছিল। এবাজারে ব্যাপারটা খুব কঠিন। পনের কুড়ি বছর আগে তখনই দীপু নিজের অফিসে কিছু উদার হয়ে ভাইকে চাকরি করে দেয়। বিয়েও দিয়েছিল। সে-ভাই হঠাৎ মারা যেতে তার বউটিও বাপের বাড়ি চলে গেল। সেই থেকে অফিসের পরেও দীপুর আরেকটা জীবন শুরু হয়। এসব কখনো সে দেখতে পেয়েছে। কিছু শুনতে পেয়েছে। কলকাতা এত বড়। সব কিছু করেও এর ভেতর মিশে থাকা যায়।

কিছুতেই আর ফিরে জীবন শুরু করা যায় না। সেই না-জানা ভবিষ্যতের সামনে ড্যাং ড্যাং করে ঝুলতে থাকা জীবন—যার অনেকটাই অনিশ্চিত—সবসময় মনে হত ভবিষ্যতের পেটে কত রঙিন সব ঘটনা অপেক্ষা করে আছে।

এখন আমি কোথায় যাব? বাড়িতে? বন্ধুদের কাছে? গঙ্গার কাছে? ডাক্তারের কাছে? দীপুর কাছে? ওর শাড়ি সরিয়ে যদি দেখিও—ও কোথাও টোল খায়নি—তাতেই বা আমার কি? পৃথিবীরই বা কি? এতগুলো বছরে এখানে কত নতুন মানুষ জন্মে বড় হয়ে গেল। তাদেরও কারও কারও এখন দাঁতে ব্যথা হয়।

হাঁটতে হাঁটতে গাঁজা পার্কের গায়ে ঢুকে পড়ল মানিকলাল। টিনের চালের নিচে খোলামেলা বিরাট আনন্দ। কোন দেওয়াল নেই। খোলা আকাশ। ট্রাউজারের ভেতর শার্ট গোজা মানিকলাল কাউন্টার থেকে একটা বড় বোতল নিল। ৭৫০ মিলি লিটার। সঙ্গে সস্তার জাল সোডা। এখানে হুইস্কি পাওয়া যায় না। ভদ্রেশ্বর ডিস্ট্রিলারির বাংলা। একটু খিদে খিদে ভাব। ঠিক এই অবস্থায় সোডা মিশিয়ে সে খানিকক্ষণের ভেতর তিন গ্লাস ভেতরে পাঠাল। ভেতরে নামার সময় একেবারে খার।

এবার মানিকলালের খুব ভাল লাগতে লাগল। সান্ধ্যরাতের পর চিনচিনে খিদের ওপর এভাবে সোডা মেশানো গোলমাল শরীরের ভেতর এমন একটা তুলকালাম জুড়ে দেয়—যা কিনা তার টানটান স্নায়ু ঢিলে করে দিয়ে তার ওপর তরল ক্যাডবেরি প্রায় লদলদে আহ্লাদ ঢেলে দেয়। কত লোক একসঙ্গে এখানে খাচ্ছে। দু'জন ফর্সা ঠেলাওয়ালা—বেশ বয়স হয়েছে—এরাই কালোয়ারের লোহা বোঝাই ঠেলা নিয়ে যায় হয়ত—বেঞ্চে জায়গা না পেয়ে দিব্যি মেঝেতে বসে মাটির ভাড়ে ঢেলে ঢেলে খাচ্ছিল। সামনে শালপাতায় নুন আর কল বের করা ছোলা। মুখে ব্রজেন শীলের প্রশান্তি। চোখে কষ্টে আয় করা অবসর। এত ভাল লাগল মানিকলাল মিত্রের। আমি প্রায় তিরিশ বছর লিখে এখন কি এই অবসরের দিকে অমন করে তাকাতে পারি?

ট্রাউজারের পকেট থেকে দেশলাই বের করতে গিয়ে একখানা খাম উঠে এল। তারই নাম ঠিকানা লেখা। চিঠির বাণ্ডিলে খামখানা পেয়ে পকেটে রাখা। খোলা হয়নি। সিগারেট না ধরিয়ে খাম ছিঁড়ে চিঠি খুলল। গোটা গোটা অক্ষর। মেয়েলী হাতের লেখা। শেষে নামটা দেখল, মানিকলাল।

প্রণতা—

কুমারী জয়শ্রী পালিত

সিগারেটের ধোঁয়া। ভদ্রেশ্বরের ডিস্টিলারিতে গুড় থেকে তৈরি শাদা চাপা বাংলার মিঠে গন্ধ। কাশির আওয়াজ। কারও টেবিলে কাটা আনারসের ফালি। নিয়নের আলোয় সব মুখ তেল তেলে।

শ্রদ্ধেয় মানিকলাল মিত্র সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি আপনার একজন অতি সাধারণ অথচ একনিষ্ঠ গুণগ্রাহী। কৈশোরের উন্মেষকাল হইতে অদ্য যৌবনের মধ্য পর্যায়ে আসিয়াও আপনার লেখা—তাহার মর্মের লিপি সমানভাবে পাঠ করিয়া আসিতেছি।

আমি বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক। বর্তমানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠন পাঠন করিতেছি। কিন্তু বাণিজ্য শাখার নীরস শুষ্ক মরুভূমিতে আপনার লেখার গভীর মর্মবাণী কী পরিতৃপ্তি, কি নিবিড় আনন্দ আনিয়া দেয় তাহা ভাষায় কিরূপে বর্ণনা করিব।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অদ্য একবিংশ বয়স পর্যন্ত গোপনে এবং প্রকাশ্যে, শান্তির বোঝা মস্তকে লইয়া অথবা সকলের সানন্দ অনুমতিতে আপনার প্রায় সকল উপন্যাস ফিরিয়া ফিরিয়া পড়িয়াছি—যাহা আর কি লাইব্রেরিতে পাইয়াছি। তন্মধ্যে তিনখানি গ্রন্থের বিশেষ অংশের কথা আপনাকে না জানাইয়া পারিতেছি না।

[এরপর হাতের লেখা এতই জড়িয়ে গেছে—ভারি চোখে চশমা লাগিয়েও মানিকলাল পড়তে পারল না,]

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ হইতে স্বর্গের পরের জংশন বইখানি খরিদ করিয়া আনেন। যাহাই হউক—এই গ্রন্থে মৃত্যু যেন Dancing death—মনোহর ফণা তুলিয়া বিষধর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পড়িতে পড়িতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অনুভূতির কবলে না পোঁছলে এমন শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে।

ধন্য আপনার অনুভবশক্তি। এমত আরও কতশত উদাহরণ ছড়াইয়া আছে আপনার সমগ্র রচনায়—সারা লেখায়—আপনার দীর্ঘ জীবনের কত শত লেখায়।

আমার মাতা ঠাকুরানী আমার পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। তিনি বলিতেন, কাহাকেও ভালবাসার অর্থ তাহার ভালতে বসবাস করা। ইষ্টদেবের কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন শান্তিতে, স্বস্তিতে জীবন যাপন করেন। আপনার সুখেই আমার আনন্দ নিহিত থাকিবে।

পূজ্যপদে প্রণাম এবং ঘনিষ্ঠদিগকে স্নেহাশীর্বাদ জানাইলাম।

মানিক মিত্তিরের চিবুকের নিচে এখন সেই অদৃশ্য কোঁচকানি চলছিল—যা কিনা এই নেশার আরাম। নিজের চিবুকের নিচেটা কেউই দেখতে পায় না। সেখানে দগ দগ করে খানিকটা জায়গা কুঁচকে ছোট হয়—বড় হয় আপনা আপনি। সেটাই একটা আরাম।

ভারি শরীরটা নিয়ে মানিকলাল উঠে দাঁড়াল। এখানে তাকে কেউ চেনে না। তাই এত আরাম। অপরিচিত অজানা লোক হয়ে মদ খেতে এত ভাল লাগে। আরও ভাল লাগত - যদি সে এখন বেসামাল হয়ে একটা বড় গোলমাল পাকাতে পারত। এই চাতালের সব লোক দু'ভাগ হয়ে যেত। একদিকে সে নিজে। দাঁড়ালে নাভির নিচে সব টেবিলের হাইট। লাথি দিয়ে তখন এক একটা টেবিল উল্টে দিত মানিকলাল। কাউন্টারে বোতল ফেরত দিয়ে পয়সা নেওয়ার বদলে এলোপাথারি বোতল চালাত। ভাঙা কাঁচ, ওলটানো বেঞ্চ আর টেবিল টপকে একসময় বাইরে বেরিয়ে পড়ত।

একটু একটু করে লেখক হতে হতে ভদ্রতা, প্রতিষ্ঠায়—লেখার সঙ্গে মানানসই গম্ভীরভাব ফুটিয়ে তুলতে তুলতে সে নিজেই একজন প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে - যার নাম মানিকলাল। পাঠকরা আজকাল আর মিত্র বা মিত্তির বলার পরিশ্রম করে না। শুধু মানিকলালই এখন তার পরিবারের সাইনবোর্ড। এই ঠাঁট, চালচলন প্লাবনের মতই তাকে আগাগোড়া ভাসিয়ে দিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেছে এ ক'বছরে। এখন সে তার চারদিককার বেড়া দেওয়া গাছপালার গন্ধ পায় শুধু। পায়ের নিচে শুধু সেইসব গাছের শেকড়ই টের পায়।

অথচ এর বাইরেও কত গাছ আছে। সেসব গাছের মাথায় আরও কত বড় জড়িয়ে পড়া আকাশ। কিন্তু আমি আমার চৌহদ্দির ভেতর শুধু শিকড় গেড়ে বসা কিছু কুড়োটে ধ্যানধারণার দাস। আমি যে ইনভেডেড্ বাই রেসপেকটিবিলিটি। কোথায় সেই না-জানা ভবিষ্যতের সামনে ড্যাং ড্যাং করে ঝুলতে থাকা জীবন ?—যার অনেকটাই অনিশ্চিত—সব সময় মনে হত ভবিষ্যতের পেটে কত রঙিন সব ঘটনা অপেক্ষা করে আছে।

গাঁজা পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়াল মানিকলাল। শীত ও আছে। ধোঁয়াও আছে। দ্বারিকের দোকানের ছাদে গুঁড়ো সাবানের ঢাউস হোর্ডিং। তার এক হাত উঁচুতেই প্রাচীন চাঁদ। গোল। হলুদ। আজ কি পূর্ণিমা ?

বুক পকেটে হাত দিয়ে চাপ দিল। তার পকেটে এখন কুমারী জয়শ্রী পালিত। 'আপনার সুখেই আমার আনন্দ নিহিত থাকিবে।' খটোমটো বাংলা। 'কাহাকেও ভালবাসার অর্থ তাহার ভালতে বসবাস করা'। বাঃ! কত অল্পকথায় সব কথা। বয়স মোটে 'ত্রাবিংশ!' এর ভেতরেই যৌবনের মধ্য পর্যায়ে' পৌঁছে গেল ?

আসলে যৌবনও জানে না। ভালবাসাও জানে না। অথচ আমার লেখা পড়ে আসছে। মাত্র তের বছর বয়স থেকে। আশ্চর্য!

সাত

এ কি তোমায় খামচালো কে এ যে পেকে উঠেছে—

বেলার হাত সরিয়ে মানিকলাল বলল, বোরোলিন তো দিয়েছি।

খামচালো কে ?

অফিসে—

অফিসে ?

ক্যান্টিন থেকে একটা বেড়াল এসে কখন ঢুকেছে টেবিলের নিচে—দেখতে পাইনি। চেয়ার টেনে বসতে যাবো—অমনি ফ্যাঁচ্ করে উঠে এসে—

কেমন করে ? অফিসের ভেতর বেড়াল ?

মাড়িয়ে দিতেই লাফ দিয়ে উঠে আঁচড়েই দৌড়।

বেলা একবার স্বামীর মুখে তাকাল। একবার হাতে তাকাল। কনুইয়ের পর থেকে দফায় দফায় প্রায় দশ বারো জায়গায় আঁচড়ে দিয়েছে বেড়াল।

আমায় বলনি তো ?

এ আবার বলার মত নাকি !

বেলা বলল, দাড়ি কাটতে গিয়ে গাল কাটলে আমি ফটকিরি ঘষে দিয়ে থাকি—আর বেড়াল আঁচড়ালো—আমি জানতে পারব না ? অবাক করলে যা হোক ?

মানিকলাল সরাসরি তার বউয়ের চোখে তাকাতে পারল না। খুব আস্তে বলল, আমাদের প্রায় তিরিশ বছর হল বিয়ে হয়েছে। বলতে পারো—এক দিন তুমি আমায় গলা জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছো ? নিজের থেকে ?

ও সব ন্যাকামি আমি পারি না।

ওটা ন্যাকামি নয় বেলা। অনিলকে তার বউ সবার সামনে পিঠে হাত রেখে বলতে দেখেছে—হ্যালো ? খেয়েছ ?

তোমাদের লেখকদের ওসব হ্যাঁগো ওগো ন্যাকমি আমাদের আসতেই চায় না।

মানিকলাল খুব মন দিয়ে তার বউকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরিপ করল। টাকির কাছে নদীর ধারের মেয়ে। ঘুমন্ত বেলার পা বেরিয়ে থাকলে। মানিকলালের আজও দেখতে ভাল লাগে। গাঢ় রংয়ের ব্লাউজ গায়ে বেলা এক এক সময় সন্ধ্যেরাতের অন্ধকার বারান্দায় ছবির মত ফুটে উঠে—বলা ভাল ঝলসে ওঠে। তখনও না তাকিয়ে পারে না মানিকলাল। তবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। যদিও বেলা তার নিজের বিয়ে করা বউ। পাছে সরাসরি তাকালে বেলা ভ্রূ কোঁচকায় ? কিংবা বলে বসে এ কি ন্যাকামো হচ্ছে ?

এত গম্ভীর হয়ে দু'খানা হাত থানার বড়বাবুর মতই পেছনে রেখে বেলা

একা একা পায়চারি করে বারান্দায়। শরীর সুস্থ রাখতে তার এই পায়চারি। নিয়মে থাকা সুশ্রী ভরাট মুখ—ভরাট বুক। দুপুরে খাবার পর রাতটা বেলা অনেকদিনই খায় না। কিংবা হালকা কিছু খায়। তাই বড় ছেলের একত্রিশ হয়ে গেলেও মা হিসেবে বেলা এখন বছর তিরিশেকের মেয়েদের মতই কোমর নিয়ে হেঁটে চলে বেড়ায়।

তুমি কার জন্যে ? কি বজায় রাখতে এত গম্ভীর হয়ে—একটুও ন্যাকামো না করে আছো ?

গম্ভীর তো নয়। আমি তো এমনিই। শুধু শুধু বেচাল হব কেন বলতে পার ? তাহলে এইটেই তোমার চাল ? এ চাল তোমায় কোথাও পৌঁছে দেবে না বেলা—

আমার তো কোথাও পৌঁছানোর দরকার নেই। আমার দুই ছেলে বড়। একজনের বিয়ে বাকি। আমি তো লেখক নই। আমার জায়গায় আমি আছি।

হ্যাঁ। আছ। পাথরের মত আছ।

যদি নাড়াতে না পার সে তোমারই দোষ। আমার দরকার হলে ছোটর কাছে চলে যাব। দরকার হলে বড়ছেলে আমায় নিয়ে যাবে।

এ মেয়েলোককে কী করে বোঝাবে—লেখক বাদ দিয়েও শুধু মানিকলাল নামে তার একজন স্বামী আছে। সেই স্বামীর জন্যেও তো বেলা খানিক বেচাল হতে পারে। এই গুরুগম্ভীর সাইনবোর্ডভাব বজায় রেখে কী লাভ—কী আনন্দ হচ্ছে বেলার তা শুধু ও-ই জানে।

মানিকলাল মুখে বলল, বাড়িতে সুন্দরী বউ থাকতেও আগেকার রইস মানুষজন বাঈজি বাড়ি যেত কেন জান ?

বেচাল চালের স্বাদ নিতে !

তা বলতে পার। ঠাকুরঘর, ব্রত, আতুড়, শিবের উপোস বউদের একেবারে নিরামিশ করে রাখত।

তাই বলে কি আমি এখন বাঈজি হব ?

তা বলেছি নাকি ?—এর পর আর কথা বাড়াল না মানিকলাল। ভেবেছিল, বেলাকে একবার কুমারী জয়শ্রী পালিতের লেখা চিঠিখানা দেখাবে। কেমন কপালকুণ্ডলার ভাষায় একটি বি. কম পাস মেয়ে চিঠি লিখেছে। চিঠিখানা দেখে' হয়তো কী আনসান বলে বসবে। কি দরকার ?

খবরের কাগজ মানেই যশপ্রার্থী আর ভাগ্য পরীক্ষার্থীর ভিড়। সুপ্রভাতেও তাই। এতদিন কাগুজে কাজে থেকে মানিকলাল জানে এদের ভেতর বেশিরভাগই মন্দভাগ্য। সাহিত্য, রাজনীতি., খেলা, অভিনয়—নানা রাস্তার মানুষ এখানে এসে লাক ট্রাই করে। কেউ বা হতে চায় ধুরন্ধর রিপোর্টার।

কেউ গান গেয়েই রিভিউ চায়। কেউ চায় বাজিয়ে হিসেবে এক কলম প্রশংসা। সবার কপালে সব জোটে না।

এরকম অনেকেই সুপ্রভাতের ঢাউস নিউজরুমে আসে। এর ভেতর মেয়েরা একটু সেজে আসে। ছেলেদের মুখ শুকনো।

তারই ভেতর একটি মেয়ে মাঝে মাঝে মানিকলালকে কপি দেখায়। নিজেই এসে বলে, দেখুন তো বাংলাটা ঠিক হল কিনা? মানিকলালের তখন মনে হয়—বাংলা দেখে কি হবে! তার চেয়ে সে মেয়েটিকে দেখে। সাধারণ বাঙালী ঘরের। এম. এ. বি. এ পাস। লম্বা। বাংলা দেখতে দেখতে একদিন তাকে মানিকলাল বলেছিল, আচ্ছা এমন কেউ বন্ধু হয় না—যে গল্প করতে পারে—দু'কলি গান জানে তো খুব ভাল—একটু হুইস্কি খেল—খানিক হাসাহাসি হল—ব্যাস! মানে বুদ্ধিমতী—রসিক—কিন্তু খুব একটা জড়িয়ে পড়ার কোন দরকার নেই—

মেয়েটি যে একথা অ্যাত সিরিয়াসলি নেবে তা ভাবতে পারেনি মানিকলাল।

কথাটা সে এই মন নিয়েই বলেছিল—কোথাও আনন্দ পাচ্ছি না—দেখিই না একজন কেউ নতুন মানুষের সঙ্গে মিশে দেখি—কেমন লাগে মিশে—সেটাও তো একটা ভ্যারিয়েশন হবে। পৃথিবী যেন ক্রমেই হলুদ হয়ে যাচ্ছে। আমি কি বাতিলের দলে পড়ে যাচ্ছি? এরপর বয়স এসে একদিন চিরকালের মত ভাগাড়ে নিয়ে যাবে?

সেদিন সন্ধ্যেবেলা চিঠি বাছতে বাছতে এক মহিলার লম্বা চিঠিতে মানিকলালের চোখ আটকে গেল। সে মন দিয়ে পড়ছিল। এমন সময় পালচৌধুরী হাউসের নবনীতা করিডর দিয়ে যেতে যেতে হেসে দাঁড়াল।

ফলে হাসিমুখে তাকাতে হল মানিকলালকে।

নবনীতা বলল, আবার কি চিঠি বাছলেন?

একখানা চিঠির মত চিঠি। কিন্তু ছাপানো যাবে না বোধহয়।

খুব একটা রিস্ক নেবেন না। আমাদের কাগজ ফ্যামিলি পেপার মনে রাখবেন। একখানা কাগজ নিলে বাড়ির খোকা থেকে দাদু সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। তাই সব চিঠি তো ছাপা যাবে না—

দাঁড়িয়েই কথা বলছিল মানিকলাল। নবনীতা চোখের ইশারায় বসতে বললে মানিকলাল বসে পড়ে বলল, আমায় যদি ডিসিশন নিতে হত—আমি পয়লা পাতায় নিচের দিকে চারকলম স্প্রেডে এ চিঠি ছেপে দিতাম। আমরা কোথায় আছি—তা পরিষ্কার দেখতে পেত পাঠক। রিডার নিজের দেশটার—সামাজের ছবির মুখোমুখি হতে পারত।

থামুন তো। মনে রাখবেন—খবরের কাগজ হল—পাবলিকের দশ মিনিটের জন্যে আর্লি মর্নিং প্যাস্টাইম!

মানিকলালের চোয়াল শক্ত হল। সে পরিষ্কার বলল, না। আমি তা মনে করি না।

আপনার আমার মতামতে যায় আসে না।

আসে যায়। আপনি যা বললেন—সে জন্যে আপনার ঠাকুর্দার বাবা সুপ্রভাত করেননি।

ওঃ! সে মানুষটার কথা বাদ দিন। ঠাকুর্দার বাবা বঙ্কিমচন্দ্রের ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন। ফার্স্ট ওয়াইফ মারা যেতে ঘোড়ায় চড়া শিখলেন। খবরের কাগজ বের করলেন। হ্যাট্‌ ইনকরিজেবল্‌ আইডিয়ালিস্ট! বেশ তো চিঠিটা নিয়ে আমার ঘরে আসুন—এই তিনটের সময়—

নবনীতা চলে যেতে মানিকলাল বিড় বিড় করে বলল, সেই মানুষটা গত শতাব্দীতে এসব করেছিল বলেই—এ জীবনে তোমরা এখন হরির লুটের বাতাসার মত টাকা পাচ্ছ! হাত দিলেই টাকা! সুপ্রভাতের পয়লা পুরুষ শুরু করেছিলেন—ডেইলি হেরাল্ড দিয়ে। নীল বিদ্রোহের প্রথম রিপোর্ট করেন তিনি নিজেই। মনে মনে মানুটা ছিলেন হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখুজ্যের শিষ্য। একসময় তিলক, গান্ধীজী সবাই এ-কাগজের অফিসে এসে বসেছেন। শলাপরামর্শ করেছেন। বিংশ শতাব্দী তখন কচি শতাব্দী। সিস্টার নিবেদিতাও নাকি এ-কাগজে একটা এডিটোরিয়াল লিখেছেন। তখন শুধু ছিল ইংরাজি ডেইলি। তারপর নবনীতার দাদুর আমলে এক্সপ্যানশন। তিনিই সুপ্রভাত বের করেন। তিনিই এখন পালচৌধুরী হাউসের চেয়ারম্যান। আবার দু'খানা ডেইলির সম্পাদকও বটে। কলকাতার কাছেই বিশাল বাগান, পুকুর নিয়ে বাড়ি। সেখানে কয়েকবার যেতে হয়েছে মানিকলালকে। সুনীতিবাবু মারা গেলে তাঁর শোকসভায় মেইন স্পীকার নবনীতার দাদু—প্রবীণ সম্পাদক। সেই স্পিচ লিখে মানিকলালকে পড়ে শোনাতে যেতে হয়েছিল পাল চৌধুরী ভিলায়। আগাম শুনে যাতে স্পিচ দেবার সময় সবই সড়গড় লাগে—যাতে মনে হয় - বাঃ! বেশ তো লিখেছি। সেই সময় মানিকলাল মিত্র বলেছিল—আপনার বাবা এমন দেশহিতৈষী ছিলেন। তাঁর ওপর গবেষণার জন্যে বছরে গোটা দুই করে স্কলারশিপ চালু করুন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে বাবার নামে চেয়ার করুন। দেখুন না—আনন্দবাজার করেছে। যুগান্তর করেছে। আপনারা এতবড় হাউস। আপনারা পারেন না?

আমার বাবার কথা বলছ?

হুঁ। আর কার কথা বলছি।

তা তিনি কি করেছেন?

অনেক কিছু করেছেন।

তাই নাকি?

এরপর আর কথা বাড়ায়নি মানিকলাল।

নিজের চেয়ারে বসে আবার সেই চিঠিখানা ফের পড়ছিল মানিকলাল। যাতে মামলা না হয়—আইন বাঁচিয়ে কীভাবে চিঠিখানা ছাপা যায়—তাই ভাবছিল সে। এমন সময় সেই মেয়েটি এসে হাজির—সে মাঝে মাঝে বাংলা দেখাতে আসে। এসেই বলল, ওকে নিয়ে এসেছি। ডেকে আনি?

কাকে?

ওই যে আপনি বলেছিলেন—একজন বন্ধু দরকার আপনার—বলেই কাকে আনতে গেল।

মানিকলালের তো মাথায় হাত। কথায় কথায় বলেছিল - একজন কেউ এমন বন্ধু হয় না—যে গল্প করতে পারে—

মেয়েটি আরেকটি মেয়েকে নিয়ে মানিকলালের অ্যালকোভে ঢুকল। বসুন এখানে। ইনিই মানিকলাল বাবু। আর ইনি মণিকা—বলেই মেয়েটি চলে গেল।

তখন মানিকলাল মণিকাকে নমস্কার করে জানতে চাইল, কোথায় যাবেন?

ঢাকুরিয়ায়—

মানিকলাল দেখল, মণিকা কথা বলছে - তার দাঁত খুব ফাঁক ফাঁক। চোখ ক্লান্ত। কে কে আছেন বাড়িতে?

আমার স্বামী। ছেলে একটি—

কী করেন ভদ্রলোক?

ব্যাঙ্কে কাজ করেন—

ততক্ষণে মানিকলাল মণিকার হাতের খসখসে আঙুল, ফাঁক ফাঁক দাঁত, ক্লান্ত চোখ, চুল উঠে যাওয়া বড় কপাল—সবই দেখে নিয়েছে। রীতিমত পেশাদার মিশিয়ে। স্বামী ব্যাঙ্কে কাজ করলে মণিকার কি বাইরে মেশামিশি খুব দরকারি? জানতে চাইল, আপনি কখন সময় করতে পারবেন?

মণিকার বয়স মনে হচ্ছে—সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। সে বলল, রোজ কোন্ সময়ে আমাকে দরকার হবে বলুন?

হেসে ফেলল মানিকলাল। রোজ নয়। মাঝে মাঝে। ধরুন এই সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটা আটটা অব্দি—

বুধবার ওই সময়টায় একটা কাজ থাকে। অন্যদিন পারব।

আড্ডা দেবেন। গল্প করলেন—চাই কি একটু হুইস্কি খেলেন—

হুইস্কি আমি পারি না। বিয়ার পারি। গল্প করলে সঙ্গে থেকে গল্পও করতে পারি—

(আবার সেই ফাঁক ফাঁক দাঁত—গলায় জেগে ওঠা শিরার পাশে ঘামাচি)

কার বই ভাল লাগে?

পড়ার তো বিশেষ সময় পাই না। আলাদা করে কারও নাম মনে পড়ছে—না - তবু ?

মণিকা খানিক ভেবে বলল, ছোটবেলায় নীহার গুপ্তর কালোভ্রমর পড়েছিলাম। ওর লেখা আমি পেলেই পড়ি।

আপনার কি ?

আপনার পছন্দ হলে যা দেবেন—

মানিকলালের মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। অনেক আশা করে এসেছে, একে মুখের ওপর না বলা যে কত কঠিন।

মণিকা জানতে চাইল, তাহলে কবে থেকে আসব ?

ওকে দিয়ে খবর পাঠাব আপনাকে।

কোথায় আসতে হবে ?

সবই ওকে দিয়ে জানিয়ে দেব।

তাহলে উঠি আজ—

আসুন।

মণিকার চলে যাওয়ার পথে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মানিকলাল। মণিকার মত এমন মেয়েমানুষের খবর কী করে রাখে ওই মেয়েটি ?—যে কিনা এখানে রিপোর্টিং শিখতে আসে। আশ্চর্য। বাত কে বাত সবাইকে সব কথা বলা তো ঠিক নয়। অফিসটা ভেতরে ভেতরে আগুন হয়ে আছে। যেকোন সময় যেকোন ঘটনা ঘটতে পারে।

নানারকম অবস্থায়—নানারকম মানুষ এই পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। একটু মাথা তুললেই মনে খোঁচা লাগে আমাদের। মণিকার মত মেয়ে নিয়ে বিশ পঁচিশ বছর আগে গল্প লিখেছি। আমরা সবাই অল্পবিস্তর ভগবান। অল্পবিস্তর জন্তু। আমাদের ভেতরকার বিল্টইন স্টেবিলাইজার আমাদের সামলেসুমলে রাখে। এরই ভেতর আমরা কেউ কেউ একটু একটু করে এগিয়ে মনীষী হয়ে যাই। কেউ হয় অবতার। কেউ বা গুরু। আবার কেউ দারোগা।

মানিকলাল ফের চিঠিখানা পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে নজর রাখতে হবে - কোত্থেকে কেটে বাদ দিতে হবে। মনোমত হলে তবে চিঠিপত্রের কলমে ছাপানো যাবে। চিঠি যা আসে তাতো আর অ্যাজ ইট ইজ যায় না। ছাঁটতে হয়। জুড়তে হয়।

তাতে যে ভাল হয় - তা মনে হয় না মানিকলালের। বরং তার স্বপ্নের দৈনিকে সে অ্যাজ ইট ইজ চিঠির ছাপানোরই পক্ষপাতী। সেখানে লেখা থাকবে—পাঠকের মতামত (অসম্পাদিত)। শুধু তাহলেই পাঠককে ঠিকমত তুলে ধরা যায়।

ডেইলি হেরাল্ডের পয়লা পুরুষ এই শতাব্দীর গোড়ায় গোড়ায় মারা যান। তখন তার বিখ্যাত ভাইয়েরা সম্পাদক হতে থাকেন। তাঁরাও মরতে লাগলেন। বুড়ো হতে লাগলেন। তখন নবনীতার দাদু টাটকা যুবক। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হতেই তিনি সম্পাদক হয়ে বসলেন। এখন রীতিমত প্রবীণ সম্পাদক। মালিক তো বটেই। সারা ইস্ট ইণ্ডিয়ায় তিনি বহুকাল চরকির মত পাক খেয়েছেন। তাই আসাম, বাংলা, বিহার, ওড়িশার তাবৎ গুরু, ম্যাজিসিয়ান, কীর্তন গাইয়ে, গণৎকার—সবাই তার পরিচিত।

সেরকমই এক গুরুকে নিয়ে এই চিঠি।

৭/সি বনমালী নস্কর রোড
ফ্ল্যাট সেভেন
কলকাতা-৬৭

'জয় মা সন্তোষী'

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মাননীয় দাদা মহাবিপন্ন হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি ঘনানন্দের ভক্ত একথা আমি জানি। আমিও এককালে ওঁর পরম ভক্ত ছিলাম। উনি আমাদের পরিবারের অনেকের গুরু। তাই বাল্যকাল থেকে ওর সঙ্গে আমাদের জানাশুনো। আমি ওর শিষ্যা নই কিন্তু পরম ভক্ত ছিলাম। জীবনের সব ঘটনাই ওকে জানাতাম। আমি বাল্যকাল থেকেই ভগবানের ভক্ত কিন্তু সংসারী নই।

মায়ের করুণায় লেখার শক্তি লাভ হয়েছে। গান গল্প কবিতা সব বিষয়েই লিখি। ছোট ছোট পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয় মাঝে মাঝে—দুই একটি। কিন্তু তারা অর্থ দেন না। আমার একটি মাত্র দাদা অকালে পরলোকে চলে গিয়েছেন।

আমার এই লেখার কথা ঘনানন্দকে জানিয়ে ছিলাম পত্রের মধ্যে। পড়ে উনি খুব প্রশংসা করতেন। আমার লেখা প্রথম প্রকাশ হয় আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দমেলা বিভাগে। তারপর যুগান্তরের পাততাড়িতে। কিছুদিন বাদে আপনার সুপ্রভাতের কচিকাঁচার পাতায়।

আমি ছোট এবং বড়দের লেখাও লিখি। লেখা প্রকাশ হতে ওকে জানালাম। ব্যাস লেখা প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। তখন বুঝিনি এর কারণ। এখন বুঝছি। আমার দাদা মারা যেতে বন্ধুদের পরামর্শে ওকে বললাম, বাবা আমার দাদা অকালে মারা গেল। কে লেখা প্রকাশ করে দেবে! আপনি যদি প্রকাশ করে দেন তো মহা উপকার হয়।

উনি রাজি হয়ে বললেন, লেখাগুলো দিয়ে যেও।

আমি বেলগাছিয়ার সরকার বাড়িতে লেখাগুলো—৮ খানা খাতা যাতে ৭'শ

গান এবং কবিতা লেখা ছিল - উনি নিজ হাতে সেগুলো নিলেন। খাতাগুলোর নাম—

শ্যামার্ঘ

শতরূপা

মণিকণা

মণিহার

কল্লোল

রক্তকমল

নবদিগন্ত

ও নির্মাল্য

কোন কপি না রেখেই বিশ্বাস করে ওর হাতে তুলে দিলাম। নিলেন তো— তারপরই চুপচাপ। কোন সাড়া নেই। লেখা প্রকাশ করে দেওয়া তো দূরস্থান—অনেক চেয়েও ফেরত পর্যন্ত দিচ্ছেন না।

একজন মহাপুরুষ বলেছেন—ঐ লেখা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবে। ওকে সেই কথা জানিয়েছিলাম। সেটাই হল কাল। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল নিয়ে রেখেছেন। লেখা নেবার পর উনি আমাকে রাধা বানাতে চাইলেন। উনি মেয়েদের ঐরকম করেন।

এমন একটি ঘটনা ঘটালেন -যেন আমি রাধা হয়ে গেলাম। আর উনি হলেন কৃষ্ণ। আমার কিন্তু এসব মোটেই ভাল লাগল না। আমি ওর কাছে গিয়ে কেঁদে বললাম, বাবা আমি রাধা হতে চাই না। এসবকে আমি ভণ্ডামি মনে করি। কারণ, রাধা একজনই ছিলেন, থাকবেনও। আমি সাধু হতে পারি, ভক্ত হতে পারব না—আপনি আমার লেখা ফেরত দিন - আপনার প্রকাশ করে দিতে হবে না।

ঘনানন্দ আমার প্রতি ভীষণ কুপিত হলেন--লেখাও ফেরত দিলেন না। কিছুদিন পরে আবারও চাইতে গেলাম। উনি আমার সামনে বিবস্ত্র হয়ে বললেন, তোকে কামসুখ দেব (এসব লিখতে আমি লজ্জায় মৃতপ্রায় হয়ে যাচ্ছি —কিন্তু ওর স্বরূপ জানাবার জন্যেই লিখতে বাধ্য হলাম) - সেই ঘটনার পর আমি লজ্জায় ঘৃণায় মুখে যা এল তাই বলে গালাগাল দিয়ে ওর কাছ থেকে চলে এলাম চিরদিনের মত। আর যাইনি।

ওর ভক্তদের দিয়ে চাইতে পাঠালাম। উনি তাদের কাছে বললেন, লেখাগুলো আমায় দিয়ে দিতে বল।
আমি ওকে বললাম, একটি অক্ষরও দেব না। ওগুলো মায়ের কৃপায় দাও। আমার সাধনার ধন।

(মহিলারা একবার কবিতা পাগলী হলে তাদের সামলানো দায়। ব্যাঙের আধুলির কায়দায় সেটা পাহারা দেবে। আদৌ আধুলি কি না তাও যাচাই করবে না। মানিকলাল পাতা ওল্টালো চিঠির। এপিঠ ওপিঠ লেখা।)

উনি শুনে বললেন, না দিলে জীবনটা অতিষ্ঠ করে দেব। দিচ্ছেনও তাই করে। ওর অনেক শক্তি। লোকের ঘাড়ে চেপে যা ইচ্ছে হয় তাই করিয়ে নিতে পারেন—ভাব জাগিয়ে। নিজে যেটা না পারেন সেটা এক মহিলা তান্ত্রিকের ঘাড়ে চেপে তাকে দিয়ে করিয়ে নেন। এই মহিলা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রকৃতির—প্রচণ্ড লোভী। ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে তাকেও আমার শত্রু বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধাতে পারেন। আমার বৌদির সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে আমাকে সংসার থেকে বার করেছেন। বনমালী নস্কর রোডে একখানি ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে জীবন্মৃত অবস্থায় দিনপাত করছি। অর্ধাহারে অনাহারে থেকে—শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক তিন প্রকার অকল্পনীয় যন্ত্রণার দ্বারা আমার জীবনটাকে দগ্ধ করে দিচ্ছেন। তাঁকে লেখাগুলো দেব না বলে—আমাকে তো দুঃখ দিচ্ছেনই—আমার অতি প্রিয়জনকেও দুঃখ দিচ্ছেন—আমাকে শাস্তি দেবার জন্য।

(মানিকলাল বুঝল, আসলে কবিতা নয়—কবিকে চায় ঘনানন্দ।)

দাদা বিচার করুন! এই কি মহাপুরুষের কাজ?

আমি একবার ওকে লিখেছিলাম—আপনি লোকচক্ষুর অন্তরালে যা করছেন—এই প্রকার কাজ অন্য কেউ করলে আপনি তাকে কি বলতেন? জবাব দিন।

কিন্তু আজ পর্যন্ত উনি তার উত্তর দেননি। উনি ভগবান, রজনাশের সমগোত্র। ওর সব কথাই আমি আনন্দময়ী মাকে জানিয়েছিলাম। মা বোধহয় সেই লজ্জাতেই দেহ ত্যাগ করলেন। আধ্যাত্মিক জগতের এই দুর্নীতি তাঁর সহ্য হল না বলেই।

বহু চেষ্টা করেও লেখাগুলো ফেরত আনতে পারছি না। লেখার শক্তিটাও নষ্ট করে দিয়েছেন। এখন সামান্যই লিখি। তবে উত্তম লেখা লিখি মায়ের কৃপায়। লেখা প্রকাশ পর্যন্ত হতে দিচ্ছেন না। প্রত্যেক লেখা পড়ে বলে চমৎকার। প্রকাশ হচ্ছে না দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। না হওয়া এবং না হতে দেওয়া দু'টোতে যে অনেক তফাত।

আমি বেলগাছিয়া শিশুসাহিত্য পরিষদের সদস্যা। ওখানে প্রত্যেকে আমার লেখার প্রশংসা করেন। দাদা আপনি কি এর প্রতিকার করতে পারেন না? দয়া করে ওকে বলুন লেখার পাতাগুলি ফেরত দিতে। এটা ওর উপযুক্ত কাজ নয়।

প্রতিমাসে একটি করে যদি আমার গল্প সুপ্রভাতে প্রকাশ করে দেবার ব্যবস্থা

করেন—কিছু অর্থ পাই। গান কবিতা ছোটদের এবং বড়দের বই করে যদি প্রকাশ করে দেন তবে এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাই। আপনি লেখার জগতের লোক লেখার মর্ম বোঝেন।

(আসল কথা এবার বলা হল।)

কয়েকজন মহিলা ওর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওর নামে হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে প্রচার করেছেন। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে ?

(ঘনানন্দ তাতে কাবু হবার পাত্রই নয়।)

আপনার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কবে এবং কোথায় হতে পারে দয়া করে জানান। নমস্কারান্তে—

ইতি—বিনীতা
মাধবী মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চঃ মঙ্গলদীপ নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ করেছি। উনি চালু হতে দিলেন না।

তাহলে অলৌকিক ঘনানন্দ কবিকে কবজা করবেই করবে। তন্ত্র, কাম, সাহিত্য—সব একাকার।

মানিকলাল মিত্রের মনে হল, কত জিনিস ঘটে। তা কতটুকু লিখতে পারি।

আট

আজকাল বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জন্যে টিউটর রাখা এক বাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে টিউশনিতে যেতে পায়ে হেঁটে দশ মিনিটও লাগে না মিঠুর। ক্লাস থ্রির ছেলে। মিঠুকে ভীষণ ভালবাসে। নিজের চকোলেট বাঁচিয়ে মিঠুর আন্টির জন্যে তুলে রাখা চাই। মিঠু অনেক বারণ করেছে। বলেছে, আমি চকোলেট খাই না। তবু রাখবে। এদের শক্ত করে না বলা খুব কঠিন। টিটোর মুখের দিকে তাকিয়ে মিঠু বুঝতে পারে—ওর চোখে সে রীতিমত স্বপ্ন। এক একদিন তো বাগানের টগর পর্যন্ত তুলে রাখে। হাতে নিয়ে মিঠু বলে, বাঃ! খুব সুন্দর তো।

হপ্তায় দু'দিন পড়ায়। বুধ আর শুক্কুর। এক এক শুক্কুরবার টিটোর বাবা তাকে পড়াবার ভেতরেই অফিস থেকে ফিরে আসেন। চল্লিশ হয়নি এখনও সুশান্তবাবুর। এল. আই. সি-তে কাজ করেন।

সুশান্ত একদিন পড়াতে আসা মিঠুকে বলেছিল, গত শুক্কুরবার তুমি পড়াতে এলে না। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল।

হাসবে না লজ্জা পাবে ঠিক করতে পারছিল না মিঠু। এসব কথা শুনলে কার না ভাল লাগে। টিটোর মা তার খুব বন্ধু। সে লজ্জা পেয়ে বাসন্তীদির রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল।

বাসন্তী তাকে দেখে বলেছিল, ওমা! একটা জিনিস তোমায় দিতে ভুলে গেছি।

কি?

আমরা যে কাশ্মীর ঘুরে এলাম—

হুঁ। সে তো দু'মাস হয়ে গেল!

পাখাটা ছেড়ে দাওনা মিঠু। ও ঘরে গিয়ে দেখাচ্ছি।

মিঠু গিয়ে পাখা ছেড়ে দিতে বাসন্তী ট্রাঙ্ক খুলে একটা মেরুন রঙের সোয়েটার বের করল। করে বলল, এটা তোমার জন্যে কিনেছিল ও। দেওয়াই হয়নি।

আমার জন্যে কেন?

সোয়েটারটা ওর গায়ের পর রেখে বাসন্তীদি বলেছিল তোমায় খুব মানাবে ভাই। বিয়ের পর কত জায়গায় গেছেন টিটোর বাবা। আমার জন্যেও কোনদিন কিছু আনেননি। এই প্রথম দেখলাম কারও জন্যে কিছু আনল।

মিঠু বাসন্তীদির মুখে তাকিয়ে বুঝল, তার ভেতর কোন ময়লা নেই। সে সোয়েটারটা খুশি মনেই নিয়েছিল।

আজ টিটোদের বাড়ি পা দিয়েই বুঝল, স্বামী স্ত্রী দু'জনেই বাড়িতে। টিটোকে নিয়ে টেবিলে বসতে না বসতেই সুশান্ত এসে ঘরে ঢুকল, আজ পড়ানোর পর একটু বসবে—

কেন?

বেগুনী ভাজব। গরম গরম খেয়ে যাবে—

কে ভাজবে? বাসন্তীদি?

না। আমি। বর্ষাকালে বেগুনী খেতে খুব ভাল লাগে। বেগুনে অ্যালার্জি হয় না তো?

নাঃ! কিন্তু আপনি ভাজবেন—

হ্যাঁ। বিয়ের আগে মেসে থাকতাম। সেখানেই শেখা। পড়িয়েই চলে যেওনা কিন্তু।

পড়াবার পর টিটোর সঙ্গে রান্নাঘরের দোরে গিয়ে দাঁড়াল মিঠু। নিজেই বেগুনগুলো পাতলা ফালি করে কেটেছেন সুশান্তবাবু। বাসন্তীদি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ফুটন্ত তেলে ব্যাসন মাখিয়ে টিটোর বাবা বেশ কায়দামত বেগুনের ফালি নামিয়ে দিচ্ছিলেন কড়ায়। লাল মুচমুচে হয়ে তা ফুলে উঠছিল। সঙ্গে সঙ্গে মিঠু বুঝতে পারছিল, এ বাড়িতে তার আর পড়ানো হবে না। পুরুষের

চোখে সে যে কেমন করে কখন বিশেষ হয়ে ওঠে—তা সে টের পায় তাদের, চোখে লেখা চিঠিতে। ব্যাপারটা ভালও লাগে – আবার যাদের সে ভালবাসে—তাদের সংসারে ভাঙনের তটরেখা সে দেখতে পায়। পেয়ে মনে মনে ভয়ে কেঁপে ওঠে। বাসন্তীদিকে সে সত্যিই ভালবাসে।

মুখে উৎসাহ ফুটিয়ে পর পর ক'খানা বেগুনী খেল মিঠু। খেয়ে বলল, এবার উঠব আমি।

সুশান্ত বলল, বাঃ! আর ক'খানা খাও।

বাসন্তীদিকে দিন না—

ও তো খাচ্ছে। আগেও খেয়েছে। এই নাও—

না না। আর দেবেন না। আমার যাওয়া আছে যে—

কোথায় যাবে?

রাসবিহারীতে। আমার এক দাদার বাড়ি। সেখানে বৌদিকে নিয়ে বেরতে হবে।

তোমার দাদার বিয়ে হল কবে?

আমার মাসতুতো দাদা। উঠি—

চা খেয়ে যাও। এবার চা করব।

বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি। এখন আর খাব না।– বলে বেরতে বেরতে মিঠু দেখল, গনগনে চুলোর আঁচের সামনে ঘেমেচুমে বসে আছে মানুষটা। হাতে খুন্তি। চোখ তারই চলে যাওয়ার পথের দিকে। মানুষের এমন হয় কেন? এসব কথা ভাবতে ভাবতেই সে বাস রাস্তার দিকে চলল। এখানে আমার আর টিউশান করা হবে না।

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে বিজন সেতুর থাম্বার নিচে নেমে মিঠু বাঁ হাতে ঢুকে পড়ল। খানিকটা এগিয়ে একটা দুধের গুমটির গায়েই মধুদার বাড়ি। ছেলে কাছাকাছি জগদ্বন্ধুতে পড়ে বলে এখানে বাড়ি নেওয়া। বাড়ি বলতে গেলে দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে মেজানিন ফ্লোরের একখানা বেঁটে কিন্তু চওড়া ঘর। তার নিচেই বাড়িওয়ালার গ্যারেজ। কল বাথরুম একতলায়। মধুদার ছেলে কনক পায়ে হেঁটেই স্কুলে যায়। বৌদি সঙ্গে থাকে। স্কুল থেকে ফিরে কনক দোতলার চওড়া বারান্দায় ডাক্তারবাবুর ছেলের সঙ্গে বল খেলে কোন কোনদিন।

আজ সিঁড়ির মাথায় ডক্টর ঘোষের মুখোমুখি পড়ে গেল মিঠু।

এই যে। কতদিন পরে আসা হল?

ডাক্তারবাবু বেরচ্ছিলেন। বছর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবেন। দেখায় ঠিক পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। গায়ের স্কিন দারুণ। স্পটলেস আইস্ক্রিম একেবারে। বহুদিন দেখছে মিঠু মানুষটিকে। স্ত্রীর নাম বিজয়া। অনেকটা থিয়েটারের নায়িকা নায়িকা। ডাক্তারবাবু বউঅন্ত প্রাণ। কিন্তু বিজয়া মানুষটি যাকে

বলে দজ্জাল। কিছুকাল হল ডাক্তারবাবু বিগড়ে গেছে। রাত করে ফেরে। একসঙ্গে এতসব ভেবে মিঠু হেসে বলল, কেন? গত রবিবারই তো এসেছিলাম।

আমি ছিলাম না মিঠু।

না থাকলে দেখবেন কি করে আমাকে!

তাও তো ঠিক।—বলে ডক্টর ঘোষ হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, কতদিন তোমার কোন অসুখ করে না।

ওমা! একি কথা?

অসুখ করলে তোমার শরীরটা দেখা যেত। স্টেথো বসাতাম বুকে!

কিছু না বলে চোখে বকে উঠল মিঠু।

তাতে যেন ওসকানো হল ডাক্তারকে। তিনি ভিখারির চোখে বললেন, আমাদের এই কমন বারান্দায় এসে কনক ওদের সঙ্গে আর খেলে না কেন?

দু'একদিন খেলেছিল মিঠু। তাও তিনচার বছর আগে রবারের ফুটবল। ঠিক মনে আছে তো ডাক্তারবাবুর।

এবার ডাক্তারবাবু বললেন, খেললে আমি তোমায় দেখি। দেখে ভাল লাগে।

এমন সরল স্বীকারোক্তি। কিছু বলা যায় না। মিঠু চারদিক তাকিয়ে নিল। কেউ কোথাও নেই। ডক্টর ঘোষ বছরখানেক আগে তার তলপেট-লিভারের জায়গা টিপে দেখেছিলেন। সেবারে বিকোলাই ধরা পড়ে। মিঠু অস্ফুটে বলল, আমারও একজন আছে—

তাই নাকি! বাঃ! বেশ!—বলতে বলতে ডক্টর ঘোষের মুখ নিভে গেল। খুব আস্তে বললেন, তিনি কত ভাগ্যবান—

কেন? কেন?

যে তোমাকে পায়!

মিঠু আর দাঁড়াল না। টুক করে মধুদার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঢুকেও মনে হল—সত্যিই কি আমার কেউ আছে? কোথায়? তিনি থাকেন কোথায়? কাউকে তো মনে পড়ছে না।

মধুদাদের বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতেও মনে হল মিঠুর—আমার কে কে আছে? পাড়ার মোড়ে এসে ধক করে উঠল বুকটা। মা যাকে চিঠির পর চিঠি লিখে কোনদিন ডাকে দেয়নি। সে? মা যাকে লেখা চিঠি পরপর সাজিয়ে রেখে একদিন চলে গেছে। সেখানে মিঠু তার হাতের ভাঙা চুড়ির টুকরো, চুলের কাঁটা পেয়েছিল একদিন। স্মৃতি বিস্মৃতির সৌরভ। বইয়ের নামগুলোই কেমন অন্যরকম। স্বর্গের পরের জংশন। গতজন্মের রাস্তা। সৌরভ কথাটা আজকাল আর কেউ ব্যবহার করে না। আর সত্যি সত্যিই কি গতজন্মে যে-রাস্তায় হেঁটেছি—সে-রাস্তা এ-জন্মে চেনা যায়? অসম্ভব। নিজেই একা

একা হেসে ফেলল। স্বর্গ কি মোকামা জংশন? তার আগে পরে স্টেশন থাকে নাকি? হাসালে মানিকলাল। হাসালে। এটা তোমার বিশ্বাস? না, বিদ্রূপ?

অমিয় পালিত বিকেলের বন্ধুদের নিয়ে মাঠ ভেঙে কোন কোনদিন অ্যারোড্রোম অব্দি হাঁটতে যান। সেখানে গাছতলায় বসে অ্যারোপ্লেনের ওঠানামা দেখেন। চোখ ভরে। সেইসব দিন ফিরতে ফিরতে টিভি-তে হিন্দি খবর শুরু হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে মিঠু দেখল, বাবা ফেরেনি। ফেরেনি সন্তু। মানে দাদা। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে হাজরা মোড়ের আড্ডাটি মেরে তবে ফিরবে। মা চলে যাওয়ার পর এখন সদর দোরের একই চাবির তিনটি কপি হয়েছে। অমিয় পালিত, সন্তু, মিঠু—যে-যার চাবি কাছে রাখে। যে আগে ফেরে সে দোর খুলে ঢোকে। সন্তু তো হাসতে হাসতেই বলে, জানিস মিঠু—আমরা এখন মেসবাড়িতে আছি। যে শেষে বেরবে সে চাবি লাগিয়ে তালা ঝুলিয়ে বেরবে।

মা বেঁচে থাকতে এমনটি তো ছিল না দাদা।

মা যে সবসময় বাড়ি থাকত।

এখন দাদা—এটা পালিত'স্ ইটিং লজ! তাই না?

আজ মিঠু দোর খুলেই কলঘরে গেল। ভাদ্রের প্যাচপেচে গরম। বাসের চাপাচাপি। তারপর ট্রাম লাইন থেকে এতটা হেঁটে আসা। সবমিলিয়ে মিঠুর মনে হচ্ছিল—টিটোর বাবা সুশান্তবাবুর ভাজা বেগুনীর তেল লেগে গেছে গায়ে। কপাল থেকে পা অব্দি ভাল করে ফেনা করল সাবানে—তারপর শাওয়ারটি ছেড়ে তার নিচে দাঁড়াল। আঃ!

সদর আটকালে সারাটা বাড়ি একটি সিন্দুক। আসলে অমিয় পালিত নর্থ ক্যালকাটায় বড় হয়েছেন। মায়ের মুখে শুনেছে মিঠু। সে যখন মাসকয়েকের তখন বাবা এ বাড়ি কিনে উঠে আসে। কিছু রদবদল করতে হয়েছে। সামনের ঢাকা বারান্দা নতুন। সামনের ঘরের পরের ঘরখানা ছাড়ালেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। দাদা বিয়ের পর দোতলা করবে দরকার হলে। সিঁড়ির বাঁদিকে রান্নাঘর। ডাইনে কলঘরে যাবার রাস্তা। অমিয় পালিত দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ডাইনে খানিক জায়গা ফেলে রেখেছেন। সেখানে এখন একটা পেয়ারা গাছ পেয়ারা দেয়। দরকারে ওখানেও একখানা ভাল ঘর হয়। কলঘরের সিমেণ্ট বাঁধানো বিরাট চাতাল দেওয়াল ঘেরা। এখন সারাটা বাড়িই মিঠুর পক্ষে বিশাল প্রাইভেসি।

সন্ধ্যেরাতের ঠাণ্ডা বাতাস ভাল লাগছিল। ভিজে গায়েই ঘরে এল মিঠু। এবার পাউডার ছড়িয়ে মাথার ওপর দিয়ে নাইটিটা গলিয়ে নেবে। এখন একেবারে কিছুই নেই গায়ে। কী ভীষণ যে আরাম লাগে এভাবে—বিশেষ করে পাউডার ছড়িয়ে মাথার ওপর পাখাটা ছেড়ে দিয়ে—সারা শরীর জুড়িয়ে এল মিঠুর। আঃ!

কুট করে টিভিটা ছেড়ে দিয়েই চমকে উঠল একটু বাদে। ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে অবাক হয়ে দেখল—ক'জনের সঙ্গে মাঝখানে বসে মানিকলাল মিত্র তার দিকে তাকিয়ে আছে।

একবার ক্লোজ শটে মানিকলালের মুখখানা টিভির পর্দা জুড়ে বড় হয়ে উঠতেই মিঠু পরিষ্কার দেখল, মানুষটি বড় বড় চোখে তারই দিকে তাকিয়ে কী বলছে। লজ্জায় মানিকলালের কোন কথাই তার কানে গেল না। সে এক ঝটকায় বিছানার চাদরটা টেনে নিয়ে ঘাড়, গলা, বুক, কোমর—সবই খুব ভাল-ভাবে ঢেকে ফেলল। কোন্ প্রবীণ ঔপন্যাসিকের মৃত্যুতে মানিকলাল কী যেন বলছে। আরও তিনজন অধ্যাপকও আছেন।

মিঠু কুট করে টিভিটা বন্ধ করে দিল। দিয়ে নিজে নিজেই বলল, তুমি ডেকেছো—

সেদিনই রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে দেখল, একটা পাহাড়ী পথ ধরে সে এগোচ্ছে। দুপাশে পাহাড়ের মাঝখানে খাড়াই রাস্তা। বাতাসে অক্সিজেন কম। উঠতে কষ্ট হচ্ছে। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন—তাঁর মুখ দেখা গেল না—পেনসিলের হিজিবিজি দিয়ে ঘষা—এসে বললেন, এই গ্যাস মাস্কটা পরে নাও মিঠু। নয়ত বুকে চাপ পড়বে—বলতে বলতে পেছন থেকে মাথার দুপাশে হাত গলিয়ে মাস্কটাও পরিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, কতদূর যাবে?

মিঠু মাস্ক পরা অবস্থাতেই খুব কৃতজ্ঞ গলায় বলল, মানিকলাল—

মানিকলাল? সে তো উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে—পারবে?

আমাকে পারতেই হবে—বলে মিঠু রওনা দিচ্ছিল।

ভদ্রলোক বললেন, দাঁড়াও। ওখানে ভীষণ ঠাণ্ডা। মানিকলাল পাস-এ কেউ যায় না।

ভেতরে ভেস্ট পরেছি। আমি এগোই—

গেছে—এমন আর কাউকে জান?

আমার মা একবার চেষ্টা করেছিলেন।—বলতে বলতে মিঠুর ঘুম ভেঙে গেল। লোডশেডিং। মাথার ওপর পাখা বন্ধ। বুক ভিজে উঠেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসল বিছানায়। একবার ঘাম বসে গিয়ে ব্রঙ্কাইটিসে দাঁড়িয়ে যায় তার। তাড়াতাড়ি গা মুছল। জানালার বাইরেই শহরতলির শিউলিগাছে ফুল ফোটার গন্ধ অন্ধকারে। দাদাটা বিছানায় আইঢাই করছে। নিশ্চয় জল পিপাসা পেয়েছে। এত অলস। কিছুতেই উঠবে না। এই দাদা? দাদা?

কি?

জল খাবি?

দে—

দাদাকে খাইয়ে—নিজে খেয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। আর মাস দুই পরেই পুজো। শিউলি ফোটে—পড়েও শব্দ করে। টুপ। টুপ। আবার শিশির পড়ার শব্দও একইরকম। সেই টুপ। একই টুপ।

আমি গান শিখব বলে ভর্তি হয়েছিলাম। বাবা বাদ সাধল। বড় হয়েছ—গান শেখা কি! তোমার মা গয়না রেখে গেছে। গড়িয়ে তোমার জন্যে। তাছাড়া তার নিজের গয়নাও রেখে গেছে। ওগুলো গায়ে দাও। সাজো। কিন্তু বাড়িতে বসে থাকবে। হুটহাট বেরনো কেন?

এই লোডশেডিংয়ে বাবার কিন্তু ঘুম ভাঙেনি। দিব্যি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

পরদিন দুপুরে বাবা গেছে ডাকঘরে। দাদা অফিসে। মিঠুদের পাড়ার আকাশে একখানা সামিয়ানা প্যাটার্নের মেঘ এসে ছায়া করে দাঁড়াল। তার নিচে বেশ কিছু গেরস্থবাড়ি, ক্লাবঘর, স্টেশনারি দোকান আর কয়েকটা রাস্তাও ছায়া পেল।

মিঠু শেষবারের মত আয়নায় তাকিয়ে মাথার চুল ঠিক করল। তখনই মনে পড়ল দিদিমার কথা। দিদিমা মিঠুকে খুব ভালবাসত। সে যখন ছোট—তখনই নাকি তাঁর জমানো চল্লিশটা রুপোর টাকা গালিয়ে স্যাকরা দিয়ে রীতিমত ভারি একজোড়া পাঁয়জোর গড়িয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল - মিঠু বড় হয়ে পায়ে পরে ঝমঝম করে ঘুরে বেড়াবে। একবার ভাবল, এখন যেখানে যাচ্ছে—পায়ে পরে যাব পাঁয়জোর? বেশ ঝমঝম করে শব্দ তুলে গিয়ে মিনিবাসে উঠব! দুই সের রুপোর শলা বসানো পাঁয়জোর। আলো পড়লে ঝকঝক করে ওঠে। দুই ভ্রুর মাঝে টিপটা সামান্য সরিয়ে ঠিকঠাক করল। তারপর বুকের ওপর থেকে নিচের দিকে শাড়ির পাড়ে ডান হাতের তালু চেপে দু-তিনবার পালিশ দিল মিঠু। হ্যাঁ - এবার সে বেরতে পারে। নিজেকে তার এখন পছন্দ হচ্ছে।

ফ্যান্সি থেকে কেনা স্ট্র্যাপ লাগানো জুতোটা পায়ে গলিয়ে সে দরজা খুলল। আগে তালা লাগাবে। তারপর একহাতে বারান্দার গ্রিল ধরে আরেক হাতে সে জুতোর স্ট্র্যাপ বাঁধবে। একপায়ে দাঁড়িয়ে—আরেক পা পেছন দিকে তুলে।

তালা দিতেই একটা ভট্ ভট্ শব্দ এসে মিঠুদের বারান্দার নিচে থামল। ফিরে দেখল—একটা চকচকে স্কুটারে ঝকঝকে সুব্রত বসে। একমুখ হাসি।

চালাতে শিখেই ছুটে এসেছি। তোকে চড়িয়ে বউনি করব মিঠু।

কবে কিনলি?

পাঁচদিন হল। আয় বসবি পেছনে।

উহুঁ। আগে আমার জুতোর স্ট্র্যাপ বেঁধে দে তো—বলতে বলতে মিঠু গিয়ে নিচে নামার সিঁড়িতে দাঁড়াল। আর তক্ষুনি সুব্রত স্কুটার থেকে নেমে চোখের চশমা বুকপকেটে রেখে এগিয়ে এসে সিঁড়িতে নেমে আসা মিঠুর সামনে নিচু হল। এ দৃশ্য এ পাড়ায় দেখলে কেউ কিছু মনেও করবে না। ওরা স্কুলে

থাকতেই হাত ধরাধরি করে এখানকার রাস্তাঘাটে, পুজোমণ্ডপে ঘুরেছে একসময়।

শাড়িটা একটু তোল। দেখতে পাচ্ছি না—

রাগের ভান করল মিঠু। ও কি কথা! চোখে কি কিছুই দেখতে পাসনে—

একগাল হেসে সুব্রত বলল, দু'চোখ ভরে তোকেই দেখি শুধু। নে—পাটা এগিয়ে দে—

মিঠু ডান পা খানিক এগিয়ে দিল। দিয়ে বলল, এই রোদে স্কুটার নিয়ে বেরলি। শেষে বুকে ঘাম বসে গিয়ে না আবার শুয়ে পড়তে হয়।

স্ট্রাপের ফুটোয় বকলসের কাঁটা সই সই করে লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল সুব্রত। খুব সুখী ভঙ্গিতে পেছনে হেলে বলল, সে তো শীতকালে পেড়ে ফেলে আমায়। অ্যাজমার সিজনই হল উইনটার। চল মিঠু—তোকে দিয়ে স্কুটারটা বউনি করি।

উঁহুঁ। আমি চড়ব না এখন।

ভয় নেই কোন। আমার হাত সেট হয়ে গেছে মিঠু।

উঁহুঁ—ওটি এখন পারব না।

পড়বি না তুই। তোকে নিয়ে একছুটে ন্যাশনাল লাইব্রেরি অবধি যাব—আর ফিরে আসব। তুই বসলেই আমার স্কুটারের বউনি হয়ে যাবে। তুই খুব পয়া--

এখন আমার সময় নেই।

কতক্ষণ লাগবে! যাব আর আসব। ধর পঁচিশ মিনিট। বোস মিঠু।

তুই বুঝতে চাইছিস না কেন? আমি এখন একজায়গায় যাচ্ছি যে—

তাহলে বোস। তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি--বলেই সুব্রত স্টার্ট দিল স্কুটারে।

সেই শব্দের ভেতর মিঠু বলল, না। আমি হেঁটে মোড় অবধি যাব। তারপর ট্রামলাইন থেকে মিনিবাসে উঠব।

ওঃ! বুঝেছি। তোর ভয় হচ্ছে শাড়ির ভাঁজটাজ নষ্ট হয়ে যাবে। মাথার চুল উড়বে। নারে। খুব আস্তেই চালাব।

না। পথ ছাড়। আমি হেঁটেই যাব।

একটু সরে দাঁড়িয়ে সুব্রত স্টার্ট বন্ধ করল স্কুটারের। মুখটা কিছু নেভে গেছে এইমাত্র। খুব আস্তে আস্তে জানতে চাইল, কোথায় যাবি?

সে একজায়গায়—তোর দরকার কি?

বল না কে? কার কাছে যাবি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় মিঠু বলল, শুনবি? তবে শোন—আমি এখন মানিকলাল—মানিকলাল মিত্রের কাছে যাচ্ছি।—বলেই সে হাঁটতে শুরু করে দিল।

সব্রত কিন্তু যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই থাকল। স্কুটারের সিটে বাঁহাতে ভর দিয়ে। সেই দশাতেই সে মিঠুকে একটু একটু করে দূর থেকে আরও দূরে চলে যেতে দেখতে লাগল। মিঠু যখন রাস্তায় মাথায় একটা বাড়ির বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছিল –তখন যে কোনও বাড়ির দোতলার ঝুলবারান্দা থেকে লং শটে দুজনকে একসঙ্গে ক্যামেরায় ধরে সিনেমার শট বলে চালাতে হলে এ-দৃশ্যে অতি অবশ্য তার সানাইয়ের দরকার পড়ত।

নয়

জানো বেলা—আমার মনে হয়—আমার জীবনের কাজ সব সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন তো ভাবি আমি এক্সটেনশনে বেঁচে আছি।

সারা পাড়ায় লোডশেডিং। নিজেদের বাড়ির অন্ধকার বারান্দায় মানিকলাল বেলার মুখোমুখি বসেছিল –বেতের হেলান দেওয়া চেয়ারে। বেলা বলল, তা কেন? এখনও প্রায় চার বছর চাকরি করবে। পাশাপাশি লিখবে। রিটায়ার করে পাকাপাকি লিখবে—

বাঃ! সারাজীবনই লিখব?

লেখকরা তো তাই করে।

সবাই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষ ছ'বছর কিছু লেখেননি।

তুমি তো ওঁর মত লিখতে পার না।

তা সত্যি। তবে যা লিখেছি—তাতেই লেখক হবার হলে হব। আর লিখতে ইচ্ছে করে না। আমার এই বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র মারা যান। বিভূতিভূষণও এই বয়সে চলে গিয়েছেন। সারাজীবন নতুন থাকা যে কত কঠিন তা এখন বুঝি। নতুন না থাকতে পারলে কী লেখা যায়? আমি আর লেখার উৎসাহ পাই না। জোর করে লেখার কোন মানেই হয় না—

কোথাও ঘুরে এস।

তুমি সঙ্গে চল বেলা।

আমি কোথাও যাব না। একবার ভাবছি ছোটর কাছে ঘুরে আসব। বড় যেকোন দিন আসতে পারে। ওর বিয়ে দেওয়া দরকার—

মানিকলাল শুনে চুপ করে থাকল। হঠাৎ বলল, কাল অফিসে একটা নতুন জিনিস খেলাম। মধু দিয়ে হরলিকস্। চিনির বদলে। নবনীতার বেয়ারা করে খাওয়ালো।

কে খাওয়ালো?

নবনীতা। ওর ঘরে যেতেই বেয়ারাকে করতে বলল। আসলে নিজে একা খেতে ভালবাসে না। আমার নিজেরই তো আজকাল সব খাবার ছিবড়ে লাগে—তোমার সঙ্গে খেতে বসলে তবে ভাল লাগে।

অন্ধকারে বেলার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। গম্ভীর গলায় সে বলল, তাই যেন লাগে। যেখানে কাজ কর—সেখানে যাদের কাগজ—তাদের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে মাখামাখি করা কি ভাল ?

মাখামাখি কে করল ?

সেবারে তোমায় বেড়াল আঁচড়ায়নি।

কবে ?

সেই যে হাত জুড়ে নখের দাগ—

মনে পড়ল মানিকলালের। কে আঁচড়াবে তাহলে ?

তা আমি জানি না। তবে বেশি হুইস্কি পেটে পড়লে তোমায় যখন শোয়াতে নিয়ে যাই—তখন তো তুমি গলগল করে সব বলে দাও।

সাবধান হল মানিকলাল। এটা তার প্রেমের বয়স নয়। বেশি খেয়ে এক একদিন অজ্ঞান হতে ভাল লাগে তার। তখন কী বলতে কী বলেছে মনেও নেই তার। কি বলেছি ?

মনে নেই আমার।

তবু ?

কিসব জড়িয়ে জড়িয়ে বলছিলে। পূর্ণিয়া জজকোর্টের সেরেস্তাদার বিমল কুমার দত্ত—বারবার বলছিলে—আমার তেমন সেক্সচুয়াল স্পৃহা নাই—

হো হো করে হেসে উঠল মানিকলাল। সে তো সুপ্রভাতে লেখা বিয়ে পাগলা এক সদ্য বিপত্নীকের চিঠি। ছাপা যায়নি। ছাপলে মামলা হয়ে যেত।

ঘুমের ভেতর তুমি নিঃসঙ্গ আনম্যারেড মহিলাদের আশ্রয়প্রার্থী হতে চাইছিলে—তোমার স্ত্রী তোমায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে থেকে থেকে বিছানায় উঠে বসছিলে—আমি একা ধরে রাখতে পারি না—

ওটাও একখানা চিঠি বেলা! ভালুকগোড়িয়া ডাকঘর থেকে লেখা। ছেলেটি বি· এ পাস। এগার বছর বেকার। বউ পলিটিক্স করে। লাথি মেরে বেকার স্বামীকে তাড়িয়ে দিয়েছে—ছেলেটির নাম যতদুর মনে পড়ছে—নলিনাক্ষ পুরকায়েত—

আমি ভাবি—আমি তোমায় কবে লাথি মারলাম ?

তাই বই! লাথি মারলেও জীবনে একটা ভ্যারিয়েশন আসত। মনে হত আমি অপমানিত। আমি জ্বলে উঠতাম। আমি নতুন দিকে নতুন কিছু লিখিতে পারতাম।

মনে রাখবে - লেখার চেয়ে জীবন অনেক বড়।

সে কথা বলতে!

ঘনানন্দ বলে কোন্ এক গুরুর কথা বলছিলে। কবিতা-গান—

সেও যে চিঠির ব্যাপার বেলা। তাও ছাপা যায়নি। উপন্যাসে যা লেখা যায়—ছাপা যায়—খবরের কাগজে তো তো সম্ভব নয়।

নবনীতা। লক্ষ্মীটি। এইসব বলছিলে—

তাই নাকি?

বরফ। আলতা। কত কিসব বলছিলে—তুমি অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে। আমার ঘুম এল না। আমি কাঁদলাম। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখলাম—

দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। মানিকলাল বেলার মুখে তাকাতে পারছিল না। আলোর ভেতর সে যেন কোন আচার্য হয়ে বিশেষ উপাসনায় কথাবার্তা বলছে। সুশ্রী। ভারি। গম্ভীর। নিখুঁত। মাথার চুল কালো। টিকালো নাক। সুন্দর সাজানো দাঁত। রীতিমত স্তনাঢ্য রমণী। সেইসঙ্গে রঙ মিলিয়ে পরা হালকা রঙের শাড়ি ব্লাউজ। নখে নেলপালিশ। গলার স্বর বারো বছরের পুরনো হুইস্কির মতই পরিণত।

সুপ্রভাতে নবনীতা এখন কথা বলারই সময় পায় না। অনেকগুলো টেবিল পেরিয়ে দূর থেকে চোখে চোখ পড়ে। তবু মন্দ লাগে না মানিকলালের। তার যা বয়স এখন—এই বয়সে সরকারি অফিসে লোক রিটায়ার করে যেত। কেডস্ পায়ে দিয়ে অনেকে ভোরে ছড়ি হাতে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়ত।

অথচ আমি তো বুড়ো হইনি। এখনও রীতিমত টগবগ করি। খুব খিদে পায়। সবচেয়ে কষ্ট হয়—এই ভেবে—বাড়িতে কোন শিশু নেই—যার জন্যে ব্যস্ত থাকব। যে কিনা বড় হচ্ছে। স্কুলে যাচ্ছে। সাঁতার শেখাতে হবে যাকে। যার জ্বর হলে থার্মোমিটার দেখব।

এই বেলাই বিয়ের আগে অনেকগুলো টিউশনি করত। বিকেলে ছাত্রী পড়িয়ে ফেরার পথে কালীঘাটের মহিম হালদার দিয়ে ফিরছিল। খোঁপায় সবুজ পাতা সমেত টগর গোঁজা। সারা মুখখানাই এত সুন্দর লেগেছিল মানিকলালের। মনে হয়েছিল—এত সুন্দরী আমার বউ হবে? সত্যিই কি হবে?

নবনীতার সঙ্গে কথা বলা হয় না। আগে ওর টেবিলে গিয়ে মুখোমুখি বসলে নবনীতা কথায় কথায় ওর হাত রাখত মানিকলালের হাতের ওপর। যেন কতদিনের বন্ধু। গাছতলায় দেখা হয়েছে এইমাত্র।

আসলে শিশু—একখানা হাসিমুখ—খবর নেয় এমন মানুষের উদ্বেগ—
—আমাদের জাগিয়ে রাখে। নাহলে আমরা সবাই ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে একদিন ঘুমিয়ে পড়ি। বুকের যেখানটায় হৃদয় সেখানে নতুন চারাগাছ গজালে প্রাণ আবার হেসে ওঠে। নতুন মানুষ যারা এসে পড়েছে হুড়মুড় করে এই পৃথিবীতে—তাদের গরম নিঃশ্বাসে প্রাণের ওপর দিয়ে একরকমের বাতাস বয়ে যায়। তা আমাদের তাজা করে দেয়।

আমার কোন যাবার জায়গা নেই। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। এখন কী খাব তা জানি না। রাতে বেশিরভাগ দিন আমার বা বেলার কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। যাও বা টুকটাক আমি মুখে দিই বেলাতো কিছুই খায় না। বলে খিদে নেই। শুয়ে পড়লাম।

অন্ধকারে মশারির ভেতর শুয়ে প্রথমেই মনে হয়—কাল সকালে আবার আলো আসবে। চারদিক হেসে উঠবে। সূর্য কত দরকারি। সূর্যই তো জগতের সব ক্যালেণ্ডারের বাবা।

পরদিন সকালে মানিকলাল দুটো ব্যাগ নিয়ে বাজারে গেল। আগেকার মত। অনেককিছু কিনবে। যেন অনেকে আজ খাবে। সেসব জিনিস বেলা অনেকক্ষণ ধরে রান্না করবে।

আজ ভোররাতে তার ঘুম ভেঙেছে। বাড়ির সামনে ছোট মাঠটায় বর্ষার জল পেয়ে ঘাসগুলো ঝমঝম করে বেড়ে উঠেছে। তাতে ভোরের লালচে আলো এসে পড়ল। ঘাসে ঘাসে পৃথিবীর বুকের নানারকম পোকা আনন্দে বেরিয়ে পড়ল। কোনটা ঘিয়ে রঙের। কোনটা বাদামী রঙের। আর অমনি দিনের শুরুতে চরতে বেরিয়ে তিনটে শালিখ মহাখুশিতে ঘাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়েই পটাপট পোকা ধরে খেতে লাগল। সবুজ ঘাস। লালচে আলো। ঘিয়ে রঙের পোকা। ছাই ছাই শালিখ। তাদের হলদে ঠোঁট। বেলা তখনও ঘুমিয়ে। অন্যদিন এই সময় আগে উঠে মানিকলাল চুপ করে বারন্দায় বেতের চেয়ারে বসে ওয়েট করে। বেলা ওঠে। উঠে খানিকপরেই চা দেয়। দিয়ে মুখোমুখি বসে। সারা পাড়া তখনও ঘুমে।

আজ চা না খেয়েই ব্যাগ হাতে বাজারে গেল মানিকলাল। নতুন ওঠা কাঁকরোল। জ্যান্ত একটা কাতলা। কুমড়োর ফুল। বরবটি। সবুজ পটল। ব্যাগ ভর্তি করে ফিরতে ফিরতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল মানিকলালের। সে বাজার করতে করতেই ভেবেছে—কোনটা দিয়ে কী রান্না হবে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বেলা। মানিকলাল বলতে যাচ্ছিল, কুমড়োর ফুলুরী করবে আজ – কালো জিরে – কাঁচা লঙ্কা দিয়ে - কম তেলে।

বলা হল না। বেলাই প্রথম কথা বলল, একজন দেখা করতে এসেছে—

কে? এত সকালে?

জয়শ্রী পালিত—

অবাক হয়ে গেল মানিকলাল। জয়শ্রীর চিঠি পেয়ে চিঠি দিয়েছিল সে। অফিসে এসে দেখা করেছিল মেয়েটি। অনেকদিন ধরেই তার লেখা পড়ে। মাঝেমধ্যে এমন কেউ কেউ চিঠি লেখে। দেখা করে। আবার চিঠি লেখে। তারপর একদিন চিঠি লেখায় ভাটা পড়ে। দু-তরফেই। তারপর একদিন তারা

হারিয়ে যায়। ভুলেও যায় মানিকলাল। কোনদিন যদি পুরনো চিঠির ড্রয়ার খোলে তো এক একখানা চিঠি দেখে এক একখানা চিঠি দেখে এক একখানা মুখ মনে ভেসে ওঠে তার।

ঠিকানা পেল কোত্থেকে? আমি কি দিয়েছিলাম? হয়ত চিঠির ওপর ঠিকানা দিয়েছি। মনে করতে পারল না মানিকলাল। বেলাকে বলল, চা দিয়েছ?

চা দিয়েছি। ওমলেট দিয়েছি—তুমি এসে কথা বল।

ঘরে ঢুকে দেখল, হ্যাঁ সেই জয়শ্রী। মাস দুই আগে বিকেলে একদিন তার অফিসে এসে দেখা করেছিল। বাড়ি চিনতে কষ্ট হয়নি?

জয়শ্রী হেসেই বলল, না। একদিন এসে চিনে গিয়েছি।

তা সেদিন এলে না কেন?

বিকেল ছিল। তখন আপনি অফিসে।—বলতে বলতে জয়শ্রী ব্যাগ থেকে একখানা বই বের করল। আপনারই শ্রেষ্ঠ গল্প। পড়লাম ক'দিন ধরে--

পেলে কোথায়?

কিনলাম। যদি সই করে দেন।

দাও!—বইখানা নেওয়ার সময় জয়শ্রীর মুখে তাকাল মানিকলাল। ওপরের পাটির একটি দাঁত সারির কিছু পেছন থেকে উঠেছে। ঠোঁট চেপে হাসলে ঠিক কার মত যেন মনে হয়। খুব চেনা চেনা। হালকা সাদা রঙের ছাপা শাড়ি। তাতে নীলচে নীলচে ফোঁটা। মাথার চুল ছাড়া। কবজিতে ছোট ঘড়ি। গলায় বা কানে কিছু নেই। ব্যাগের মুখ থেকে ফোল্ডিং ছাতার মাথা বেরিয়ে। স্ট্র্যাপওয়ালা জুতো সিঁড়িতে।

আরেক কাপ চা খাবে?

এই তো খেলাম।—বলে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, কোথায় বসে লেখেন?

তেমন কোন বাছ নেই আমার। ও ঘরের টেবিলে লিখি। আবার এই যে কেরোসিন কাঠের টেবিলটা দেখছ—ওটাতে খাতা রেখেও লিখি। অল্প বয়সে বিছনায় বসেও লিখেছি। তখন ছেড়েরা টেবিলে বইখাতা রেখে পড়াশুনো করত।

বলতে বলতে মানিকলালের মনে হল—আমি এমন তো কিছু লিখিনি—যেজন্যে নিজের হয়ে সাতকাহন বলতে হবে। বিষবৃক্ষ, চোখের বালি, অপরাজিত, গণদেবতা, জননী, ঢোঁড়াই চরিতমানস—কোনটাই লিখতে পারিনি। পারিনি একখানা নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, ভাতের গন্ধ, দ্বাদশ ব্যক্তি, নিলয় না জানি, সেই সময়, আমিই সে, পারাপার কিংবা উত্তরাধিকার লিখতে। আমার লেখা নিয়ে এত কি বলার আছে। আমার বই তো কেউ পড়ে না। ষোলশো

বিক্রি হবার পর মুখ থুবড়ে পড়ে। শেষ চারশো গুদামে পচতে থাকে। অন্তত কুড়িখানা বই আউট অব প্রিন্ট। যারা বই ছাপে তারা বিজ্ঞাপনও করে না। আমি কোন প্রাইজও পাইনি। কেউ আমার লেখা নিয়ে সিনেমাও তোলে না। থিয়েটারও হয় না। বর্ধমানের গাঁ থেকে কেউ হয়ত একটা লেখা পড়ে চিঠি লেখে। আমি আবার লেখক নাকি! তা নিয়ে এমন বাড়াবাড়িই বা করার কি আছে?

মানিকলাল শান্ত গলায় জানতে চাইল, আমার লেখা কেউ পড়ে?

আমাদের পাড়ার লাইব্রেরিতে আমি বলে বলে কয়েকখানা আনিয়েছি।

কেউ পড়ে সেসব বই?

না পড়লে ইস্যু হয় কি করে।

তা বটে!

তবে কম লোক আপনার বই পড়ে। আবার যারা পড়ার তারা পড়ে নিশ্চয়।

হবে হয়ত।

জয়শ্রী ঘুরে ঘুরে বাড়ির চারদিক দেখল। এ পাড়াটাই নতুন—তাই না? বড় সুন্দর দেখতে।

অনেকদিন এত কম বয়সের কোন মেয়ে মানিকলালের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। রোদ্দুর চড়ে গিয়ে এখন ঘাসগুলোকে কড়া সবুজ করে তুলেছে। তার মাঝে বাড়িওয়ালার বসানো সন্ধ্যামণি, অপরাজিতা। শালিখের সঙ্গে নাম না জানা আরও কয়েকটা পাখি ওই ঘাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমার মা আপনার বই খুব পড়তেন। তাঁরই আগ্রহে আমি আর দাদা আপনার বই প্রথম পড়ি।

তাই বুঝি।

প্রথম পড়ি তেরোবছর বয়সে—

তখন তো তুমি বেশ ছোট। ভাল লাগত?

কিছু বুঝিনি। পড়ে পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।

চুপ করে থাকল মানিকলাল।

মা একদিন আপনার 'নরকের তিন সন্ত' পড়ছে—শীতকাল। খাটের কোণে রোদ এসে পড়েছে। মায়ের গায়ে ছাই রঙ চাদর। আপনার বইখানার মলাট মেরুন রঙের—

হ্যাঁ। ফার্স্ট এডিশনে তাই ছিল মলাটের রঙ।

সারাদিন ঘরে মা বইখানা পড়ল। এখনও চোখ বুজলে সে দৃশ্য দেখতে পাই।

মানিকলাল বুঝতে না দিয়ে জয়শ্রীর মুখখানা দেখছিল। স্বপ্নে চোখ দুটো টলটল করছে। এ-ই কি তাহলে লেখক হিসেবে আমার পুরস্কার?

জানেন—মা আপনাকে চিঠি লিখতেন—

কোথায় ? আমি তো কোনদিন পাইনি।

পাবেন কি করে! মা তো সেসব চিঠি কোনদিন ডাকে দেননি। কোন বই পড়ে ভাল লাগলে—চিঠি লিখতে বসে যেতেন। লিখে রেখে দিতেন।

আছে সে সব ?

সবই আছে মনে হয়।

একখানা চিঠি পড়াতে পার ?

উহুঁ। সেটি হচ্ছে না। সে সবই বাবার সম্পত্তি। নাড়াচাড়া করা যাবে না।

কতদিন হল মারা গেছেন ?

প্রায় দশ বছর হল। এই দশ বছরে আমি অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়েছি। একটা একটা করে আপনার বই খুঁজে খুঁজে পড়েছি। গত বছরের আগের বছর বইমেলার সভায় দাদা আর আমি গেলাম। দেখি আপনি স্টেজে—ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি গায়ে—অনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা অত সাপোর্ট করছিলেন কেন ?

ওই সভাতেও গিয়েছিলে ?

তাহলে শুনুন—আজ থেকে সাত বছর আগে—একদিন সকালে আকাদেমিতে আপনি গল্প পড়তে বসলেন মাইকে—আপনাকে দেখে আমি সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছি—মানিকলাল—মানিকলাল—

তাই নাকি ? সেখানেও গ্যাছো ?

শুনুন। দাদা আমাকে টেনে বসাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। আপনার পড়া শেষ হলে হাততালিতে হল ফেটে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে আমার গলা বুজে এসেছে—

অবাক হয়ে শুনছিল মানিকলাল। সে সত্যিই অবাক। সাহিত্যের এমন সমঝদারি হয় নাকি ? সে তো জানত না। স্টেজে বসে উল্টোদিকে পাঠকদের সব মুখ একাকার হয়ে যায়। বিশেষ করে কাউকে আলাদাভাবে চেনাও কঠিন।

দেখলাম- আপনি উঠে যাচ্ছেন। আমিও উঠলাম। দেখলাম—ফার্স্ট রোয়ে এসে আপনি এক মহিলাকে ডাকছেন। বুঝলাম উনিই বেলা মিত্র।

নাম জানতে তুমি ?

বাঃ! আজকালের ইন্টারভিউতেই তো আপনাদের ছবি ছাপা হয়েছিল। তাতেই বৌদির নাম ছিল। আপনারা দু'জন হল থেকে বেরিয়ে আকাদেমির গেটে এলেন। আপনি হাত দিয়ে ট্যাক্সি থামালেন। তারপর এত মিষ্টি করে বৌদিকে ডাকলেন—বেলা-আ। বৌদি গিয়ে ট্যাক্সিতে বসলেন। আপনিও বসলেন। ট্যাক্সিটা আমার বুক ভেঙে দিয়ে চলে গেল। সেদিনই বুঝলাম— —জেলাসি কাকে বলে—

শুনতে শুনতে চমকে উঠল মানিকলাল। এসব সে কি শুনছে ? কয়েকগজ

দূরে বেলা মিত্র এখন চোখে চশমা দিয়ে খবরের কাগজগুলোর রবিবারের সাপলিমেণ্ট দেখছে। তার কানে এসব কথা গেলে কি হত?

জেলাস হলে কেন?

অত সুন্দর গল্পটা পড়লেন। আর কেউ অমন গল্প লিখতে পারে না। মানুষ আর শিশুর বাবা হতে পারবে না—অথচ বেড়াল মা হচ্ছে—পৃথিবীতে ফুল ফুটছে এখনও। পাঞ্জাবি পরে খুব ম্যাজেস্টিক দেখাচ্ছিল আপনাকে। পাশে অত গ্রেসফুল বৌদি। এই ছিল থিম।

ভুলে যেও না জয়শ্রী—আমাদের দুজনেরই বয়স হয়েছে। আমরা কাছকাছি বয়সের। আমি এখন ছাপান্ন প্লাস—

আপনারা ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিলেন?

না। আমার স্ত্রীকে যখন বিয়ে করি—তখন খুবই সুন্দরী ছিলেন। আমি আজও গোপনে তাকিয়ে থাকি। যখন ছেলেরা ছোট ছিল—যখন খুব পরিশ্রম করতাম—অন্যরকম জীবন ছিল তখন আমার—সেসময় বেলার দিকে তাকাবার সময় পাইনি। এখন বুঝি তখনই সে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল—অথচ আমি খেয়ালই করিনি। এখন ভাবলে দুঃখ হয়।

জয়শ্রী দুহাতে হাততালি দিয়ে উঠল। একমুখ হাসি।

মানিকলাল অবাক। কি হল?

এই তো লাইফ মানিকলাল! আপনার মুখের কথা হুবহু আপনার লেখার লাইনের মত।

আমি যা ভাবি—তার ভাঙাচোরা টুকরো—কাগজের ওপর কলম দিয়ে বসিয়ে দিই।

আমি জানি। জামি জানতাম। আমি এমনই ভেবেছিলাম। সেদিন আকদেমির গেটে শুধু শুধু জেলাস হইনি। এমন ম্যাজেস্টিক চওড়া কাঁধ—

লজ্জায় ভয়ে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হল মানিকলালের। দরজা খোলা। বেলা কাগজ পড়ছে। ওর কানে যায়নি তো? সাহিত্যের সমঝদারিতে মিঠুনের ভাব এসে যাচ্ছে নাকি!

তুমি এখন কি পড়ছ?

এখন? মানিকলালের উপন্যাস সমগ্র। প্রথম খণ্ড। বন্ধুবিহীন নভেলেটে আপনি যেখানে বলেছেন—বুকের ভেতর নীল আলো জ্বলে—

ওটাও পড়েছ?

হ্যাঁ। বন্ধুবিহীন আমার খুব প্রিয়। আচ্ছা, কোন্ সালে লেখা?

বোধহয় নাইণ্টিন সিক্সটিনাইনে—

অতদিন আগে। আমার তখন তিন বছর বয়স ছিল—

আমি কিন্তু আমার বই পড়ার কথা জানতে চাইনি জয়শ্রী। তোমার

নিজের পড়াশুনো কি করছ ?

চার্টার্ড আমার দ্বারা হবে না। কোম্পানি সেক্রেটারিশিপের বইপত্তর কিনেছিলাম। বিচ্ছিরি সব বই। আর পড়িনি।

কিসে অনার্স ছিল ?

অ্যাকাউন্টেন্সি। সাউথ সিটি থেকে পাস করেছি।

এম. কম পড়।

সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স—নম্বর খারাপ ছিল না। কিন্তু আবার এম কম পড়া আমায় দিয়ে হবে না।

তাহলে বি. এড দিয়ে স্কুলে চেষ্টা কর।

আপনি আমায় চাকরিতে ঢোকাবেনই। আমি পড়াতে পারব না। বাবা আগে প্রায়ই বিয়ের সম্বন্ধ আনতেন। মিলিটারিতে ডাক্তার—ক্যাপ্টেন। তাদের বাড়ির লোক এসে পছন্দ করে গেল।

ভালই তো।

আমি রাজি হইনি।

কেন ? ডাক্তার ছেলে তো ভাল।

আমার ভাল লাগে না।

তোমার বাবার বয়স কত ?

এখন বোধহয় সত্তর। তা দশ বছর হল রিটায়ার করেছেন। কেন ?

তোমার দাদা একদিন বিয়ে করবে। বাবা কারও চিরকাল থাকেন না। তুমিই তোমার জীবন ঠিক করবে। ভাল ছাত্রী ছিলে। কাজ নাও। নয়ত—

বিয়ে কর। আপনি ঠিক বাবার মতই কথা বলছেন।

আমি তো তোমার বাবার মতই। বিয়ে না কর তো পড়—

আমি তো পড়াই। টিউশনি করি। অ্যাবসেণ্ট হলে ছাত্রের বাবা পরদিন বলে—জয়শ্রী কাল তুমি আসনি—কাল দিনটা ভাল যায়নি। আচ্ছা আপনার যে হাফ বাস্ট ছবিটা ছাপা হয়—ওটা কবেকার ?

তের চোদ্দ বছর আগের। এক ছাব্বিশে জানুয়ারির সকালে বালেশ্বরে হাইওয়ে বাংলোর বারান্দায় বসেছিলাম—তখন তোলা—সারারাত ঘুম হয়নি। দাঁতন থেকে বাই কার বালেশ্বরে এসে পৌঁছেছিলাম আগের দিন, রাত প্রায় একটায়—

ছবিটায় আপনার চওড়া কাঁধ ধরা পড়েছে। আমার মায়ের খুব প্রিয় ছিল ছবিটা।

তোমার ?

দেখুন চওড়া কাঁধ আমার ভাল লাগে। পুরনো দিনের ছবিতে ছবি বিশ্বাসকে দেখেছি। খুব ভাল লাগে ওঁকে—এই যে আপনাকে দেখছি—চওড়া কাঁধ—

আমার ভীষণ ভাল লাগে। মনে হয় চেনা। চওড়া হাত। মনে হয় চেনা। চওড়া বুক বিশাল বটগাছের মত লাগে। মনে হয় ভেতরে পাখি, সাপ, অন্ধকার, বন্দী ঝড়ের বাতাস—সব ওখানে আছে। ঠিক স্টিভ ম্যাকুইনের মত।

সে কে?—ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠছিল মানিকলাল।

জানেন না? হলিউডের—শুধু ডান পা দিয়ে একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে সবসময়। ফাঁকা মাঠের ভেতর একা ধরা পড়ে—হাতকড়া পরানোর পর বুক চিতিয়ে হেঁটে প্রিজন ভ্যানে ওঠে॥

আমি ইংরিজি ছবি বিশেষ দেখিনি। সেন্সর বোর্ডের মেম্বার থাকতে দু-চারটে দেখতে হয়েছে—বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক মানিকলাল চটি থেকে পা মেলে একদম জয়শ্রীর পায়ের ওপর পা রেখে ফেলল।

জয়শ্রী পা সরালো না। মানিকলালও না। নেলপালিশ লাগানো ছোট পা তার নিজের ভারি পায়ের পাতার নিচে চাপা পড়ে গেল।

পাঁচ-ছ গজের ভেতর পাশের ঘরেই বেলা নাকে চশমা চেপে খবরের কাগজে মন বসাতে চাইছে। তার মুখ দেখে মানিকলাল বুঝতে পারছিল—বেলা পারছে না। তার কোঁচকানো ভ্রূ বলছে—তুমিই বা জয়শ্রীর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী কথা বলছ। এক ফোঁটা একটা মেয়ে!

তোমার মা কিসে মারা যান?

কিডনি ফেল করেছিল। আসলে মা বিয়ের আগে বহুদিন ঊষাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ে যখন পড়িয়েছেন—তখন খুব অনিয়ম করেছেন। বিয়ের পর আর পড়াননি। কিন্তু সে অনিয়মের ছাপ আমার মায়ের মুখে সব সময়ে ছিল। মা আসলে খুব চাপা ধরনের মানুষ ছিলেন। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। আমাকে আর দাদাকে মেরে মা অস্থির হয়ে পড়তেন। লাল হয়ে যেতেন। মার খেয়ে আমরাই মাকে তখন জল খাওয়াতাম। বাতাস করতাম। মায়ের গায়ে হেলান দিয়ে খুব আরাম লাগত।

কি রকম?

মায়ের গা খুব ঠাণ্ডা ছিল।

তুমি আজ এখানে খেয়ে যাও জয়শ্রী। বাজার করেছি। রোদও চড়ে গেছে—

ওরে বাবা! তা হবার নয়। আমি ভোরে রান্না করে এসেছি। আমায় ফিরে সব করতে হবে। বাবা আমার হাতের রান্না ছাড়া খান না। আমি বেড়ে না দিলে নিজে নিয়ে খাবেনও না।

তোমার মায়ের ঠিক ঠিক চিকিৎসা হয়েছিল?

বলতে পারেন ভুল চিকিৎসাটা খুব ঠিকভাবে হয়েছিল। বাবা একা। আমরা ছোট তখন। মায়ের নামটা ছিল খুব অদ্ভুত—জানেন—

কি?

বনলতা—বনলতা পালিত।

দশ

আচ্ছা—চেনা জায়গা মানে কি? যেখানে জানাশুনো লোকের সঙ্গে দেখা হয়। আমি জানি যে—ওখানে ডাক্তার—সেখানে বন্ধু—দোতলায় বউ—ছ'টা মোড় পেরলে অফিস—সেখানে একটা কাউণ্টার থেকে মাসে একদিন মাইনে হয়। তাই দিয়ে ডালভাত, বাড়িভাড়া, লণ্ড্রি, সকালের কাঁচা বাজার, মুদিখানায় মাসকাবারি—একটা পেস্ট, একটা সেভিং ক্রিম, বড়দানার মসুর ডাল দুই কেজি। এই তো।

অফিসে বসা যায় কি করে। চাকরি নিয়ে। চাকরি কি করে? পড়াশুনো করে। পড়াশুনো কেমন জিনিস? শেক্সপীয়র—ফিজিক্স—মার্কেণ্টাইল ল।

নিজেও অফিস করে বসা যায়। ব্যবসা করে। আলু পটল। গাইনোকোলজি। জুরিসপ্রুডেন্স—দাঁত তোলার কায়দা শিখে।

আরেকটু এগিয়ে আছে—গবেষণা। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত পূর্ব ভারতে ভারতীয় শিল্প গড়ে তোলায় ব্রিটিশ কন্ট্রিবিউশন অ্যাণ্ড হিণ্ডান্সেস।

আর ভবিষ্যতে কী হবে? তা বলতে পারে গণৎকার। আর বলতে পারেন মনীষীরা।

ঘরভর্তি লোকের মাঝে মোলায়েম হুইস্কিকে গলা দিয়ে নামিয়ে দিতে দিতে মানিকলাল মিত্র এইসব ভাবছিল। শুধু শুধু ক খ গ ঘ শিখে সাধের জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করা কেন? জীবনটা তো খেলে বেড়াবার। কী দরকার মনীষী হবার? সফল হয়েই বা কী লাভ?

ঘরভর্তি সচ্ছল লোকজন। তাদের উজ্জ্বল গর্বিত রঙিন সব বউ। তার চেয়েও রঙিন তাদের ঠোঁট আর শাড়ি। সবার মাঝখানে বসে বিদ্যাসাগরের চেলার নাতির জামাই পরিতোষ যার যেটা পছন্দ সেটা ঢেলে দিচ্ছিল। তার মুখে আপ্যায়নের হাসি। পাশেই টান টান দাঁড়ানো সোডার বোতলগুলো ঝাঁকালেই সভ্যতা, কৃতিত্ব, গার্হিস্থ্য, আরাম—সবকিছু একসঙ্গে ফেনা হয়ে ঠেলে উঠবে। তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে পরিতোষের বউ নবনীতা। মুখে হাসি।

মানিকলালের একসময় মনে হল—ও নবনীতা নয়। আসলে বেলারানী ঘোষাল ওরফে নীলিমা দেবী। যে কিনা আগরতলায় 'অবস্থিত' শ্রীপুর উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। যার দাবি—আমিই খনা—আমিই কুন্তী। দেশের জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধী দ্বাপরে আমার দাদুভাই ছিল এবং মাও-সে-তুং-এর স্ত্রী আমার দিদিমা ছিল। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চাণক্য ছিল।

মানিকলালের চোখের সামনে চোখ ওঠার রামধনু। ঘরের ভেতর সেই

রামধনুর-সাত রং ধনুকটাকে সে নবনীতার কপাল ছুঁয়ে বাঁক নিয়ে মেঝের কার্পেটে এসে ঠেকে গেছে দেখতে পেল। তখন সেল্‌ফ স্টাইল অবতার বেলারানী ঘোষাল ওরফে নীলিমা দেবী ওরফে নবনীতা এগিয়ে এসে মানিক-লালের সামনে দাঁড়াল। আর খাবেন না।

মানিকলাল হাতের গ্লাসের বাকিটা এক ঢোকে শেষ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এবারে বাড়ি যান। যেতে পারবেন তো—?

খুউব। —বলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে লিফটের দিকে যাবার বদলে পাশের ঘরের দরজায় হেলান দিল। দরজা খোলা ছিল। ফলে মানিকলাল দড়াম করে পাশের ঘরের কার্পেটে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পড়ল না। টাল সামলে কোনরকমে ফাঁকা ঘরের শূন্য বিছানায় গিয়ে পড়ল। একবার তার মাথায় ঘূর্ণির মত এই ভাবনাটা গুলিয়ে উঠল—তাহলে পরিতোষদের এই অ্যাপার্টমেণ্ট ক'খানা ঘরের ?

আবজানো দরজায় হেলান দিতে গিয়ে টলে যাওয়া মানিকলালকে ধরতে গিয়ে তার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে নবনীতাও এ ঘরে এসে পড়ল। ততক্ষণে মানিকলালের কোমর থেকে মাথা অব্দি গদির বিছানায়। ট্রাউজারে ঢাকা পা দু'খানা মেঝেতে ঝুলে আছে।

নবনীতা বলল, বেশ। এভাবেই গড়িয়ে নিন। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

তখনও মানিকলাল যেটুকু মনে করতে পারছিল—সেই গলাতেই গাঢ় গলায় ডাকল। জয়শ্রী—এখনই যেও না জয়শ্রী—

পালচৌধুরী হাউসের মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। আমি জয়শ্রী নই—

বেশ তো। তুমি তাহলে বেলারানী ঘোষাল।

রীতিমত বিরক্তিতে ফেটে পড়ল নবনীতা। কে ?

ওরফে নীলিমা দেবী। তুমিই খনা—তুমিই কুন্তী। জানি—নেতাজী তোমার ছোটকাকা।

হাসি সামলাতে পারল না নবনীতা। সে এগিয়ে এসে দুটো পা সুদ্ধ মানিকলালকে আগাগোড়া গদিতে তুলে দিতে গেল।

অমনি মানিকলাল বলল, ভারত বাংলাদেশ নেপাল পাকিস্তান ভূটান নিয়ে একটা মহাভারত সরকার হবে। তিনমূর্তি ভবনে বন্দী নেতাজী ওখানে বসে বহু বই লেখে।

কি ?

সেগুলো সামান্য পালটে নেহরু নিজের নামে প্রকাশ করে। আসলে নেতাজী ওসব বই নিজের মেয়েকেই লিখেছিল।

তাই নাকি!

এভাবে নেতাজীর লেখা প্রকাশ করে নেহরু পণ্ডিত নেহরু হয়েছে—

খিল খিল করে হেসে উঠল নবনীতা, তাই বুঝি!

হু। ইন্দিরা নিজেই সন্তোষী মায়ের অবতার হতে চেয়েছিল। পারেনি। সে সময় আমি শান্তিপাড়ায় অঘোর ঘোষের বাড়ি ভাড়া থাকতাম।

নবনীতার মাথায় দুষ্টুমি চাপলো। ঘাগু জার্নালিস্ট। দাগী লেখক। নেশার ভেতরেও দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে বলছে। সে পরিষ্কার জানতে চাইল, আমি? আমি কে? আমি তখন কোথায়?

তুমি? জয়শ্রী পালিত। ওরফে বেলারানী ঘোষাল। আগরতলায় টিচারি কর। ওরফে নীলিমা দেবী। গতজন্মে ছিলে দ্রুপদ রাজার মেয়ে দ্রৌপদী। তোমার বাবা রাজা দ্রুপদ পরে গফ্‌ফর খাঁ হয়ে জন্মান। যেমন কিনা নাম্বুদ্রিপাদ আগে জন্মেছিলেন নিত্যানন্দ হয়ে—

ওঃ! হোঃ! হোঃ! হিলারিয়াস। তারপর?—হাসতে হাসতে নবনীতা ঘেমে ওঠা মানিকলালের বুকের বোতাম খুলে দিতে গেল।

তখন মানিকলাল তোড়ের মাথায় বলে যাচ্ছিল, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত আর. পি. এল. ও প্রেসিডেন্ট আরাফত ছিল দ্রুপদ রাজার দুই ছেলে—তোমার দুই দাদা। এখন ওদের ভেতর বড়জন তোমার দাদা সুপ্রভাতের অফিসে আর আসে না—সুপ্রভাতের নিউজপ্রিন্ট সময়মত কেনা হয় না—

ঘামে মানিকলালের সারাটা বুক ভিজে। বোতামগুলো খুলে দিয়ে নবনীতা শুনতে শুনতে বলে উঠল, ব্রিলিয়ান্ট!—বলেই চোখ বুজে আসা মানুষটার ঠোঁটে সে নিজের ঠোঁট জোরে চেপে ধরল।

মানিকলাল কি বাগ মানে। তখনও সে ওরফে, ললিতা শাস্ত্রী, অম্বালিকা—এই সব শব্দ বলার চেষ্টা করছিল। তার সঙ্গে মেলানো ছিল কিছু 'গতজন্মে', 'সত্যযুগে', 'দ্বাপরে'। নবনীতা মানিকলালের হুইস্কি ভেজা—ঘামে পেছল আর গরম দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আর কোন শব্দ বা কথা যাতে না বেরোতে পারে সেজন্য নিজের দুই ঠোঁট দিয়ে সবটা জায়গা সে একাই দখলে রাখতে বেশ হা করে একটা চুমু ঘষটে চেপে ধরল। আর মনে মনে বলতে লাগল, পাঠকদের চিঠিপত্র পড়তে পড়তে মাথাটাই একদম বিগড়ে গেছে। অন্য কিছুতে সরিয়ে দিতে হবে।

মানিকলাল তখনও আবছা মত টের পাচ্ছিল, তার পিঠের নিচে বিছানাটা কেবলই তলিয়ে যাচ্ছে—আর সেই সঙ্গে সেও নিচে নেমে যাচ্ছে। কোথাও আটকাচ্ছে না। অথচ বুকের ওপর একটা সুগন্ধী হাঁস পড়ে আছে।

আর কিছু সে মনে করতে পারল না।

নবনীতা উঠে বসল। সে কখনও তাদের অফিসের কোন কর্মচারীকে এমন

ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেনি। বিশেষ করে জুতো পায়ে। সে এবার আলগোছে খোলা বুকে ঠোঁট রেখেই তুলে নিল।

পৃথিবী শুধু সুপ্রভাত কিংবা মানিকলাল, জয়শ্রী, বেলা, নবনীতা ইত্যাদি লোকজন বা জিনিসপত্র নিয়েই নয়। এখানে আরও মানুষ ও জিনিস আছে। একটা পিঁপড়েও এখানে কামড়ে প্রতিশোধ নেয়। আবেগ, আহ্লাদ, রাগ, দুঃখটুঃখ এক মোড়কে এমনই একটা জিনিস - যার নাম মানুষ। তা এখানে হেঁটে চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে কত কত চলন্ত কাহিনী সারা দুনিয়া জুড়ে।

বর্ষা চলে গেছে। তবু এক একদিন আকাশ গুড় গুড় করে। দুপুরে সারা পাড়া যখন ঘুমিয়ে তখন মানিকলাল একখানা খাম পেল। ডাকে। খুলেই দেখে - জয়শ্রী লিখেছে —

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কেমন আছেন? নিশ্চয়ই লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত। তবুও চিঠি দিয়ে বিরক্ত এবং বিব্রত দুই-ই করলাম। সেই 'স্বপ্নের দিনটির' স্মৃতিতেই এই চিঠি।

কৈশোরের সূচনাপর্ব থেকে সুখ ও দুঃখের দিনের সাথী যে সমস্ত প্রিয় বই তার লেখককে কাছাকাছি বসে দেখা বা তার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য নিজেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল - সুতরাং না হল কিছু বলা না হল কিছু শোনা। কিন্তু 'অনেক কথা শোনার ছিল, হয়ত কিছু বলারও'—

কোন্ কোন্ কাগজে একবার লিখছেন? গল্প কোথায় কোথায় পাবো? আপনার 'শাদা কথায়' বলে একটা ধারাবাহিক লেখা বেরতো। সেটা কি বই হয়ে বেরিয়েছে?

যদিও চিঠিতে অনেক প্রশ্ন আছে, তবুও—

এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়
আপাতত এটা দেরাজেতে দিয়ো রেখে
পারো যদি সময় সুযোগ মত—
উত্তর দিয়ো বেশ বড়োসড়ো করে।

আর সবচেয়ে ভাল হয়, যদি কোন এক সুন্দর রবিবারের বিকেলে সেই পরিচিত আনন্দময় কণ্ঠস্বরটি ভেসে আসে 'এটা কি জয়শ্রী পালিতের বাড়ি?'

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা রইল।

শেষে ঠিকানা আর তারিখের নিচে পুনশ্চ দিয়ে জয়শ্রী লিখেছে—

এ সোমবার টিভিতে দেখলাম তারাশঙ্করের ওপর বলছিলেন। সাদা পাঞ্জাবি পরলেন না কেন?

বেলা বলল, কার চিঠি?

আগে হলে বেলাকে দেখাতো। সেদিন জয়শ্রী অমন বসে থেকে হেসেছে—কথা বলেছে—কেন জানি পছন্দ হয়নি বেলার। বনলতা পালিত আমার লেখা

ভালবাসতেন। তিনি আর নেই। নিজের কিশোরী মেয়ে জয়শ্রীকে আমার লেখা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। চলে যাওয়া মায়ের ধরিয়ে দিয়ে যাওয়া জিনিস বলেই হয়ত আমি জয়শ্রীর কাছে ওর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে দামী হয়ে উঠেছি। নয়ত আমি কি সত্যিই অমন কদরের লেখক।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই মানিকলাল তার বউ বেলাকে একটা মিথ্যে কথা বলল। এমনি—প্রেস ক্লাবের চাঁদার চিঠি।

অল্প বয়সের ছেলেমানুষিও চিঠিতে আছে।

এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়—উত্তর দিলে কিন্তু বড়োসড়ো করেই দিতে হবে। কি উত্তর দেবে? চিঠিখানা পেয়ে মনে হল—তার একখানা জবাব লেখা দরকার। কিন্তু কি লিখবে? কি নিয়েই বা লিখবে? জয়শ্রী আমার ছোট ছেলের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। এইসব মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে জানলে না হয় বেশ কিছু পরেই জন্মাতাম। এখন এই বয়সে কি চিঠি লিখব?

একবার জীবনে একটি মেয়েকে অনেক চিঠি লিখেছিলাম। এখন জয়শ্রীর যা বয়েস—সেই বয়সে চিঠিগুলো লিখেছিলাম। আমি তখন বেকার। মেয়েটি আর কি করে? নিজের বিয়ে অন্য জায়গায় আটকাতে দু'বছরের জন্যে বিদেশে পড়তে গেল।

তখন ফি-হপ্তায় চিঠি লিখতাম। কত কথা। কত আশা। মেয়েটি বিদেশ থেকে দেশে ফিরল বর নিয়ে। আমি চিঠিগুলো ফেরত চাইলাম। দিল না।

তারপর আমি সংসারী হয়েছি। আমি এখন একটা প্রতিষ্ঠান। আমার বউ বেলা। আমার লেখা বই। দুই ছেলে। এক ছেলের বউ। বইয়ের র‍্যাক। গানের রেকর্ড। ইনসিওরেন্স। ব্লাড প্রেসারের বড়ি—ডাইটাইড্। দুটো দাঁত তুলতে হয়েছে। মুখের এমন জায়গায় যে কথা বললেও দেখা যায় না। তাই বাঁধাইনি।

আমাকে লেখা মেয়েটির চিঠিগুলো একটা খোলা দেরাজে পর পর পড়ে ছিল। নীল এয়ারোগ্রাম কাগজে একবার মেয়েটি লিপস্টিকে তার ঠোঁটের ছাপ দিয়ে পাঠিয়েছিল। সে চিঠিখানাও ওখানে ছিল। চিঠির শুরুই করত মেয়েটি এইভাবে—ও আমার মানিক। তখনো আমি পাঠকদের মানিকলাল হয়ে উঠিনি।

বিয়ে হয়ে এসে বেলা চিঠিগুলো পড়তে লাগল। গোপনে। যখন আমি অফিসে বসে খুব মন দিয়ে খবর লিখছি। তখন। পড়ে আর গম্ভীর হতে থাকে। কারণ খুঁজে পাই না। শেষে দেখি—দেরাজের চিঠিগুলো অগোছালো। তাই একদিন চিঠিগুলো এক জায়গায় করে আগুন দিলাম। পঞ্চাশ ষাটখানা চিঠি।

বিলিতি কাগজের। আগুন প্রায় ফুটখানেক উঠেছিল। ও আমার মানিক।— লেখা সমেত চিঠির কাগজ তখন পুড়ে কালো ঢেউ হয়ে উঠেছিল।

এর পর তো আর কোন মেয়েকে আমি চিঠি লিখিনি। তা বত্রিশ তেত্রিশ বছর হয়ে গেল। সেদিন অভিমানের চেয়ে অপমান বেশি ছিল ওই পোড়া ঢেউয়ে। পরে আস্তে আস্তে বুঝেছি- বিদেশে থাকতে ইরার কাউকে ভাললাগা বা ভালবাসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। যেমন কিনা আমার অজান্তেই আমি বেলাকে ভালবেসে বসে আছি।

হ্যাঁ। চিঠি আমি বেলাকে লিখেছি। বিয়ের পর। যখন দূরে কোথাও গেছি। টোকিওর বাইরে উড়ে গেছি ক-দিনের জন্যে। ইয়াকোহামায়। ফিরে এসে হোটেলের রিসেপশন কাউণ্টারে চিঠির খোঁজ করেছি। যদি বেলা উত্তর দিয়ে থাকে আমার চিঠির। তখন ছেলেরা ছোট। কোন চিঠি পাইনি বেলার। আমার ঘোরাঘুরির ভেতর ওর চিঠি আমায় খুঁজে পায়নি। হারিয়ে গেছে।

নিউইয়র্কে গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশনের কাছে ডাকঘর। কোডাকের অফিস। প্যানআমের অফিস। সেখানে বক্স নাম্বারে বেলার চিঠি আসার কথা। দিন পনের ধরে ঘোরাঘুরি করে নিউইয়র্কে ফিরে এসেই বেলার চিঠির খোঁজ করেছি। বড় আশায়। যদি জবাব দিয়ে থাকে। আসেনি। খুব মন খারাপ করে পাতালে নেমে একা একা টিউব ধরেছি। তখন চিঠির বেলাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হত। মনে হত—কবে দেশে ফিরব। আর কতদিন পরে— । আবার পাঞ্জাবের গাঁয়ে গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে মোটর সাইকেল থেকে উটের পালের ভেতর পড়ে গিয়েছিলাম হাইওয়েতে। হাসপাতালে জ্ঞান হয়ে প্রথম ভেসে উঠেছিল বেলার মুখ।

আর কোনদিন কাউকে চিঠি লিখিনি। লিখি না। কাউকে বই উপহার দিলে কিছু লিখে দিই না আর। কি হবে দিয়ে? ক'দিনের বা সম্পর্ক। ক'দিনই বা আছি। আগেকার কত কত ভালবাসার জোড় কেমন আস্তে ধীরে ঢিলে হয়ে গেছে। ভুলে গেছি। এই তো হয়।

আমার ছোটছেলের বিয়েতে ফোনে ইরাকে বলেছিলাম। আসতে পারেনি। পরে এসে একটা আঙটি দিয়ে গিয়েছিল। বেলার হাতে। সঙ্গে এক বাক্স মনোহরা। ক'দিন আগে ফোনে জানতে চাই, কেমন আছ?

ওপাশ থেকে ইরা বলল, এক সপ্তাহ হল আমার স্বামী মারা গেছেন।

কি বলব? চুপ করে রইলাম। শেষে বললাম, কোন কিছু করতে হলে বোলো। আমি আর বেলা সময় করে যাব।

ইরা সেদিন 'আচ্ছা' বলে ফোন রেখে দিয়েছিল। তিন যুগেরও ওপার হতে কোন স্মৃতিই মনে পড়ে না। লোকের মুখে—প্রবন্ধে—সমালোচনায় —পাঠকের কথাবার্তায় আমি এখন শুধুই মানিকলাল। বিশ্বভারতী পত্রিকায়

সেদিন একটা প্রবন্ধে একজন লিখেছেন—মানিকলালের নিসর্গমুগ্ধতায় কোন ঈশ্বর নেই। রূপমুগ্ধতার গভীরে তাঁর এই ঈশ্বরহীনতা তাঁর সর্বকালীন হবার পথে প্রধান বাধা। এই অল্পের জন্যেই তিনি মহৎ শিল্পী হতে পারবেন না। এটাই তাঁর প্রধান অন্তরায়।

কিন্তু আমি তো ইরার গলায় গান শুনে তার ভেতরে ঈশ্বর দেখেছিলাম। বেলার হাসিতে ঈশ্বর দেখেছি। কণ্ঠস্বর, ভ্রূভঙ্গী, বেণীর কাঁধ টপকে বুকে পড়ে থাকার ভেতরে যে রূপ তাতে ঈশ্বরের চিহ্ন পাই। ঈশ্বর এমন একটা জিনিস—যা কিনা ধরা যায় না—কিন্তু টের পাওয়া যায়।

এখন বেলা বারোটাও বাজেনি। কলকাতাকে টেনে লম্বা করে তার গায়ে গাছ-গাছালির ভেতর, পুকুর, জংলা জায়গার ভেতর এই শহরতলি। এখানে স্ট্রিট লাইটের নিচে রাতের পাহারাদার সিগারেট ধরায়। টেলিফোনের তার নারকেল গাছের পাতা লেগে দোলে। সুপুরি গাছগুলি বাতাস দিয়ে দুলে দুলে চান করে। যেন বাতাস মাথায় ঢেলে চান করছে। তার শব্দ পাওয়া যায়।

কি খেয়াল হতে মানিকলাল ডায়াল করল চেনা নম্বরে। ওপাশ থেকে মহিলার গলা।

ইরা আছে? মানিকলাল বলছি—

এবার ইরার গলা। কে?

আমি মানিকলাল।

ওঃ! ফোন কর কেন? আমার কিছু মনে নেই। সেসব স্মৃতি কিছুই মনে নেই।

ফোন করলাম—যদি কোন কাজে দরকার হয়—

না। আমার কোন দরকার নেই। তুমি এখন বউ, ছেলে—ছেলের বউ নিয়ে আছ। আমি কি এখন তাদের সব এণ্টারটেন করব?

কী হিংস্র গলার স্বর। কি হিংস্র ঠাট্টা। কানে বিঁধে গিয়ে কাঁপতে থাকে। ফোন রেখে দিতেও কষ্ট হচ্ছিল মানিকলালের। তবু বলল, এসব বলছ কেন?

আমি এখন ব্যস্ত। দেখা করে কি হবে? দেখা করে কি লাভ!—এই পর্যন্ত বলে ইরার গলার স্বর মোলায়েম হল। এবার সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি তো সঞ্চয়িতার এজেন্ট ছিলে? তাই না?

আমি? সঞ্চয়িতা? ওসব তো আমি কোনদিন করিনি। আমি কোন্ দুঃখে সঞ্চয়িতার এজেন্ট হতে যাব?

কাগজে নাম দেখেছিলাম যেন।

আমার নাম? সে তাহলে অন্য কোন মানিকলাল মিত্র।

আমার মোটা টাকা সঞ্চয়িতায় আটকে আছে।

আমি তার কি করব ?

আমার এই সময় যদি আদায় করে দিতে পারতে। এই একটা কাজ ছিল আমার—

আমি ওসব বুঝি না।—বলে ফোন নামিয়ে রাখল মানিকলাল। তারপর নিজেকেই মনে মনে দু'বার বলল, এর নাম ভালবাসা! এর নাম ভালবাসা!! এই ইরার গলাতেই দু'কলি রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার এত ভাল লেগেছিল।

দোকানে আজকাল ব্লেড আর সিগারেট ছাড়া কিছুই কেনা হয় না মানিকলালের। ছেলেরা ছোট থাকতে ওদের জন্যে জুতোর ফিতে, পেন্সিল, বল, হাফপ্যাণ্ট, মোজা, শার্টের কাপড়, জাম্পার - কত কি ভাজা। বড়র পছন্দ মাংস।

এখন তার কিছুই কেনা হয় না। স্রেফ দাড়ি কামানো ব্লেড। তাও অনেক সময় পেস্ট কিনতে গিয়ে ফ্রি পাওয়া যায়। তাই আর কেনা হয় না মানিকলালের। আর কেনে সিগারেট।

সিগারেট কিনতে গিয়ে দুপুর দুপুর স্টেশনারী দোকানে সাজানো অনেক জিনিস দেখতে পেলে মানিকলাল। দোকানী ছেলেটি জানতে চাইল, আপনি কিসের আর্টিস্ট বাবু ?

আমি ? আমি আবার কিসের আর্টিস্ট !

একজন খদ্দের সেদিন আপনাকে দেখিয়ে বলছিল—আপনি তখন এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন—আপনাকে মাঝে মাঝে টি ভি-তে দেখা যায়।

ও হোঃ! বুঝেছি। এই তবলা বাজাই—আচ্ছা ওই সেণ্টটার দাম কত। ওই যে মুন ড্রপ—

ছাব্বিশ পঞ্চাশ। আপনাকে পঁচিশ টাকায় দিয়ে দেব। আমার কেনা দাম। আপনি একজন আর্টিস্ট।

তোমার লস হবে না তো ?

লস কেন হবে! আমরা তো হোলসেল কিনি। ডজন দরে। নিন্- গন্ধটা কেমন ?

রজনীগন্ধার। আমি নিজেও এটাই মাখি—বলে সেণ্টটা একটা ঠোঙায় পুরে দিয়ে দিল।

সেটা বাড়ি এসে বেলার হাতে দিয়ে মানিকলাল বলল, খুলে দ্যাখ। তোমার পছন্দের জিনিস—

কি ? আমসত্ত্ব ?

ক'দিন আগে একটা আমসত্ত্বর প্যাকেট আনায় সেটার পরত তুলে বেলা মানিকলালকে দিয়েছিল। নিজে খেয়েছিল। মানিকলাল বলল, খুলেই ছাখ না—

ঠোঙা খুলে মুন ড্রপটা হাতে নিয়ে হাসল বেলা। কোনদিন তো আনতে দেখিনি!

কারও বাড়ি বেড়াতে গিয়ে হাতে মিষ্টির পাকেট নিয়ে যাওয়া অভ্যেসে নেই। সেণ্টও কোনদিন কেনার অভ্যেস নেই আমার—

তবে যে কিনলে বড়!

দেখলাম দোকানে—তাই নিয়ে এলাম তোমার জন্যে। রজনীগন্ধার গন্ধ তোমার ভাল লাগে জানি।

ভাল!—বলে নাকে গন্ধটা নিল বেলা। নিয়ে বলল, বড় চেনা গন্ধ লাগছে!

কি রকম?

এই গন্ধটাই সেদিন তোমার গায়ে পেয়েছিলাম—সুপ্রভাতের গাড়ি এসে তোমায় যখন ভোরবেলা পৌঁছে দিয়ে গেল। চোখ খুলতে পারছিলে না তুমি—

ওঃ! পরিতোষবাবুদের পার্টি থেকে তো। একদম ব্ল্যাক আউট হয়ে গিয়েছিল। কিছু মনে নেই আমার।

শার্টের বোতাম খোলা। সারা গায়ে এই গন্ধটাই—

আমি তো কোনদিন সেণ্ট মাখি না। কি করে পাবে ও গন্ধ?

তার আমি কি জানি! তোমার বুকে লিপস্টিকেরও দাগ ছিল—আমি সিঁড়ি থেকে হাত ধরে তোমায় এনে শুইয়ে দিলাম। শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে বললে নবনীতা—আগরতলা—আমিই কুন্তি—

ওঃ! এও সেই অবতার মহিলার চিঠি—নীলিমা দেবী! ওরফে বেলারানী ঘোষাল!

হেসে চাবুক মারার ভঙ্গিতে বেলা বলল, এটাও নিশ্চয় বলবে—পাঠকের মতামতে আসা চিঠি পড়তে গিয়ে—কথা শেষ করল না বেলা। বেগে ভেতরের ঘরে চলে গেল। বোধহয় কান্না এসে গিয়েছিল বেলার গলায়—

মানিকলাল বলতে যাচ্ছিল, বিশ্বাস কর বেলা। আমার কিছু মনে নেই। লিপস্টিকের দাগ কোত্থেকে এল আমি কিছুই জানি না। আমি একদম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ভোররাতে ঘুম থেকে উঠে দেখি পরিতোষবাবুদের এমব্যাসি আপার্টমেণ্ট একদম ফাঁকা। এটা নবনীতাদের হইহুল্লোড়-আড্ডা মারার জন্যে মাঝে মধ্যে খোলা হয় মাত্র। তাই তো বলল ড্রাইভার। ঘুম ভাঙলে আমায় পৌঁছে দেবার জন্যে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি এর বাইরে বিন্দুবিসর্গ কিছু জানি না। ভীষণ মাথা ধরেছিল। দেখলে না—বাড়ি ফিরে ঘণ্টা তিনেক ঘুমোলাম।

এর একটা কথাও বলা হল না মানিকলালের। সে ঘরের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে শুধু এইটুকু মনে করতে পারল—ইলেকট্রনিক্সের দোকান থেকে কিনে আনা টু-ইন-ওয়ানের মোড়ক খুললে—ধাক্কা যাতে না লাগে এমন কিছু থার্মোকোলের খোসা নতুন যন্ত্রটার চারদিক থেকে ফেলে দিয়ে তবে ওটা বের করতে হয়। থার্মোকোলের সুন্দর দেখতে খোসাগুলো বেশ নরম। রঙিন। কিন্তু কোনও কাজে আসে না। শেষ অব্দি ফেলে দিতে হয়। প্রেম না থাকলে—ভালবাসা চলে গেলে মেয়েলোকও তাই। বিশেষ করে সন্দেহ এসে যদি তার ভেতর বাসা বাঁধে।

এখন এই দুপুরবেলায় ঘোর সংসারের ভেতর দাঁড়িয়ে মানিকলাল মিত্র বুঝল—সে এক অদ্ভুত শুকনো ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চারদিক ঘিরে একটা বেশ সংসার খেলা চলছে। থালাবাটি, উনুন, বউ, বাটি—সবই আছে। আবার কিছু নেইও। আমি ভালবেসেই মুন ড্রপটা এনেছিলাম। আগে কোনদিন আনিনি তার কারণ, আনতে যে হয় এটাই জানতাম না। এর আগে মাথায় আসেওনি কোনদিন। আমার সাতান্ন। এখন আমি কোথা কি করতে পারি! আমার চেয়ে কম বয়সীরাও দিব্যি কেমন ড্যাং ড্যাং করে চলে যাচ্ছে। আর বড়জোর সাত আট বছরের ছুটোপাটি বাকি আছে। পঁয়ষট্টিতে গেলে তার জন্যে কেউ কেঁদে ভাসায় না।

এগারো

বুকের বাঁ দিকে যেখানটায় হার্ট থাকে—সেখানে হাত দিয়ে মানিকলাল পরিষ্কার টের পেল—তার আঙুলের ছোঁয়া পেয়ে মাংসের নিচে একটা ছোট মার্বেল সরে গেল। আর সরে গিয়ে মার্বেলটা জটপাকানো একটা শিরায় গিয়ে আটকে যাচ্ছে। শিরার জটটা অনেকটা আণ্ডারওয়্যারের গিট লেগে যাওয়া দড়ির মতই।

এটা কবে হল? কিছুই তো টের পাইনি আগে? তাই আজকাল নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে লাগে। নিচু হয়ে কিছু তুলতে গেলে বুকের বাঁ দিকে কট করে ওঠে। মনে তার মেঘ করে উঠল। তাহলে অপরেশন করাতে হবে। নিশ্চয় বড় অপারেশন।

ঠিক ওইসময় ঘুম ভেঙে গেল মানিকলালের। পাখা বন্ধ। কারেন্ট চলে গেছে। ঘামে বুক ভিজে গেছে। বুকের বাঁ দিকে হাত দিয়ে দেখল। নাঃ! কোন মার্বেল তো আঙুলের ছোঁয়া পেয়ে সরে যাচ্ছে না। এমন কি জড়িয়ে যাওয়া শিরার কোন জটও আঙুলের ডগায় ঠেকছে না। তাহলে অপারেশন করতে হচ্ছে না।

সবটাই স্বপ্ন? সারা রাত ঘুমিয়েও অলুক্ষণে স্বপ্নটার ক্লান্তি তার সারা চোখে।

পটাং করে লাফ দিয়ে উঠল মানিকলাল। বেশ সকাল হয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, একটা পাখি অনেক দূরদেশ থেকে এসেছে—লালঝুঁটি—নাম জানে না মানিকলাল—ছাই ছাই লেজ দিব্যি কোত্থেকে খবর পেয়ে তার বাড়ির বাগানে একটা পেঁপে গাছে এসে বসেছে। বসে রীতিমত পর্বত অভিযাত্রীর স্টাইলে মাথা ওপর দিক করে সবেধন গাছপাকা পেঁপেটি ঠোকরাচ্ছে। আকাশে মেঘ। বাগানের ঘাসে শিশির তখনও সবটা শুকোয়নি। মনটা খুশি খুশি লাগল।

অন্যদিন মানিকলাল আগে ওঠে। আজ তার উঠতে দেরি হয়ে গেছে। বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা করছিল। চা বেলার হাতে খুব খোলে। সুগন্ধী। হাল্কা। মুখে দিয়ে চা পাতার একটা সুস্বাদু কষঃ-সামান্য তেতো—তাতে চিনি চিনি—এরপর সিগারেট ধরাতে ভাল লাগে মানিকলালের।

আজও ধরাল মানিকলাল। ধরিয়ে অনেকদিন পর আলিগড়ি পাজামার ওপর পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পায়ে বাটার জলসা গলিয়ে।

বারান্দা থেকে বেলা জানতে চাইল, কখন ফিরবে?

কাছাকাছি যাচ্ছি। দুপুরেই ফিরব।

ঠিক কোথায় যাচ্ছে তা জানে না মানিকলাল। সবার বেশ একটা প্রোগ্রাম আছে। কেউ কেরোসিন ধরবে। কেউ রেশন তুলবে। তার সমসাময়িক লেখকরা এখন পুজো সংখ্যার লেখা শেষ করে এনেছে। তাদের লেখা নিয়ে বিজ্ঞাপনও বেরচ্ছে বড বড। তাতে বলা হচ্ছে এইসব লেখক মনীষী, সাধক ঋদ্ধ। যে লেখা বেরবে তা- অসমান্য। অথচ কিছু না লিখে এই সকালে বেরিয়ে পড়ছে মানিকলাল।

তার লিখতে ইচ্ছে করে না। বউ সন্দেহ করে। ভালবাসলে বোঝে না। আউট অব প্রিণ্ট উপন্যাস ফিরে কেউ ছাপতে আসে না। প্রবন্ধে তাকে বলা হয় লেখক। অফিস শোকসভার চেহারা পেয়েছে। যেদিন যেমন নিউজপ্রিণ্ট যোগাড় হয় সেদিন ততটাই ছাপা হয় সুপ্রভাত। তাও বোধহয় সব ঠিকঠাক বিলি হয় না।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে আশেপাশের সমবয়সী মানুষজনের মুখ-চোখ দেখে। যে লোকটাকে তার সাতান্ন মনে হয়—তার ভাঙা গাল, পাকা চুল, চোখের নিচে কালি, হাঁটাচলায় নুয়ে পড়া লক্ষ্য করে—তার ভাবনা হয় - দাঁত বাঁধাইনি, খেতে ভাল লাগে, দৌড়তে পারি টেনে চড় কষালে যে কোন লোকের গাল ফেটে যাবে, পেচ্ছাব এখনও পাঁচ ফুট দূরে গিয়ে পড়ে—তাহলে আমি কবে বুড়ো হব? তাহলে কি একদিন সকালে উঠে দেখব, হঠাৎ কালরাত থেকে বুড়ো হয়ে গেছি। সেই সময়টা কবে? পঁয়ষট্টিতে? না একাত্তরে?

মাঝে মানিকলালকে জন্মাষ্টমীর দিন পাড়ায় চাঁদা দিতে হয়েছে পনের টাকা।

আশপাশের বাড়ির রিটায়ার্ড মানুষরা সবাই মিলে খিচুড়ি পিকনিক করল সেদিন। বাসমতি চালের খিচুড়ি। সঙ্গে ঝর্ণা ঘি। পটলের ডালনা। পাঁপর। আনারসের চাটনি। আর একটা করে কাঁচাগোল্লা। বয়স্ক গেরস্থ হিসেবে তারও নেমন্তন্ন হয়। সে ধুতি পাঞ্জাবি পরে গিয়েছিল। অনেকেই কিন্তু ফতুয়া। কেউ দেড়হাতার বেশি খিচুড়ি নিল না। ডালনা থেকে আলু বাদ দিয়ে পটল নিল কেউ কেউ। কাঁচাগোল্লা বিষবৎ এড়াল প্রায় সবাই।

আর কথাবার্তা, রসিকতা—সবই রিটায়ার্ড। তাদের চেয়ে মানিকলাল এমন কিছু ছোট নয়। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল—সে তার বাবাদের ব্যাচে খেতে বসেছে। কেউই তার চেয়ে সাত-আট বছরের বেশি বড় নয়।

কড়া নেড়ে মানিকলাল দরজা ফাঁক হতেই বলতে যাবে—এটা কি···?

জয়শ্রী হেসে বলল, হ্যাঁ। ঠিক বাড়িতেই এসেছেন। আসুন। আমি ভাবতেই পারিনি—

পুরনো ধরনের বাড়ি। কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। বোধহয় মোটা দেওয়াল। তবে আলাদা একটা বাড়ি। কোন ফ্ল্যাট নয়। চেয়ারে বসতে বসতে বলল, ও ছবি তোমার মায়ের?

হ্যাঁ একটা বিয়েবাড়ির গ্রুপ ফটো থেকে আলাদা করে প্রিণ্ট করতে হয়েছে। মায়ের শেষ দিককার কোন ছবি তো তোলেননি বাবা।

শেষ কত কাছে তা তো কেউ বুঝতে পারে না। তাই তোলা হয়নি। তোর বাবা কোথায়?

বাবা! মোহনবাগানের ভোট ক্যানভাস করতে বেরিয়েছেন। এসে যাবেন।

দাদা?

কোচিংয়ে গেছে। আজ যেন ব্যাঙ্কে কিসের ছুটি আছে।

কিসের কোচিং?

বি কম দেবে। আমি রান্না করছিলাম—এমন সময় দরজায় আপনি কড়া নাড়লেন। আমি ভাবতেই পারিনি। আশা করেছিলাম—বড়সড় একটা চিঠি পাব।

মানিকলাল জয়শ্রীকে দেখল। বাসন্তী রঙের শাড়ি। লাল পাড়। গায়ে লাল ব্লাউজ। মাথার চুল ছাড়া—ঢেউতোলা বুক কোমরে এসে সরু হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই নেলপালিশ লাগানো পায়ের নখ। শাড়ির পাড়ের বাইরে। শাদা মেঝের ওপর পা দেখা গেল না। জয়শ্রী পা ঢেকে ফেলল।

মানিকলাল বলল, আমি চিঠি লিখি না—

জানি!

কি করে জানলে?

ইরাকে চিঠি লেখার পর আর কাউকে লেখেন না।

সে তো তোমার জন্মের আগের ব্যাপার। তোমার তো কিছুতেই জানার কথা নয়।

ভুলে যাচ্ছেন কেন—আমি তো আপনার ইন্টারভিউ পড়তে পারি।

ওঃ! ওসব বাজে লেখাও পড়েছ?

আমি আপনার সব পড়ি—খুঁজে পেতে যোগাড় করে পড়ি।—বলতে বলতে টেবিল থেকে উড়ে যাওয়া একখানা খাম জয়শ্রী খাটের নিচে থেকে কুড়তে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মানিকলাল তার চেয়ারটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে জয়শ্রীকে জায়গা করে দিতে গেল।

জয়শ্রী নুয়ে পড়ে খামখানা কুড়তে কুড়তে বলল, আপনাকে সরতে হবে না।

মানিকলাল দেখল, জয়শ্রীর কোমর থেকে শাড়ি ঢাকা উরু অব্দি আরেকটা ঢেউ সুন্দরভাবে নেমে এসেছে। রীতিমত চোখের আনন্দ—আরাম। আঁচল একটুখানি সরে যেতেই বন্দী দুই মেঘ মেঝের দিকে বিজ্ঞানের নিয়মে বুক থেকে তীক্ষ্ণ হল। তাদের মাঝখানে টিপ বোতামের অভাবে সেফটিপিন।

খামখানা কুড়িয়েই নিমেষে সটান উঠে দাঁড়াল জয়শ্রী। মুখে হাসি।' কিছু বলবেন?

নাঃ!—বলেও মানিকলাল না বলে পারল না, দিব্যি এক সেকেণ্ডে উঠে দাঁড়ালে তো!

সে জন্যে ফিগার তৈরি করতে হয়!—বলতে বলতে একটা বিজয়িনী আভা ফুটে উঠল জয়শ্রীর মুখে।

সেজন্যে অনেকে মারা পড়ে!

খুব খুশি হয়ে জয়শ্রী বলল, আমি সিংহ। খিদে না পেলে খাই না।

অবাক হল মানিকলাল। এ যে একদম পুরোদস্তুর নারীর মত কথা বলছে। এতটাই পাকা মেহগনি? সে খেলাচ্ছলে জানতে চাইল, কি কর?

আপাতত মেরে রাখি। দরকার হলে পরে খাই!

বেশ মজা পাচ্ছিল মানিকলাল। মানুষ জীবনের ভেতরকার গুহা থেকে জয়শ্রী খনিজ পদার্থ টেনে বের করছিল। যাকে বলে এলিমেন্টাল। ক'জন এভাবে—বিশেষ করে এই বয়সে এমন করে কথা বলে। সে রীতিমত অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটির মুখে। আজই ভোরবেলায় একটা ভিনদেশী পাখি এসেছিল গাছপাকা পেঁপে খেতে।

আপনার জন্যে চা করি।

করবে—কিন্তু চিনি দেবে না।

কেন?

বছর দুই হল ছেড়ে দিয়েছি। লিকার কম। দুধ কম।

আমায় অপমান করবেন না। মা মারা যেতে আজ আটন'বছর আমি দু'জন পুরুষ মানুষকে লালন পালন করেছি!

তারা তোমার দাদা আর বাবা। তাদের ধাত তুমি জান। আমাকে তো তুমি চেন না।

ওদের চেয়ে বেশি চিনি। কবে থেকে আপনার লেখা পড়ে আসছি।

লেখা আর চা এক জিনিস নয় জয়শ্রী।

জয়শ্রী চা করতে ভেতরের ঘরে চলে গেল। কাঠের তাকে আয়না। পাশে, তিন রকমের চিরুনী। কোথায় এক ডাকবাংলোর বারন্দায় একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক শীতের সকালে র‍্যাপার গায়ে চা খাচ্ছেন। নিশ্চয় জয়শ্রীর বাবা। বেশ পুরনো ফটো। সুন্দর ঢাকনা দেওয়া পোর্টেবল টি ভি। তার পাশেই টেবিলে খোলা খাতা খোলা কলম। ঝুঁকে দেখল মানিকলাল। গোল গোল হরফে মেয়েলী হাতের লেখা। নিশ্চয়ই জয়শ্রী লিখছিল। দরজায় কড়া নাড়ায় উঠে এসেছে। কলম বা খাতা আর বন্ধ করা হয়নি। হয়ত চিঠি লিখছিল কাউকে। এ তো জয়শ্রীরই হাতের লেখা। তার চেনা।

খাতাখানা হাতে নিল মানিকলাল। পড়তে পড়তে মনে হল—এ তো চিঠি নয়। এ যে গল্পের মত। জয়শ্রী গল্প লিখছে নাকি? শুরুটা গল্পেরই মত—

কলকাতার গায়ে সবচেয়ে আগে সকাল আসে রথতলায়।

এখানে থামল মানিকলাল। শহরতলিতে সে তো রথতলাতেই থাকে।

ছুতোর, চাষী, গেরস্থ, মাদার ডেয়ারির চিত্র আর ঠিকে ঝিরা রোদে চাঙ্গা চওড়া সোজা রাস্তা ধরে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়েছে। ভাদ্র মাসের কাঁচা সকালে রোদে যেমন আলো তেমনি ঝাঁঝ। সারাটা পাড়ায় এখন ঠাকুরঘরের বারান্দা মার্কা সকাল।

ঠিক এই সকাল চিরে সুতনুকা বেশ ব্যস্তসমস্ত হয়েই রথতলার রাস্তা ধরে আসছিল। তার শাড়ির পাড়ে হাঁটুরে ধুলো। পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি হাইট, মাপের শরীর। সুতনুকা রাস্তায় বেরলেই বুঝতে পারে সে অন্যের কাছে দেখার জিনিস। কাঁধ থেকে কোমর যেন নাভির কাছে এসে বসানো সরু হয়ে আসা কোন ছুরি। চলতি কিছু কিছু খুঁত বাদ দিয়ে সুতনুকা মোটামুটি সুতনুকাই। তার নামটা যেন তাকে দেখেই ডিকসনারিতে দেওয়া। নানা সমস্যায় জেরবার বুড়ো পৃথিবী এর চেয়ে বেশি সৌন্দর্য বইতে আর নারাজ।

[নিজের রূপের কথা যতটা সম্ভব অবহেলার ভরে বলা—অথচ খাঁজে খাঁজে ভাঁজের মতই ভাষা আর শব্দ রীতিমত মানানসই! নিজেকে একথা বুঝিয়ে আবার পড়তে লাগল মানিকলাল।]

ভোর ছ'টার ভেতর সংসারে দরকারের গর্তে কাজ ঢেলে বেরিয়ে রথতলার কাছাকাছি এসে বটতলায় একটা গমকলের সামনে দাঁড়িয়ে সুতনুকার মনে হল

একটা ছ'টাকা দামের রসগোল্লা তার বুকের ভেতর আটকে গেছে। এত তাড়াহুড়ো করেও নবীনবরণ সরকারের সঙ্গে তার দেখা হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। লোকটা লেখক। আসলে দেখা হওয়া, প্রেডিক্ট করা পাস করা—এসব ব্যাপারে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কমপিউটারের কাজ করে। আজ সে মেশিন ঠিক মত উত্তর দিতে পারছিল না। নবীনবরণ বাংলা সাহিত্যে অচেনা লোক নন—তবে তাঁর পাঠক সংখ্যা বরাবরই কম। তিনি বিশেষ একটি ধারার লেখক—তাঁর লেখার রসটি চটচটে আঠালোভাবে লেখার গায়ে এমনভাবে এঁটে থাকে যে অধিকাংশ পাঠক তা ছাড়তে না পেরে বিভক্ত হয়।

[আমার লেখার এমন আলোচনা কোনদিন পড়িনি। জয়শ্রীর চা নিয়ে এ ঘরে ফিরে আসার আগে পড়ে ফেলা দরকার। কিন্তু কিছুতেই বাদ দিয়ে পড়তে পারছে না মানিকলাল]

তের বছর বয়সে সুতনুকা প্রথম নবীনবরণের লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়। পনের বছর বয়সে মুগ্ধতা প্রেমে পাল্টাল। আর নানা স্বপ্নে নবীনবরণ ম্যাগাজিনে ছাপা তার হাফবাস্ট ছবি হয়ে হাজির হলেন। প্রোজ্জ্বলন্ত যৌবনে পোকার মত অগুনতি প্রেমিকার ভিড়ে নবীনবরণ কোনদিন হারিয়ে যাননি।

[পৃথিবীটা বড় কঠিন জায়গা জয়শ্রী। তুমি ছেলেমানুষ। তুমি জান না। আমার যৌবনের কথা তুমি জানবে কোত্থেকে? তখন তো তুমি পৃথিবীতেই আসনি। লেখক কেমন হয় তুমি জান না। সে আদৌ স্বপ্নের কোন জিনিস নয়। বরং বেশি বেশি করে মাটির জিনিস। অল্পবয়সে তোমার মা মারা গেছেন তোমাকে তাঁর ধরিয়ে দেওয়া বইয়ের লেখক বলেই—আমি তোমার কাছে এত বড় হয়ে উঠেছি। আসলে আমি খুবই অর্ডিনারি। তোমার মায়ের স্মৃতি আমাকে তোমার মনে টেনে বড় করে দিচ্ছে। যৌবন আমার কোনদিন হয়ত প্রোজ্জ্বলন্ত ছিল। কিন্তু প্রেমিকার ভিড় খুব একটা হয়নি কোনদিন। বরং আমিই কোথাও ভিড় করে গিয়ে ফিরে এসেছি।

খ্যাতিমান এই লেখকটির সঙ্গে সুতনুকার প্রথম দেখা হয় সাহিত্য পাঠের একটি অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের শেষে স্বপ্নের লেখক যখন সুন্দরী, বর্ষীয়সী স্ত্রীকে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে গেলেন তখন তার বুক ভেঙে গেল। সে কী যন্ত্রণা বাবাঃ! পুরুষমানুষ পাশে সুন্দরী বউ পেলে, স্টিভ ম্যাকুইনের মত চওড়া কাঁধ হলে, কাজকরা বুকখোলা খয়েরি পাঞ্জাবি গায়ে দিলে এমন দর্পিত অহঙ্কারী হয়ে উঠতে পারে—সুতনুকার আগে জানা ছিল না। দাদার হাত ধরে সুতনুকা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

[তখন আমাদের ডেকে কথা বললে না কেন জয়শ্রী? তাহলেই তোমায় অল্পবয়সের এইসব ভুল ভেঙে যেত। অবশ্য এইসব ভুলই তো আনন্দ।]

আজ চামড়া পোড়ানো রোদে রথতলায় খুঁজতে খুঁজতে পুরনো দিনের সব

কথাই মনে পড়ছিল। স্মৃতি কি কখনও ছাপার অক্ষর হতে পারে? ট্যাক্সির নম্বর ছিল WBT 3935! লেখকের স্ত্রীর গলায় একটা পাথরের বল চেন হার ছিল।

বাস স্টপ থেকে ভেতরে যেতে রিকশ নিল এক টাকা। মিষ্টির দোকানদার একগাল হেসে জানাল, নবীনবরণবাবু—তো? —রথতলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার—?

ছবি বাঁধাইয়ের এক দোকানী বলল, তিনি কি এদিকে থাকেন?

বিরক্ত সুতনুকা এগিয়ে গেল।

তখন এক বাড়ির ভেতর থেকে গোলগাল কালো চশমা চোখে পুতুল টাইপের এক ছোকরা মেয়েলী গলায় সুর তুলল, ওমা! উনি কি আর এখানে থাকবেন!

এগিয়ে সিগারেট, চকোলেট, পানপরাগের ধারাল অনুসন্ধিৎসু সাতাশ আঠাশ বছরের ছেলেটি সিগারেটের প্যাকেট গোছাতে গোছাতে আনমনা সেজে জানতে চাইল, আপনি কি কোন পত্রিকা থেকে আসছেন? ওঁর সঙ্গে কি সম্পর্ক?

কখনও রহস্যময় হেসে, কখনও ঠোঁট কামড়ে, কখনও গালে টোল ফেলে প্রশ্নের তীর গা থেকে খুলে ফেলে সুতনুকা জানতে পারল -নবীনবাবুর বাড়ি সেখান থেকে আরও দশ মিনিটের রাস্তা—একটু ঘোরানো প্যাঁচানো—দু'ধারে পুকুর পড়বে।

[পড়তে পড়তে মানিকলালের মনে হচ্ছিল—বিভূতিভূষণের লেখা আগেকার কোন গল্পের ভাব আসছে]

তনু রাস্তা ভুল করে দাশনগরের মাঠের কাছে এসে পড়ল। তখন যে রাস্তা ধরেই এগোয় তার দু'ধারে পুকুর। কলকাতা—অথচ যেন কলকাতাই নয়।

শেষে রাস্তার ডাইনে বাঁয়ের মোড়গুলোর ম্যাপ এঁকে—দেঁতো হাসি দিয়ে ভাই দাদা ডেকে এক যুবক আরেক মাঝবয়সীকে নিয়ে নবীনবরণবাবুর অগোছাল বাগানওলা বাড়ির গেটে এসে যখন দাঁড়াল—হাতঘড়িতে তখন পৌনে ন'টা—তনুর শাদা শাড়িতে এক পরত ধুলো, ঠোঁটের ফিকে লিপস্টিক শুষে উঠে গেছে। আর কপালের দু'ধারে লালচে পাতলা চুল উড়ছে, হস্টেল ক্লিপ বেঁকে নেমে গেছে।

[এ জায়গাটা একদম লেখকদের মতই তো লেখা]

গ্রীলের গেটে তালা খুলে নবীনবরণ সস্ত্রীক তাকে অভ্যর্থনা করলে তনু বড্ড লজ্জায় পড়ল। নবীনবরণের বাছাই ছোটগল্পের বইখানা হাত থেকে ধপ করে মাটিতে পড়ল। নবীনবরণ এগিয়ে এসে বই আর তনুর হাত একসঙ্গে ধরলেন। তনুর সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল—যৌন কামনায় নয়—সক্ষম পুরুষের

স্পর্শেও নয়—শুধু স্বপ্নে দেখা হাফবাস্ট ছবিখানা পুরো শরীর নিয়ে ভারী হাতে তাকে আশ্রয় দিল বলে।

খোলামেলা বারান্দায় বয়ঃসন্ধির চাকর মাধব ডিম, টোস্ট, সিঙ্গাড়া আনলে তনু বলতে পারল না ডিম খেলে অ্যালার্জি হয়,– সিঙ্গাড়া গোপনে চর্বি বাড়ায়। বীভৎস স্বাদের কালো ধোঁয়া ওঠা চা নিয়ে মাধব মায়ের গলায় বলল, টোস্টটা খেয়ে নাও—অনেক রাস্তা ঘুরে এসেছ—খিদে পেয়েছে।

একথা শুনে তনুর চোখ জ্বালা জ্বালা করে উঠল। নবীনবরণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে জলের গ্লাস এগিয়ে দিতে গিয়ে বেতের টেবিল উল্টোলেন—বইটা নিতে পেন ফেললেন।

লেখকের স্ত্রী ঘুরে ঘুরে কখনও পারিবারিক অ্যালবাম, কখনও ছেলেদের প্রাইজ অথবা নবীনের পুরনো লেখার কপি দেখাচ্ছিলেন। শেষে ঘরের ভেতর উঠে গেলেন কোন ধরতে।

এদিক সেদিক কথার পর দু'জনেই চুপচাপ বসে রইল। অল্প হাওয়ায় বাগানের জবা গাছ দুলে উঠছিল। বগেনভেলিয়া তার দু'একটা কাগুজে ফুল ছড়াচ্ছিল বারান্দায়। তনু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রূপবান, বয়স্ক অথচ সমর্থ পুরুষ-মানুষটিকে দেখে চোখের আরাম করছিল। দীর্ঘ, মায়াময় ফোলা ফোলা চোখ, ভারী গাল, চওড়া বুক আর কোমর। সারা শরীরে কাজ শেষ করে গুছিয়ে বসার চিহ্ন।

[শেষ লাইনটা পাকা লেখকের দৃষ্টিতে লেখা মনে হল মানিকলালের।]

নবীন ভাবছিলেন – মেয়ের বয়সী এই মেয়েটি তেমন আহামরি কিছু নয়। কিন্তু কথায়, হাসিতে, চোখের ভঙ্গিমায়, ওঠা বসায় নিজের অজ্ঞাতেই পুরুষ-মানুষকে বেঁধে রাখে।

ঠিক এমন সময়! ঠিক এমন সময় কেমন একটা আনারসের ফালির মত রোদ বারান্দায়—তনুর মুখের একদিক আলো করল। দমকা হাওয়া শাড়ির আঁচল সরিয়ে শরীরের ভাঁজ দেখিয়ে দিল।

নবীন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন – এই চোখ, এই ভ্রূভঙ্গি, লালচে ঠোঁটের হাসি তিনি যেন আগে কোথায় দেখেছেন। খাজুরাহোতে? পাথর প্রতিমায়? আরও আগে প্রতাপসিংহের গড়ে? কোশলে? বহুজন্মের কথা – কিন্তু এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে না।

[জয়শ্রী তুমিও শেষে পুরুষ লেখকদের ভাষায় এই বর্ণনাটা দিলে! তোমার নিজের ভাষা কোথায়? একজন মেয়ে লেখিকার ভাষা তো অন্যরকমই হওয়া উচিত ছিল। তাই না?]

তনুর গোটা বুক জুড়ে চারিয়ে যাচ্ছিল বেদনা আর আনন্দ। হেলে বসে পাগল হওয়া গলায় নবীন বললেন, তনু তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখব?

নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে পিঠ রাখল তনু। তাহলে ঠিকই চিনেছেন। চেনা কথাখানায় বুকের দম আটকানো ভাবটা হাল্কা হল। বারান্দায় রোদ তখন আরও তেরছা হয়ে পড়েছে।

খাতা কলম যেমন ছিল তেমনই রেখে দিতে গেল মানিকলাল। জয়শ্রী হয়ত কোনদিন লিখবে। কিছু ঘটেছে—কিছু ঘটেনি—তার সঙ্গে স্মৃতি, কল্পনা আর পড়া বইয়ের ভাষার মিশেল দিয়ে প্রায় দাঁড় করিয়ে এনেছে একটা গল্প—যাতে বুক ভার করা বেদনার সঙ্গে আনন্দও মিশে থাকে। পড়ে পড়ে লোকে বলে—শিল্প।

দেখুন তো ঠিক হল কি না? এমন ডিরেকশন দিলেন—আমার তো চা করতে গিয়ে হাত কাঁপছিল।—বলতে বলতে জয়শ্রী পিরিচ সমেত পেয়ালা ভর্তি চা সাবধানে রাখল টেবিলে। রেখেই খোলা খাতাখানা বন্ধ করতে করতে বলল, দেখেননি তো—?

কোনটা?

আমার লেখা—

কোথায়? না তো—বলে চায়ে এক চুমুক দিল মানিকলাল। চমৎকার! ভারি সুন্দর চা হয়েছে। বেলাও খুব সুন্দর চা করে।

আমারটা বাড়িয়ে বলছেন। মোটেই বউদির মত হয়নি।

তোমারটা একরকম। বেলারটা আরেকরকম।—বলতে বলতে মানিকলালের মনে পড়ল—একটু আগে চোখ বুলানোর মত করে পড়া জয়শ্রীর খোলা খাতাখানা। যা কি না এখন জয়শ্রী বন্ধ করে তুলে রাখছে তাকে। ওখানে বেশ কয়েকবার সমর্থ কথাটা লিখেছে জয়শ্রী। একথাটা লিখতে লেখকদের বুক কেঁপে যায়। অথচ কী স্বচ্ছন্দেই না জয়শ্রী লিখেছে। বিদেশী উপন্যাসে খুব সরলভাবেই লেখা হয়—কেপেবল্। একসময় বৈষ্ণব পদাবলীতেও মানিকলাল এই সমর্থ কথাটি পেয়েছিল। কথাটা—যতদূর মনে পড়ছে,—এরকম ছিল—শ্রীরাধিকার সমর্থ রতি। কোন এক পূর্বরাগের ন্যারেশনে। প্রায় কিশোরী বয়সে মা মরে যাওয়ার পর এই ক'বছরে বড় হওয়ার সময়টায় বাড়িতে আর কোন মহিলা না থাকায় জয়শ্রী বাজারচলতি লজ্জা পাওয়ার শিক্ষাই পায়নি।

আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তার চেয়েও অনেক তাড়াতাড়িতে এসব কথা মানিকলালের মাথার ভেতর দিয়ে খেলে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল—তারদিকে পেছন ফিরে জয়শ্রী তার খাতাখানা তাকে রাখছে। সে তখন তার নিজের মাথাটা গলাসুদ্ধ পাইপের মত বাঁকিয়ে জয়শ্রীর মুখখানা ছুঁতে চাইল।

ভয় ছিল। লজ্জাও ছিল মানিকলালের। ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে?

জয়শ্রী সাবধানে খাতাখানা তাকে রেখে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর দু'হাতে

মানিকলালকে সমানে সমানে জড়িয়ে ধরল।

বহুকাল মানিকলাল এভাবে সরাসরি দাঁড়িয়ে কাউকে জড়ায়নি। সে তার ঠোঁট দিয়ে জয়শ্রীর ঠোঁট চিনে নিতে চাইল। যেন আলো ফেলে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া কানপাশা এইমাত্র দেখতে পেয়েছে সে। শুধু কুড়িয়ে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা।

জয়শ্রীর দাঁতের ওপর পাটিতে যেখানে একটা দাঁত সারি থেকে পিছিয়ে গিয়ে ফের জেগে উঠেছে—সেখানটা আন্দাজমত খুঁজে নিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরতে খুব ভাল লাগল। যেন এখানটাতেই আসল জয়শ্রী থাকে।

মুখ তুলে মানিকলাল বলল, এটা কি আমার ঠিক হচ্ছে— !

দাঁড়ানো জয়শ্রীর তখন চোখ বুজে এসেছে। মুখে মৃদু হাসি। মাথার চুল খোলা। সে সেই অবস্থাতেই বলল, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—!

কেন? কিসের?

এই যে আমার স্বপ্নের মানুষটা—সত্যি সত্যিই তার বুকে আমি· আপনার কথা আমি তের বছর বয়স থেকেই ভাবি—বলুন—বিশ্বাস করা যায়!

জয়শ্রীর চোখ খুলে গেল। মানিকলাল তখন বলল, আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার বউ বেলাকে আমি ভালবাসি। আমার ছেলেদের চিঠি না পেলে আপসেট হয়ে পড়ি। তাদের জন্যে আমার মন পড়ে থাকে। ভাইদের সঙ্গে দেখা না হলে অস্থির লাগে। আমার লেখা বইগুলোর এখন বয়স হচ্ছে। সেসব বইয়েরও একটা পরিচয় আছে। আমি একটা ডেইলি পেপারে ঘাঘু জার্নালিস্ট। আমার একটা পরিচয় আছে। আমি এসব কি করছি জয়শ্রী?

জয়শ্রী একমুখ হেসে বলল, জাত গেল! অনুতাপ হচ্ছে?—এখানে থেমে যাকে বলে রীতিমত সমর্থ—সেই ভঙ্গিতে দু'হাতে মানিকলালের গলা জড়িয়ে ধরল। মানিকলাল সে টান ফেরাতে পারল না। তার যে অনেকদিন পরে—প্রায় গতজন্মে ফিরে গিয়ে · আবার এসব হচ্ছে।

সে—ভাল বাংলায় যাকে বলে গ্রীবা—জয়শ্রীর সেই জায়গায় নিজের ঠোঁট এলোমেলোভাবে ব্রাশ করে নিচের দিকে নামিয়ে আনল। অমনি জয়শ্রী তার মাথাটা তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁট দিয়ে তার মুখখানার এ মোড় থেকে ও মোড় অব্দি ঠেসে আস্তে আস্তে বুলিয়ে নিল।

নিয়ে সামান্য হেসে বলল, বঙ্কিমচন্দ্রের ঠোঁট আরও পাতলা ছিল!

কে বঙ্কিমচন্দ্র?

বাঃ! বঙ্কিমচন্দ্র আবার ক'জন? তিনি বেঁচে থাকলে তোমায় ভালবাসতাম না।

তিনি বেঁচে থাকলে দেড়শ' বছর বয়স হত তাঁর। বুড়ো থুত্থুড়ে। তোমায় সামলাতে পারতেন না। হিমশিম খেয়ে যেতেন।

মোটেই না। আয়েষা, শৈবলিনী হ্যাণ্ডেল করা মানুষ। তোমাদের মত নাকি? অমন লিখতে পারবে?

মাথা নামাল মানিকলাল। বঙ্কিমের কোন উপন্যাস তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?

সীতারাম। শ্রীকে ভোলা যায় না। আমার নিজের জীবন রিমেক করে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

তিনি ম্যারেড ছিলেন জয়শ্রী—

হোক গিয়ে। আমি এমনি থাকতাম তাঁর সঙ্গে। লিভিং টুগেদার—

ঢি ঢি পড়ে যেত। বঙ্গদর্শন—তাহলে আরও আগে বন্ধ হয়ে যেত।

হত তো হত। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন লস্ হত না। আমাকে পেতেন।

খুব মজা লাগছিল মানিকলালের। সে বলল, আমারই তো নিজের জীবনটা রিমেক করতে ইচ্ছে করছে। আবার সাতাশ আঠাশে ফিরে গিয়ে তোমায় পেতাম।

তখন যে আমি জন্মাইনি!—বলতে বলতে জয়শ্রী পুকুরে ঝাঁপ দেবার কায়দায় মানিকলালের বুকে পড়ল। থতমত মানিকলাল দু'হাতে জাপটে সেই ঢেউ সামলাল। এই অভিজ্ঞতা সে তখন তার জীবনের পঁচিশ তিরিশ বছর আগে থেকে তুলে এনে মিলিয়ে দেখতে চাইছিল।

জড়ানো গলায় জয়শ্রী বলল, একদম তোমার ভেতরে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। রাগ করবে না?

বল। রাগ করব কেন?

তোমাকে দুধ কলা দিয়ে মেখে খেয়ে ফেলতে পারলে শান্তি হত!

মানিকলাল কোন কথা বলতে পারল না গোড়ায়। বেলার সঙ্গে তার বিয়েরও পাঁচ ছ'বছর পরে জয়শ্রী জন্মেছে নিশ্চয়। সে কি করে তার মত পুরনো শরীরের একটা মানুষকে এমন করে স্বচ্ছন্দে টানে—যেন বা মানিকলালের এখনও তিরিশ হয়নি। সে এবার আস্তে বলল, শোন জয়শ্রী—এসব কি ঠিক হচ্ছে?

মানে?

এই যে আমি তুমি—এমন হয়ে আছি যেন কতকালের—

মানিকলালের কথা শেষ হল না। জয়শ্রী একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, আমি তো তোমায় বিয়ে করব না। তুমি আর দশ বছরের ভেতর রীতিমত বুড়ো হয়ে যাবে! তখন কি করব? তার চেয়ে তোমার একটা ছেলে পেটে ধরব।

মানিকলাল মনে মনে আঁৎকে উঠল। মনের ভেতরেই বলল, ওরে বাব্বা!

জয়শ্রী তখন বলে চলেছে—স্বামীকে বুঝিয়ে বলব। সে ঠিক রাজি হয়ে যাবে।

মুখে বলতে সোজা জয়শ্রী। জিনিসটা অত সোজা নয়।

সে ধার দিয়েই গেল না জয়শ্রী। সে অন্য জায়গা থেকে কথা শুরু করল, এই দেখুন—সেই থেকে আপনাকে তুমি তুমি করে কথা বলে চলেছি। আপনি তো কারেক্ট করে দেবেন।

দোষের কি! চলুক না। ভালই তো লাগছে।

দাঁড়াও তো। তোমার ডেট অফ বার্থটা জানি।—বলতে বলতে দেরাজ থেকে একটা ক্যালকুলেটর বের করে আলগোছে কয়েকটা বোতাম টিপে লাফিয়ে উঠে বলল, প্রায় তেত্রিশ বছরের বড় তুমি —!

তুমি এটা হ্যাণ্ডেল করতে পার দেখছি।

এ কেমন কথা। ক্যালকুলেটর এমন কি জিনিস! যে কেউ হ্যাণ্ডেল করতে পারে। তুমিও করতে পারবে—

মানিকলাল বলল, কিনেছ?

নাঃ! সুব্রত দিয়েছিল। এখন সি. এ করে চাকরি করছে। আমরা ছেলেবেলায় একবাসে স্কুলে গেছি। ও এক ক্লাস ওপরে পড়ত। কতদিন আমার জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়েছে। আমার প্রায়ই খুলে যেত। ক্লাস সিক্সে উঠে ওর বাস আলাদা হয়ে গেল।

মানিকলাল খুব শান্ত গলায় বলল, তোমায় ভালবাসে?

জয়শ্রী খোলা চোখে বলল, হুঁ।

তুমি ভালবাস?

হুঁ। কিন্তু সে তো অন্য ভালবাসা।

কিরকম?

আমি তো ওকে বিয়ে করব না কোনদিন।

কেন?

আমার চেয়ে মোটে বছর দেড়েকের বড়! আমার যখন চল্লিশ হবে—ওর তখন বেয়াল্লিশও নয়। এত কম ডিফারেন্সে ও আমাকে সামলাতে পারবে না—আমাকে ওর তখন ভালও লাগবে না।—আমি যে তাড়াতাড় বুড়ি হয়ে যাব।

বাঃ! চমৎকার! আমার সঙ্গে যে তোমার লম্বা ডিফারেন্স। আমার বুড়ো হওয়া শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। খুব চেষ্টা করে আর দশ বছর যদি তাজাও থাকি—তখন তো তুমি মোটে চৌত্রিশ। বয়সের কাছে আমাকে অনেক আগেই হেরে যেতে হবে। আর তখন তোমার আগুন ধরানো বয়স।

তুমি যে মানিকলাল! আর তাছাড়া—

কি?

জয়শ্রীর চোখে জল এসে দাঁড়িয়েছে। সুব্রতর অ্যাজমা কোনদিন সারবে না। কাল মাসীমা এসেছিলেন—

কে ?

সুব্রতর মা। আমার ছোটবেলা থেকেই আমায় খুব ভালবাসেন। কিন্তু ওঁর অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি।

অনুরোধ।

জয়শ্রীর গাল বেয়ে চোখের জল নেমে এল। না মুছেই জয়শ্রী বলল, মাসীমা বলতে এসেছিলেন—আমি যেন সুব্রতকে বিয়ে করতে রাজি হই। আমি রাজি হইনি।

তুমি তো ভালবাস সুব্রতকে। তুমি কাঁদছ জয়শ্রী।

হুঁ। আমি ভালবাসি সুব্রতকে। কিন্তু বিয়ে করতে পারব না। সে হয় না কিছুতেই।

সুব্রত তো তোমায় ভালবাসে।

খুব ভালবাসে।

কি করে বুঝলে ?

একদিন ওর বাড়িতে গেছি। সুব্রত ফেরেনি। সন্ধে হয়ে গেছে। তখন ও চিৎপুরে এক ফার্মে আর্টিকেলড্ ছিল। খুব খাটতে হত ওকে। অফিসের পর ক্লাস করে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা হয়ে যেত। মাসীমা আমার জন্য চা করছেন। আমি সুব্রতর টেবিলে অ্যাকাউন্টেন্সির বইখানা খুলতেই কি যেন টুপ করে পড়ে গেল। কুড়িয়ে দেখি—আমারই অনেকদিন আগেকার ছবি—সবে যখন শাড়ি পরা ধরেছি তখনকার ছবি!

তাকে তুমি না বললে কি করে ?

ওকথায় একদম না গিয়ে জয়শ্রী যেমনভাবে বলছিল—সেভাবেই বলল, স্কুলের শেষদিকে হেস্টিংসের মাঠে আমাদের প্র্যাকটিস হত। আমি হাণ্ড্রেড মিটার স্প্রিণ্টার ছিলাম। ও নিজের টিফিন বাঁচিয়ে আমার জন্যে নিয়ে গিয়ে মাঠে বসে থাকত। এক একদিন ফিরতে আমাদের সন্ধ্যে হয়ে যেত।

সব ভালবাসারই একটা সম্মান আছে জয়শ্রী।

জানি।

তোমার বয়সে জয়শ্রী আমায় যারা ভালবাসা ভালবাসা খেলে শেষে ফিরিয়ে দিয়েছে—তাদের কাউকে তো আমি কোনদিন অপমান করতে পারিনি।

সুব্রতকে আমি একদিন চুমু খেয়েছিলাম। গালে। ও তো কেঁপেটেপে অস্থির। ওর শরীরটা তো সবসময় ভাল থাকত না। কোনদিন থাকেও না। আমার যে একসঙ্গে অনেককে ভাললাগে। আমি কি করি বলত ?

মানিকলাল আস্তে জয়শ্রীর কাঁধে হাত রাখল। বোস। এখানটায় বোস। —বলে মানিকলাল জয়শ্রীর চোখের জল মুছিয়ে দিল। দিয়ে বলল, তুমি কোন অন্যায় কথা বলনি। ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমাদের তো সংসার করতে

হয়। ঘরভাড়া। বাজার। অন্নপ্রাশন—

কথা বলতে বলতেই জয়শ্রীর কাঁধে রাখা হাতেই মানিকলাল টের পেল, মেয়েটি তার ভেতরের কান্নায় তখনও একটু একটু কাঁপছে। তখনই সে বলল, আমি তোমার সেই অনেকের ভেতর একজন তো—

বসা অবস্থাতেই জয়শ্রী দু'হাতে মানিকলালের একখানা হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর তার বুকে মাথা রেখে—নিজের দু চোখ চেপে ধরে বলল, তুমি সব বোঝ। তুমি যে মানিকলাল! তুমি আমার গডফাদার! সেই তের বছর বয়স থেকেই—

কি ?

তোমায় লিডার! লিডার! বলে চেঁচিয়ে উঠে ডাকতে ইচ্ছে করে আমার। এই চওড়া কাঁধ—এই চওড়া বুক। তোমার ভেতরে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে—

কোন বাধা দিল না মানিকলাল। কোন কথাও বলল না। একরকমের অজানা স্নেহ জয়শ্রীর জন্যে তার বুকের চামড়ার ওপাশেই ফেনা হয়ে জমে উঠছিল। শেষে সে বলল, বাইরে কোথাও হলে এখন তোমায় কিছু খাওয়াতাম। কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে আমার। আঙুরের রস। গরম কাবাব—

আমার খাওয়া দাওয়ায় বিশেষ টান নেই।

জীবনটা জানতে—ভোগ করতে—খেতে হয় জয়শ্রী। আমার তো মনে হয় খাদ্যের সঙ্গে গন্ধেরও যোগ আছে—

লিডার! লিডার!!

কি দেব তোমাকে ? কি খাওয়াব ?

ভাল লেখা দাও। ভাল লেখা খাব।

চমকে উঠল মানিকলাল। এত কথার পরেও ভবি ভোলেনি। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। সুযোগ পেল না। জয়শ্রী দুই ঠোঁটে তার মুখ বন্ধ করে দিল। এবার মানিকলালও সে মুখে জয়শ্রীকে শুষে নিতে চাইল। এই প্রথম। কোন মেয়ে যে লেখা ভালবাসে—একই সঙ্গে অনেককে ভাললাগার কথা পরিষ্কার বলতে পারে—সে আর যাই হোক—

জয়শ্রী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমার ভালবাসারও তো একটা সম্মান আছে!

নিশ্চয় বলে মানিকলাল এতক্ষণে এই প্রথম জয়শ্রীকে নিজেই বুকের ভেতর নিতে গেল। আজ সকাল থেকেই মনটা কেমন খুশিতে ভরে আছে। ভোরবেলা সেই বিদেশী পাখিটাকে দেখে ইস্তক—

জয়শ্রী বিদ্যুতের মতই সরে গেল। বাবা ফিরল—

একজন ঘরে ঢুকতেই জয়শ্রী বেশ খানিকটা দূর থেকে বলল, বাবা—ইনিই সেই মানিকলাল মিত্র—

লম্বা মেদহীন মানুষটি যেন কোন আসামী। জয়শ্রী এখুনি বলে দেবে—বাবা। আমায় একা ঘরে পেয়ে একটু আগে এই মানিকলাল আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছেন।

আমি অমিয় পালিত। আমার স্ত্রী বনলতা পালিত আপনাকে খুব ভালবাসতেন।

আঁতকে উঠল মানিকলাল।

জয়শ্রী তার বাবাকে শুধরে দিল। আমার মা আপনার বই পড়তে খুব ভালবাসতেন।

মানিকলাল কোন কথা বলল না। অমিয় পালিত গম্ভীর গলায় বললেন, মৃত্যুর ক'দিন আগেও মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে আপনার বই পড়তে দেখেছি। তখন ওঁর দুটো কিডনিই জখম—ধরা পড়েছে। আমরা আসলে নর্থ ক্যালকাটার লোক ছিলাম। এ বাড়িটা চোদ্দ হাজার টাকায় কিনে উঠে আসি। তখন মিঠু ছিল মোটে আড়াই মাসের—

মানিকলাল দেখল মিঠু ওরফে জয়শ্রী কৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে তাকিয়ে।

বাঞ্ঝো

পরিতোষ বলল, তুমি আমায় ছেড়ে দাও।

নবনীতা কিছু বলল না। বিছানা থেকে নেমে জানলার কাচ নামিয়ে দিল। জানালা থেকে ষোলতলা নিচে কালো পিচের রাস্তা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। দূরে বন্দরের জাহাজের আলো দেখা যায়। এবার সে তার স্বামীর মুখে তাকাল। তাকিয়ে আস্তে বলল, আমি ছেড়ে দিলে তুমি কোথায় যাবে?

যেখানে ইচ্ছে চলে যাব। এখুনি যাব—বলে পরিতোষ টলমল করে উঠে দাঁড়াল। নবনীতা ছুটে এসে হাত ধরল। ধরে বসাল। বসিয়ে বলল, তুমি আমার একমাত্র স্বামী! বিখ্যাত লোকের নাতজামাই। এখন এই রাত দেড়টায় তুমি যদি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কোন একটা কাণ্ড বাধাও—তো সারা কলকাতায় ঢি ঢি পড়ে যাবে—যেতে হয় কাল ভোরবেলায় চলে যেও—

আমি আর এক সেকেণ্ডও থাকব না। তুমি আমায় ছেড়ে দাও—

আমি ছেড়ে দিলে তুমি যাবে কোথায়? তোমার চলবে কি করে? এখন বয়স হচ্ছে তোমার। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব—এতদিন আমার স্বামী হয়ে আছ। এখন কি রাস্তায় নেমে কষ্ট করতে পারবে?

খুব পারব। সেই একই ঘর একই বিছানা—

নবনীতা শান্ত গলায় যোগ করল, সেই একই খাবার—একই বউ! কি বল!

ঠাট্টা কর—আর যাই কর—আমি চললাম—

দাঁড়াও। আমার সঙ্গে বিয়ের সময় বলেছিলাম—চাকরিটা ছেড় না। আমাদের বাড়ির মেয়েরা পালচৌধুরী হাউসের ব্যবসার শেয়ার পায় না। মান্থলি অ্যালাউন্স পায় তাতে আমাদের দিব্যি চলে যাচ্ছে। ফ্ল্যাটটা আমার নামে দিয়েছে বাবা আর কি চাই তোমার? এখন কি তোমাকে পুরনো অফিস নেবে? তোমার প্রিয় বইপত্তর তো সবই এখানে আছে। খাও দাও ঘুমোও—আর যত ইচ্ছে পড়। দুনিয়ার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।

সে আমি বুঝব। আমাকে তুমি ত্যাগ দাও—

আমাদের কোন ইস্যু নেই পরিতোষ। আমরা তো রুমমেটের মতই আছি। তুমি থাকলে আমার থাকে। সেটুকুও তুমি আমায় দিতে পার না? তুমি চলে গেলে লোকের মুখ আটকানো যাবে না। এই বয়সে দাদু ভীষণ শক্ পাবেন। তিনি একালের মানুষ নন্। তুমি চলে গেলে লোকে আমার দিকে আঙুল তুলে বলবে—দ্যাখো—দ্যাখো!

আর এক মুহূর্তও আমি থাকছি না এখানে—আমি চললাম—

দাঁড়াও। বাইরে শীত। মাথায় ঠাণ্ডা লাগিও না। এই চাদরখানা জড়িয়ে নাও। নিচে ড্রাইভার ঘুমোচ্ছে গাড়িতে। আজ রাতে আর সুপ্রভাতে প্রিণ্টিং দেখতে যাব না। তোমার যেখানে যাবার গাড়িটা নিয়ে যাও—

গাড়ি ছাড়াই আমার চলতে হবে এখন। গাড়ি নেব না। দরজা আটকে দাও—বলে পরিতোষ বেরিয়ে গিয়ে অটোমেটিক লিফ্‌টের বোতাম টিপল।

পরদিন দুপুর দুপুর টিন হাতে নিয়ে অমিয় পালিত কেরোসিনের লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। শীতের দুপুর। কিন্তু রোদ যেন বেগুন ভাজতে নেমেছে। আসার সময় মিঠু বাধা দিয়েছিল—বলেছিল, তুমি কেন লাইন দেবে?

তাহলে কে দেবে?

দাদা দেবে—

সন্তু? সে অফিস করে এসে লাইন দেবে! তখন তো লাইনে জায়গাই থাকবে না।

আমি আগে ভাগে গিয়ে দাদার জন্যে ইট পেতে রেখে আসব।

তুই যাবি না মিঠু। কথা হয়।

একথায় মিঠু কিছু গুটিয়ে গেল। সে দু-তিনবার লাইন দিয়েছে। ওখানে দাঁড়ালেই—সে যত পেছনেই থাকুক—লাইন যারা কণ্ট্রোল করে তারাই আগবাড়িয়ে তাকে আগেভাগে তেলটা ধরিয়ে দেয়। তাতে পেছনদিককার মেয়েরাই সোরগোল তুলেছে পাড়ায়। বেশ যাচ্ছ যাও। কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে ডিপ মেশামিশি কোরো না কিন্তু! তোমায় তো জানি।

ও কি কথার ছিরি ?—বলে পাঁচ লিটারের ড্রাম হাতে অমিয় পালিত বেরিয়ে আসে।

মিঠু সদর দরজা আটকে ভেতরে আসতে আসতে একা একা নিজে হেসেই ফেলল। এ ভাষা বাবার ভাল না-লাগারই কথা। এভাষা মানিকলালের। বন্ধুবিহীনে আছে। মানুষ আসলে মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে চায়। মিশে যেতে চায়। আমার তো এক একসময় মনে হয়—আমি মানিকলালের বুকের ভেতর একা একটা একতলা বাড়ি দখল করে আছি। বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে মানিকলালের বুকের ভেতরের দিকটা দেখতে পাই। লালচে শিরা উপশিরায় খনিকটা নীলচেও বটে।

কেরোসিনের ট্যাংকার এল সন্ধেব মুখে মুখে। আর তখুনি দপ করে লোডশেডিং হল। সামনেই কালীপুজো বলে শীতের সঙ্গে শ্যামাপোকাও ছিল। কারেন্ট চলে যেতে শ্যামাপোকারা বিদায় নিল। অমিয় পলিতের তাতে কিছু স্বস্তি হল। তবু গলার কাছে শার্টের নিচে একটা পোকা আটকে ছিল। সেটাকে খুঁজে বের করতে করতে অমিয় পালিত লাইনে দাঁড়ানো তার সামনের লোকটির সঙ্গে ডিপ মেশামেশি করছিল। আসলে বনলতা চলে যেতেই রিটায়ার—সেই থেকে সে মানুষের সঙ্গে কথা বলে—তাদের ঠিকানা—আদিবাড়ি—সেখানকার নদী বা পাহাড়ের কথা শুনে একরকমের আনন্দ পায়। মাঝে মধ্যে মনে মনে সে সেখানেই চলে যায়। মনে হয়—সে নিজেই সেখানকার লোক। পৃথিবীটা এত বড একটা দেশ। আপসোস! কী বা তার দেখা হল। কেরোসিনের লাইনে, রেশনের লাইনেই জীবনটা দিলাম।

অমিয়র সামনের লোকটি একখানা ডাবা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পরনে গামছা—ওপরে সামারকুল গেঞ্জির ফুটো দিয়ে কালো কালো বুকের লোম ফুঁড়ে বেরিয়েছে। বড় গাল ভাল করে কামানো। সামনের স্টেশনারি দোকানের এমারজেন্সি ল্যাম্পের আলো এসে পড়ায় দিব্যি রাজাগজা লাগছে। কথায় কথায় সে অমিয়কে জানিয়েছে, দ্বারভাঙ্গায় বাড়ি। একবার দ্বারভাঙ্গায় বন্যার জল ঢুকে জেলখানার দেওয়াল ধসিয়ে দিয়েছিল। লোকটা তখন নাকি সেখানে কয়েদ খাটছিল। বন্যায় দেওয়াল্ ধসে পড়ায় অনেকের সঙ্গে সেও পালায়। পালিয়ে কলকাতায় এসে মানুষের জঙ্গলে মিশে গেছে। আর ফিরে যায়নি।

বালবাচ্চা ? ফ্যামিলি ?

লোকটা অন্ধকারের ভেতরেই বলল, আর খোঁজ কউন ল্যায় ? ফিন্ সাদি স্দা করলাম্ কলকাতায়—

ওখানকার লড়কা—লড়কি ? বহু ?

খুদাকা দুনিয়ামে সবাই করে কম্মে খায়। ওয়াই বা না খেয়ে মরবে কিউ ? কলকাত্তামে দুঠো লড়কা হল।

শুনতে শুনতে অমিয় পালিতের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। ট্যাংকার এসে গেছে। কারেন্ট এলেই কেরোসিন দেওয়া শুরু হবে। সে তখন লোকটাকে বোঝাতে গেল—শুনো ভাই—পহেলা ফ্যামিলি ভি দেখনা চাহিয়ে—

ঠিক এই সময় জয়শ্রী কেরোসিনের লাইনের পাশ দিয়ে পাস করছিল।

সে অমিয়র হিন্দি মেশানো গলা পেয়ে বুঝল, বাবার খুব ডিপ মেশামিশি চলছে। হাসি এসে যাচ্ছিল। রাগ পায়ে এগিয়ে সে যখন মহাদেব পার্কের পাশ দিয়ে বাঁক নিচ্ছে—তখনই রকে বসে থাকা পাড়ারই কটি ছেলে তাকে আবছা মত দেখতে পেয়ে অন্ধকারে আওয়াজ দিল। আলো থাকলে এদের চিনতে পারত জয়শ্রী। হায়ার সেকেণ্ডারি পাস বা ফেলের দল।

এই এই—পাড়ার অ্যাসেট যাচ্ছে! অ্যাসেট!!

শুনে খুব হাসি পেল জয়শ্রীর। মজাও লাগল। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারেনি। জয়শ্রী একটু দাঁড়িয়ে, হিন্দি ছবিতে শোনা একটা ডায়ালগ ছুঁড়ে দিল—রিস্তে লাগতে হ্যায় ম্যায় তুমহারা বাপ! নাম মেরা শাহেন শা—

গলাটা যতটা পারা যায় অমিতাভর কাছাকাছি করল জয়শ্রী।

সঙ্গে সঙ্গে যারা একটু আগে অ্যাসেট! অ্যাসেট!! বলছিল—তারা ছুটে এসে বলল, দিদি তুমি যে যাচ্ছ—আমরা বুঝতে পারিনি—

ঠিকঠাক দেখে তো বলবি—

কিছু মনে কোরো না। দোবারা এমন হবে না—কথা দিচ্ছি—

ঠিক আছে—বলে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে জয়শ্রী ট্রাম রাস্তার দিকে এগোল। ওরা হিন্দি ছবির ভাষা বাংলারও আগে বোঝে।

ওইদিনই নবনীতা সারাটা দিন শুয়ে থাকল। সুপ্রভাত থেকে যতবার ফোন এসেছে ততবারই নবনীতা বলেছে—যা জানাবার সন্ধ্যেবেলা আমার টেবিলে এসে বলবেন। এখন আমি ব্যস্ত।

সন্ধ্যের আগেই গাড়ি থেকে নেমে নবনীতা সুপ্রভাতের বারোতলা অফিস-বাড়ির সামনে দাঁড়াল। মাটির নিচে আরও চারতলা আছে। সেখানে মেশিনঘর; কাগজের রিল। লরি নেমে এসে লোডিংয়ের পর বেরিয়ে যাবার রাস্তা। এতবড় প্রতিষ্ঠানের যিনি বীজ পুঁতেছিলেন—তিনি একদিন পুটুলিতে চিঁড়ে গুড় বেঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতেন ঘোড়ার পিঠে। নীলচাষীদের দুর্দশা নিজের চোখে দেখে রিপোর্ট পাঠাতেন হরিশ মুখুজ্যের হিন্দু পেট্রিয়টে। বড়লাট ক্যানিং ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে সেই রিপোর্ট পড়তেন। একদিন এই সাধারণ অথচ অসাধারণ বাঙালীকে বিদ্যাসাগরেরও মনে হয়েছিল—বিপজ্জনক। এতটাই র‍্যাডিকাল! আর আমরা?

মাথা পেছনে হেলিয়ে বাড়িটার মাথা দেখতে দেখতে নিজের মাথাই ব্যথা করে উঠল নবনীতার। ঘাড় টন টন করছিল। মাথা নামাতেই চোখে পড়ল —অফিস গেটে—লিফট আর ওপরে ওঠার সিঁড়ির মাঝের চাতালে রিলে অনশনে অফিসের কয়েকজন শুয়ে বসে আছেন। তাঁদের সামনে বিরাট বো পাখা দাঁড় করানো। যদি গরম লাগে তো চালানো যাবে। নবনীতাই বলে ব্যবস্থা করেছে।

এখন সে দেখতে পেল—মানিকলাল মিত্র খুব খুশি মুখে সিঁড়ি টপকে টপকে নেমে আসছেন। মনে হল মানুষটি বেশ ছিপছিপে হয়ে উঠেছেন। চোখ রাস্তার ওপারে। সেদিকে—বাস স্টপে একবার তাকাল নবনীতা। হ্যাঁ। সেই মেয়েটি। এ বোধহয় মাঝে মাঝে মানিকলালের উল্টো দিকের চেয়ারে এসে বসে।

তার পাশ দিয়ে রাস্তা পার হতে যাবে মানিকলাল—এমন সময় নবনীতা ডাকল। এ কি করছেন?

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মানিকলাল। সে নবনীতাকে এতক্ষণ দেখতেই পায়নি। শীতের বিকেল সন্ধ্যের প্রায় গায়ে। ওপারে বাসস্টপে দাঁড়ানো জয়শ্রীর কাছে কত তাড়াতাড়ি পৌঁছবে—এই ছিল এতক্ষণ মানিকলালের লক্ষ্য। কথামত ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় এসে দাঁড়িয়ে আছে জয়শ্রী।

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে টাল সামলাল মানিকলাল।

অনেক হালকা লাগছে আপনাকে—

এবারও কোন জবাব এল না মানিকলালের মুখে।

একবারটি আমার ঘরে ঘুরে যাবেন?

মানিকলালের মুখ নিভে গেল। আজ? এখুনি?

কেন? তাড়া আছে?

মানিকলাল ঠিক বুঝতে পারছে না—এটা নবনীতার অর্ডার? না—এমনিই বলা? মানিকলাল চুপ করেই থাকল। হঠাৎ নবনীতা রাস্তার ওপারে বাসস্টপে তাকিয়ে নিল। সে তাকানো কয়েক সেকেণ্ডের হলেও—এমন করেই তাকানো—যা কি না মানিকলাল দেখতে বাধ্য হয়। নবনীতা এবার গম্ভীর মুখে পালচৌধুরী হাউসের মেয়ের মতই মানিকলালের মুখে তাকাল। সামনেই সুপ্রভাত আর ডেইলি হেরাল্ডের লোকজন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। আবার নেমেও আসছে অনেকেই। যাট সত্তর গজের ভেতর। রাস্তা এফোঁড় ওফোঁড় করে বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, অটো, প্রাইভেটের যাতায়াত।

হাতে সেই দাগগুলো আছে!

মানিকলাল তার ডান হাতের কনুইয়ের নিচেটা মেলে ধরল। আপনার ঘরে যেতেই মারাকিউরোক্রোম লাগিয়ে দিলেন যে—সব মিলিয়ে গেছে!—

বলেই এক দৌড়ে চলন্ত বাস ট্রাম বাঁচিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল। আর দাঁড়াল না।

সেদিকে তাকিয়ে থাকল নবনীতা। একটা ট্রাম এসে মানিকলালকে ঢেকে ফেলল। ট্রামটা চলে যেতে তাকে বা সেই মেয়েটিকে আর দেখতে পেল না নবনীতা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। কালো কালো অনেক মাথা। নিশ্চয় ট্যাক্সি পেয়েই উঠে পড়েছে। শীতের নিজের ছায়া সব ছাই ছাই আবছা করে দেয়।

নবনীতার তবু মনে পড়ল, সেদিন লোডশেডিংয়ের ভেতর তার ঘরে অমন করে নখ বসিয়ে দেবার ক'দিন বাদেই মানিকলাল তার ঘরে এলে সে নিজেই দেখতে পেয়েছিল—কনুইয়ের নিচে থেকে মানিকলালের হাতে কয়েক জায়গা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। সে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট এইড্ বক্সের মারাকিউরোক্রোম লোশনে তুলো ভিজিয়ে নিয়ে মানিকলালের হাতে জায়গায় জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছিল। যাতে না পেকে ওঠে। খুব লজ্জাও পেয়েছিল নবনীতা।

তারপর এই কয়েক মাস তার কথাই হয়নি মানিকলালের সঙ্গে। এর ভেতর মানুষটাই কেমন আগাগোড়া পালটে গেছেন। সেই ভার ভারিক্কি ভাবটা মুছে গিয়ে কেমন হালকা ছিপছিপে হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। কী খুশি খুশি ভাবে সিঁড়ি টপকে টপকে নেমে আসা। রাস্তার ওপারেই বাস স্টপে বান্ধবী দাঁড়িয়ে।

নবনীতার গায়ে জ্বর আসছিল। এখন তাকে দোতলায় উঠে আবার সেই নিউজপ্রিণ্টের গন্ধের ভেতর ডুবে যেতে হবে। আশা জাগে—এমন কিছু তার সামনে নেই। ভাল লাগে—এমন কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই।

তেরো

জয়শ্রীর জীবনের প্রথম গল্পের খসড়ায় প্রখ্যাত লেখক নবীনবরণ সরকারের বয়ঃসন্ধির চাকরের নাম দিল মাধব। রথতলায় মানিকলাল মিত্রের বাড়ির কাজের ছেলেটির নাম বিনোদ। সর্ব বিষয়ে তার আগ্রহ। গাঁ থেকে কাজ করতে এসে এই লোকটিকে—এই রথতলাকে তার ভাল লেগে গেছে। এখানে টেলিফোন আছে—আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে চান করার পুকুরও আছে। দাদাবাবুর চাকরি আছে—অফিসও আছে—কিন্তু বেলা নটায় বেরোতে হয় না। বিকেল তিনটে চারটেয় দাদাবাবু আফিসে যায়। বৌদিদি এই থাকেন ক'দিন. আবার ছোট-ছেলের ওখানে একা একাই চলে যান। তখন বিনোদ রান্নায় হাত পাকায়। সে শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা ফোড়ন—প্রায় সব রান্নাতেই দেয় তখন।

এরকম বিনোদ তার গ্রাম সুবাদে একজন গুরুর কাছে গতবছর দীক্ষা

নিয়েছে। গুরুদেব মাইক্রোফোনে শ'য়ে শ'য়ে লোককে একসঙ্গে কয়েক মিনিটে দীক্ষা দিয়ে থাকেন। দীক্ষা নেওয়ার সময় বিনোদ শ্যামবাজারে এক হোটেলে পাতা তুলত—জল দিত, লেবু দিত। সেখানকার ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে সোদপুর আশ্রমে দীক্ষা নিয়েছিল বিনোদ। গুরুদেবকে ওরা বলে ঠাকুর।

এখন বিনোদ এই বারো তেরো বছর বয়সেই পরম ভক্ত। গুরুদেবের ছবি লাগানো লকেট তার গলায় দোলে সবসময়। সাড়ে তিন টাকা দিয়ে কিনেছে। ফ্রেমে বাঁধানো ঠাকুরের ছবি সাড়ে সাত টাকা। সে ছবি বিনোদ মানিকলালের শোবার ঘরে টি. ভি-র ওপর রেখেছে। এ ছাড়া সোদপুর আশ্রমে ঠাকুরের কারখানায় তৈরি এক রকমের অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম—টিউবে পাওয়া যায় সাড়ে পাঁচটাকা দাম। সবই সাড়ে। বিনোদ সেই টিউব থেকে এখানে অনেককে ওষুধ লাগিয়ে—মাথা ধরা, কেটে ছড়ে যাওয়া সব সারিয়ে দিয়েছে। ক্রিমটার নাম—পারিজাত। এখন সে এখান থেকে অনেকের বরাত নিয়ে সোদপুর আশ্রম থেকে পারিজাত এনে দেয়। লকেটও এনেছে।

ক'দিন হল বউদি কলকাতার বাইরে ছোড়দার ওখানে। বিনোদই রান্না করে। বিনোদই চা দেয়, বিনোদই বাজার করে। গতকাল রাতে দাদাবাবু অনেক রাত অব্দি লিখেছে। সকালে তাকে ঘুমোতে দেখে জাগায়নি বিনোদ। বেলাবেলি চা এনে ঘুম ভাঙাল মানিকলালের।

মানিকলাল তড়াক করে জেগে উঠেই বিছানায় উঠে বসল। লেপ দিসনি কাল রাতে। খুব শীত করেছে—

দিয়েছি তো। তুমি পা দিয়ে সরিয়ে রাখলে কি হবে!

মানিকলাল বিনোদের দিকে তাকাল। ছেলেটার বয়স বড়জোর তেরো। তার চেয়ে তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছরের ছোট। অথচ কেমন ক্যাট ক্যাট করে কথা বলে। একটুও ডরায় না।

ওকে না হলে মানিকলালের চলেও না। লিখতে বসলে এটা ওটা এগিয়ে দেয়। ছোট টেবিলটা বারান্দায় ছায়া দেখে পাতে। পায়ে মশা কামড়ালে পটাপট চড় মেরে মারে। মেরে তাদের সাজিয়ে রাখে। একটা দুটো আধমরা করে ছেড়েও দেয়। তারা নাকি ফিরে গিয়ে ওদের পাড়ায় খবর দেবে—ওরে ওদিকে যাসনে--মানিকলাল লিখতে বসেছে—পায়ে কামড়ালেই মারা পড়বি।

একটা কথা ছিল—

বলে ফেলো।

তুমি ভাত খাচ্ছো না। রুটি খাচ্ছো না। তো আমার একার জন্যে রেঁধে কি লাভ?

কেন? তুই খাবি। আমার রোগা হওয়া দরকার। ওজন কমছে আর

আমি সারাদিন কাজ করতে পারছি। পড়ছি—লিখছি—রেকর্ড শুনছি—আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় জেগে থাকতে পারছি।

তুমি তো কিছুই খাচ্ছো না।

বাঃ! মাছ তরকারি ডাল—দই—সবই খাই। শুধু ভাত আর রুটি বাদ। সাধে কি দু'মাসে ভুঁড়ি উড়িয়ে দিতে পারি!

তোমার জামা প্যান্ট আগে টাইট হত। এখন সব ঢলঢল করে।

মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছিস। বাজারের কাছে বটতলায় দর্জির দোকান দেখেছিস তো—বাঁহাতে—?

হুঁ।

ওখানে মাস্টার রইস মহম্মদ বসে। শাদা দাড়ি। ওকে বলবি প্যান্টগুলো দিয়ে যেতে। ছোট করতে নিয়ে গিয়ে তো আর আসছে না—

তাহলে টাকা দাও। একেবারে বাজার করে ফিরব।

আজ বাজার হবে না—

অবাক হয়ে তাকাল বিনোদ। বাজারের ফর্দ করে তবে দাদাবাবু তাকে রোজ সকালে বাজারে পাঠায়। শশা, পেয়ারা, লেবু, মাছ, টমেটো, লঙ্কা, বরবটি—কোনটা কতটা আনতে হবে—তাও লিখে দেয় দাদাবাবু। নইলে সে গুলিয়ে ফেলে।

দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা ডেকে আন রইসকে—

তবু বিনোদ দাঁড়িয়ে আছে দেখে মানিকলাল এক ধমক দিল। তোর জলখাবারের পান্তা-ডিমভাজা তো আছে?

তা আছে। তুমি খাবে না দুপুরে?

আমি খাব না। তুমিও খাবে না। আজ দুপুরে তুই হোটেলে খাবি। আমিও হোটেলে খাব। রান্না আজ বন্ধ—

বিনোদ প্রায় নাচতে নাচতে বটতলা রওনা হয়ে গেল। আজ হোটেলে খাওয়া হবে। যাবার সময় বলে গেল, ব্যায়াম করে শশা, ঘোল যা খাবে টেবিলে রেখেছি। যদি লিখতে বসো তো খাতা কলম বারান্দার টেবিলে সাজানো আছে। গায়ে চাদর দিয়ে বোসো—আজ ভোর থেকেই কনকনে বাতাসের সঙ্গে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে—ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

সারা বছরই খালি গায়ে বসে লেখে মানিকলাল। শীতকালে একটা পাতলা পাঞ্জাবি গায়ে থাকে। বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতেই মানিকলাল বলল, আর পাকামো করতে হবে না। রইসকে ডাকবি—আর এক প্যাকেট সিগারেটও আনবি কালকের টাকা থেকে।

সময় অসময়ে যদি কিছু আনতে হয়—তাই বিনোদের কাছে আলাদা একটা ফাণ্ড থাকে। সে ফাণ্ড ফুরিয়ে গেলে তবে হিসেব হয়। বারান্দায় বেরিয়ে

চারদিক তাকিয়ে মানিকলালের মনটা ভরে গেল। ঠাণ্ডা বাতাসে টেলিফোনের ওভারহেড তার যেমন দুলছে—তেমনি রথতলার তাবৎ গাছপালাও দুলছে। সেই সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আজ ভোরে আকাশ বুঝি বা কোন বগি থালা—যার কানাতের ছায়ায় সারা রথতলা কালচে হয়ে আছে।

ব্যায়াম মানে খানিকক্ষণ হাত পা ছোঁড়া। মাথা নিচু করে কয়েকবার হাতের আঙুল দিয়ে নুয়ে পায়ের আঙুল ছোঁয়া। সব মিলিয়ে বড়জোর পঁচিশ তিরিশ মিনিট। মোটে কয়েক মাসে—যে মানিকলাল মুটিয়ে গিয়ে হাঁসফাঁস করতো—সে এখন প্রায় আগেকার মানিকলাল হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ পড়তে পারে। এক নাগাড়ে পাঁচ-ছ ঘণ্টা লিখতেও পারছে ইদানীং। এই তো সেদিন নবনীতাই বলল, একদম হালকা ছিপছিপে হয়ে গেছেন যে—

খানিকক্ষণ হাত পা ছুঁড়ে ঘাম ঝরিয়ে বেশ ভাল লাগতে লাগল মানিকলালের—এই কিছুদিন তার নিজের শরীরটাকে আগের মত আর সাত পুরানো লাগে না এখন। পাজামা পাঞ্জাবির ওপর চাদর জড়িয়ে টেবিলে বসল। কাল রাতের লেখাটাকে আবার ধরবে। গত ক'বছরই কেমন একটা যাচ্ছিল যে-লেখা ধরে তা যে করেই হোক ঘাড় থেকে নামাতে পারলে-মুক্তি মনে হত তার। এখন আবার আগেকার মতই সে লেখার ভেতর সারা দিন বাস করে। লেখাটার ভেতর ঢুকে যায়। যাকে বলে সেঁধিয়ে যাওয়া।

ছেলেরা যখন ছোট ছিল—তখন একটা জীবন ছিল—যখন বেলা ভোরে গাঢ় দুধের কফি দিত। বড় বাগদা রাঁধতো কুমড়ো দিয়ে। টেবিলে কিংবা মাথার বালিশের নিচে খাতা রেখে দিত। ছেলেদের সাধ আহ্লাদের জিনিস কেনা--বাজার করা—আর লেখার ভেতর ঢুকে যাওয়াই মানিকলালের আনন্দ ছিল। ছেলেরা বড় হয়ে চলে গেল। বেলার মাসিক বন্ধ হয়ে গেল। কেমন ছায়া পড়ল ওর চোখের নিচে। পৃথিবীতে কত কাণ্ড ঘটতে থাকল। সে আর কিছুতেই বিশেষ রাগতে বা বিস্মিত হতে পারছিল না। সবই মনে হচ্ছিল—এমন তো ঘটেই থাকে। লেখা কমতে থাকল। খাওয়া বাড়তে থাকল। মনে হতে থাকল—পৃথিবীর সব চলে যাক—খাওয়া থাক। ল্যাংড়া, চাপের মাংস, রাবড়ির ভেতরেই পৃথিবীর রস থাকে। নিত্যদিন মানিকলাল নানান খাবার জিনিস আবিষ্কার করে—খেয়ে—মেদের ভেতর—বিষাদের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছিল। গম্ভীর, গাঢ় হয়ে পেছনে হাত রেখে বেলা একা পায়চারি করে। সেই পাগল করা সুন্দরী মহিলা নিত্যদিন মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল মানিকলালকে। আর মানিকলাল ততই খেয়ে যাচ্ছিল। যেন কালই মারা যাবে। তাই—। অবিচল, নিটোল সৌন্দর্যই কি মৃত্যু?

ফালতু ভোট—ফালতু রাজনীতি, বিবৃতি—ফালতু খবরের কাগজের চারের পাতায় এক গামছা আর্টিকেল, চমকানো হেডিং। গাঢ় অবসাদের ভেতর

আশাহীন অবস্থায় তাকে মাঝে মাঝে টেনে তুলতেন ফৈয়াজ খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, রসুলন বাঈ, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের আমরা এসেছি - তার পরেই সে ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছিল, আমার কোন যাবার জায়গা নেই—আমি সলিড হাবা হয়ে যেতে চাই—

মাস্টার রইস মহম্মদ এসে অলটার করা ট্রাউজার দিয়ে গেল। যাবার সময় মাপ নিল নতুন করে। নিয়ে বলল, আপনি তো অবাক করে দিলেন। কোমর কমেছে আরও।

বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা বিহারী দর্জি। রথতলায় এসে বাঙালী বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে বটতলার কাছাকাছি। যাবার সময় তিনটে কোট নিয়ে গেল। নতুন প্যাড লাগাবে। কোমরের কাছটা কমাবে। নয়ত হলহল করবে।

মাঝে মাঝে রোদ দেখা দিচ্ছিল। আবার ঝেঁপে বৃষ্টি আসার ভাবও ফুটে উঠছিল। মানিকলাল বলল, যা বিনোদ চান করে নে। তোকে বেরোতে হবে।

এত সকালে? কোথায়?

সোদপুরে তোদের ঠাকুরের ওখানে যাবি।

একটু অবাক হল বিনোদ। তুমি যাবে নাকি?

যেতে পারলে খুশিই হতাম। এবার তুই একাই ঘুরে আয়—

রীতিমত অবাক বিনোদ। রান্না করতে হবে না। হোটেলে খাবে। তারপর আবার সোদপুরে যাওয়া?

মানিকলাল তার মুখ দেখে বুঝল। হেসে বলল, আমার জন্যে তিনটে পারিজাত আনবি। আর কারও যদি অর্ডার থাকে তো নিয়ে আসিস। ইচ্ছে করলে দুটো লকেট আনতে পারিস—

বিনোদের চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। লকেট? কেন? তুমি গলায় পরবে নাকি?

বেশ রহস্য করেই বলল মানিকলাল, কোনদিন তো পরতেও পারি।

মোটেই রহস্য মনে হল না বিনোদের। এ কি ব্যাপার দাদাবাবুর? না চাইতেই তাকে সোদপুর যেতে বলছে। সবই ঠাকুরের কৃপা।

এবার মানিকলাল বলল, অনেকদিন তো যাসনি আশ্রমে। কোন তাড়া নেই। রাতটা থেকে কাল বেলায় বেলায় চলে আসিস। জিনিসগুলো আনিস কিন্তু। আমি ঠিক হোটেলে খেয়ে নিতে পারব।

রাতে থাকার দরকার কি? বাস তো আছে। দিব্যি ফিরে আসব।

কোন তাড়া নেই। অনেকদিন যাসনি। থেকে আয় না একটা দিন।

বিনোদ বেশ অবাক হয়েই চান করতে গেল পুকুরে। রওনা হতে হতে প্রায় বারোটা। যাবার সময় বিনোদকে গাড়িভাড়া ছাড়াও খাওয়া-দাওয়ার জন্যে পনেরটা টাকা দিয়ে দিল মানিকলাল। টাকা নিতে নিতে বিনোদ দাদাবাবুর

মুখে তাকাল। বেশ অবাক হয়েই।

প্রায় দেড়টা নাগাদ নির্জন রথতলায় রিকশ থেকে নামল জয়শ্রী। নির্জন এজন্যে যে –গাছপালায় ঘেরা নতুন নতুন বাড়ির এই বাহারি বসতিতে পুরুষরা অফিস চলে যায় বেলা দশটার আগেই। রিটায়ার্ড লোকজন এই সময়টায় ভাত ঘুমে। ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে। মা বউয়েরাও যে যার ঘরে। শুধু কয়েকজন ঠিকে ঝি আরেকটু বাদেই পুকুরটায় ডুব দিয়ে মাথায় সাবান ঘষতে বসবে। ওদের ভেতর একজনের মাথাটি একটু খারাপ। সে মানিকলালকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে ব্যায়াম করতে দেখে থাকবে। ইদানীং মেয়েটি নিজেই পুকুরে নামার আগে একা একা কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে ওভাবে হাত পা ছোঁড়ে। যেন ব্যায়াম করছে।

পুকুর পাড়ে ওদের ভিড় হওয়ার আগেই জয়শ্রী আর মানিকলাল গ্রিল ঘেরা খোলা বারান্দা পেরিয়ে বড়ঘরে এসে ঢুকল। বাইরে তখন শীতের হাওয়ার সঙ্গে রীতিমত বৃষ্টি। বিনোদ নিশ্চয় এতক্ষণে শ্যামবাজার পৌঁছে গেছে।

প্রথমবার এসে এ-ঘরে ঢুকিনি। এটা তোমার বউয়ের কতদিন আগের ছবি?

আট দশ বছর হবে।

এখনও কি গ্রেসফুল। কতটা লম্বা--বলতে বলতে জয়শ্রী ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আচ্ছা আমি কি খুব বেঁটে?

মোটেই না। তুমি তোমার মত।

জয়শ্রী এগিয়ে এসে দু-খানা হাত মানিকলালের কাঁধে রাখল। বুক বুকে। তারপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই কাঁধ থেকে হাত দু-খানা নামিয়ে দু-হাতে মানিকলালকে জড়াল। তুমি তোমার বউকে খুব ভালবাসো?

আমার সব কাজে এত বছর সে আমার সঙ্গী। তাকে তো ভালবাসবোই। তোমাকেও বাসি। ভীষণ বাসি মিঠু—বলতে বলতে মানিকলাল তার সব দ্বিধা কাটিয়ে জয়শ্রীর গলা –কাঁধে নিজের ঠোঁট ঘষে দেখছিল।

তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও—

মিঠু ছিটকে সরে যাওয়াতে অবাক হল মানিকলাল। বাঃ! তুমিই তো বলেছিলে—একজন অনেককে ভালবাসে - অনেককে ভালবাসতে পারে—বলতে বলতে মানিকলালের মুখে হাসি এসে বিষাদে ফিরে যাচ্ছিল - আবার বিষাদ থেকে হাসি তার নিজের জায়গায় চলে আসছিল।

জয়শ্রী অমনি তার কাছে এসে দাঁড়াল। ভাল করে সাতান্ন বছরের পুরনো ঠোঁট, চোখের মণি, কালো চুলের গোড়ায় গোড়ায় আগুন ধরে ওঠা শাদা দেখল। তুমি এভাবে হাসো কেন?

আমার এক এক সময় ভয় হয়।

কার জন্যে?

আমার জন্যে। যদি তোমাকে হারাই—তাহলে কি করব? আবার তোমার জন্যে। আমি না হয়ে অন্য কারও কাছে এমনভাবে গেলে তুমি তো বিপদে পড়তে পারো।—ভয়টা চলে গেলে আনন্দ আসে—আনন্দ হয়।

কেন?

তুমি আছো। আমার যে তুমি আছো।

সব গল্পে কিছুদিন ধরেই লিখছিলে আমার কোন যাবার জায়গা নেই। এখন কি আর তা মনে হয়? লিখছিলে—সামনে কোন কিছু নেই—

তুমি সব পড়ো মিঠু?

সব। যেখানে যা বেরোয় খুঁজে খুঁজে পড়ি। তুমি যে একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছো। একটু একটু করে। তোমার বউ—ছেলেরা—লেখা—লেখার ভেতরকার কথা—সব মিলিয়ে। সেটাই তোমাকে আমার কাছে আসতে দেবে না। এখন তো আর তুমি লিখবে না—আমার কারও কাছে যাবার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে বিষাদের কুঁড়ি ছুঁয়ে আসা সেই হাসিটা হেসে ফেলল মানিকলাল।

এই যে—এই যে সেই হাসি। এটা তোমার সারেণ্ডারের হাসি। স্বর্গের পরের জংসনের লেখক—স্মৃতি বিস্মৃতির লেখক—একটা পুচকে মেয়ের কাছে—

লেখক তো আগে মানুষ মিঠু। তুমি পুচকেও নও। রীতিমত সাহসী। অনেক দূর অব্দি ভাবতে পারো।

আর বাড়িয়ো না আমাকে। আমি জানি। দেখি—

মানিকলালকে ঘাড় নামাতে হল। মিঠুর যাতে চুমু খেতে সুবিধে হয়। সেও খেল। অনেকক্ষণ ধরে। যেন শেষ হয় না।

আমার এই জড়িয়ে ধরা—তোমার জড়ানো—একশো পঞ্চান্নটা চুমু খেতে বেশি ভাল লাগে। আমি বেঁটে বলে তোমার ঘাড় নোয়াতে অসুবিধে হয়?

মানিকলাল সর্বক্ষণ মিঠুর ভেতরে কিছু না কিছু আবিষ্কার করেই যাচ্ছিল। সে বলল, মোটেই না। বরং তোমাকে হেল্প করতেই আমার বেশি ভাল লাগে।

বেঁটে বলে আমার একটা কমপ্লেক্স গ্রো করেছে—

আমিও তো এমন কিছু লম্বা নই মিঠু। তুমি রীতিমত সুন্দরী। আজ টিপ পরেছো। মুখখানা শিশির ধোয়া—আনকোরা দেখাচ্ছে।

তোমার বউ আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী।

সেটা তার দোষ নয়। সে তার মত। আমাদের তো প্রায় তিরিশ বছর বিয়ে হয়েছে—

আমি তার কাজ করে দিতে পারি না?

কি কাজ মিঠু—

এই ধর শিক্ষিতা কাজের লোক হয়ে—তার চুল বেঁধে দিতাম—পান খান তো?

খাবার পর একটা খায়—

তাহলে পান সেজে দিতাম।

এতটা দুঃখীর রোল কেন নেবে! এসো ছাখো—আমি তোমার কতটা উপযুক্ত হয়ে উঠেছি--

হ্যাঁ। তাই তো! তোমার সেই কোমর কোথায়?

তুমি না বলেছিলে—সুপ্রভাতের অফিসে সম্পাদকের মত ভুঁড়ি ভাসিয়ে বসে ছিলাম! এখন ছাখো। তোমার পাশে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কেউ যাতে আমায় তোমার বাবা না বলে—

হয়েছে, বলে মিঠু আবার মানিকলালের বুকে মাথা রাখল। এত ভাল লাগে তোমার চওড়া কাঁধ—বুক—ওই সারেণ্ডারের হাসি—আর চোখের মণির পাশে বাদামী সাদা জায়গাটা—

এখনও বিশ বছর মিঠু তোমার আগুন ধরানো রূপ থাকবে। ততদিন তো আমায় টাটকা থাকতে হবে। কী কঠিন খেলা বলতো!

মানিকলালের বুকের ভেতরেই মিঠু বলল, তুমি এখনও কম করেও একশো বছর আছো।

আরও বেশি থাকতে চাই আমি। শুনেছি আজারবইজানের পাহাড়ে একরকমের লতা জন্মায়। তা রেগুলার খেলে নাকি দেড়শো বছর থাকা কিছুই নয়। ভাল স্টুডেণ্ট ছিলে। একটু চেষ্টা করলেই একটা চাকরি হয়ে যাবে তোমার। দরকার তোমার নিজের ঘর। টাকা। চলা ফেরার ফ্রিডম। ভীষণ দরকার—

তুমি ভীষণ কথাটা এত সুন্দর করে বল। খুব জোর দিয়ে। তখন তোমার পুরুষালী গলাটা পুরো বেরিয়ে আসে। ঝনঝন করে বাজে—

এসব বোঝো?

বাঃ! আমি একজন কমপ্লিট মেয়েমানুষ। তার চেয়ে কম নয়। তার চেয়ে বেশি নয়।

ওই ফ্রিডম পেলেই তুমি তোমার মত করে ভাবতে পারবে মিঠু। তখন আমি বুড়ো হয়ে গেলেও তুমি আমায় রাখবে। আমি তোমার যৌবনের ওপর বসে বসে খাবো। তুমি পরিশ্রম করবে। খাটবে। খাবার আনবে—

ছাখো। পরিশ্রমই কিন্তু মানুষকে সুন্দর করে। তুমি যেদিন সারাদিন ধরে লিখে—তারপর অফিস করে—ঘেমেচুমে আসো—তখনই তোমার ঘেমে ওঠা বুকে নাক চোখ ঘষটে আমি দুনিয়ার বেস্ট পারফিউমের গন্ধ পাই। তুমি না বলেছিলে—গাড়ি থাকতে তোমার মনে হত চলন্ত চালাঘরের ভেতর বন্দী হয়ে

বসে কলকাতা পার হোচ্ছ। কারও সঙ্গে মেশা হচ্ছে না। দেখা হচ্ছে না। তাই গাড়ি বেচে দিয়ে ফের বাস-ট্রাম ধরেছো—

মনে আছে মিঠু ?

আমি কিছু ভুলি না। আমিও ভিড়ের মিনিবাসে ঘুরি। যতটা পারি হাঁটি। কত কি দেখতে পাই। হাঁটাহাঁটি—ঘামের গন্ধ—কলকাতার ভাঙাচোরা রাস্তা—আমাকে অনেক কিছু শেখায়—আমাকে সুন্দর করে।

কলকাতা একজন বড় টিচার—বলে মানিকলাল তার বুকের ভেতর এই অল্পবয়সী মেয়েটির মুখ তুলে তার চোখে তাকাল। সেখানে অনেক ভাবনা আর স্বপ্ন একই সঙ্গে স্থির হয়ে আছে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। রিকশর প্যাক প্যাক। ভরদুপুরের আলোতে সন্ধ্যের ভঙ্গি। খাখো এখন আমায় যুবক লাগে— ?

যুবকের চেয়েও বেশি। বলে মানিকলালের খোলা বুকে ঠোঁট চেপে ধরে জয়শ্রী বুকের ভেতরকার শ্বাস প্রশ্বাসও যেন কণ্ট্রোল করতে চাইল।

একটা সাতাশ আঠাশ বছরের ছেলের মতই এখন আমার কোমর। এখন শার্ট গুঁজে পরতে পারি।

ঘচ্ করে সরে দাঁড়াল জয়শ্রী। আমি কি এখন ফিতে হাতে রাস্তার মোড়ে গিয়ে মেপে মেপে দেখে তবে আমার লোক ঠিক করব ?

আমি বুড়ো তো! তোমার পাশে।

তোমার এত সুন্দর শরীর। তবু বলব, শরীর তো সব নয়। কিছুতেই নয়। কখন কাকে কেন সুন্দর লাগে—দামা মনে হয়—কে বলতে পারে? আর—আর তোমাকে আমার দেওয়ার তো কিছু বাকি নেই--কিছু বাকি রেখেছি ?

না মিঠু। তবু এই ক'মাসে কত পাল্টে গেছি। একজন পঁচিশ বছরের যুবকের মতই ব্লাড প্রেসার নিচেরটা এখন পারফেক্ট—কাঁটায় কাঁটায় আশি। ব্লাড সুগার পি পি একশো দশ মোটে। ব্লাড ক্লোরেস্ট্রল একশো পাঁচশ। বলতে পার হাই নরমাল!

ওসব আমি বুঝি না।

ওসব বোঝার বয়স হতে তোমার এখনও অনেক দেরি মিঠু। আমি যা করেছি—ডাক্তার শুনে বলছেন—মিরাক্যাল! মিস্টার মিত্র। কি করলেন এত তাড়াতাড়ি ?

কি বললে ?

আমি গুড স্টুডেণ্টের মত মাথা নিচু করে হাসলাম।

এসো। তোমায় প্রাইজ দিই—বলে মিঠু বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হল। মানিকলাল তার সাতান্ন বছরের মুখখানা নামিয়ে আনল। মিঠু তার দুই চোখে দুটো ভিজে চুমু রাখল। মানিকলাল মনে মনে বলল, তুমি আমায়

দামী মনে কর। এটাই আমার প্রাইজ। এটাই আমার সম্মান। বেলা কোনদিন নিজের থেকে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে আমায় একটাও চুমু খায়নি।

বাইরের আলো মরে যাওয়ায় ঘরে প্রায় ভর দুপুরে অন্ধকার নেমে এল। মানিকলাল জয়শ্রীর বুকের ওপর নিজের বুকের ভর দিল না—পাছে চাপ লাগে।

বুকটা নামাও। এইসময় অমন থাকে—!

আমি তো বিশ বছর বেলার বুকে ভার রাখিনি আমার।

ঘরের সিলিংয়ে চোখ রেখে জয়শ্রী হেসে বলল, কেন. ও?

আমার ভারে ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইত। মাথা ধরে যেত। তাই পুরো সময়টাই আমি বছরের পর বছর পাতাল রেলের ক্রেন হয়ে থেকেছি। থাকতাম। মাথা ধরলে অমৃতাঞ্জন লাগিয়ে দিতাম তারপর এক গ্লাস জল নিজে খেয়েছি। ওকে দিয়েছি।

যাঃ। হাসালে তুমি। লেখক তো। বানিয়ে বানিয়ে বলছ।

না একদম সত্যি মিঠু।

ঠিক হয়ে শোও। উঠো না কিন্তু। উঠলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। তুমি তো হাল্কাই।

বহুকাল পরে নিজের তেজ ফিরে পেল মানিকলাল। জয়শ্রী পুরো আনন্দে হাসল। অন্ধকার ঘরে ওর মুখখানাই এখন আলো দিচ্ছে। আবার—

আবার? বেশ।

পুরনো অভ্যেস বসে মানিকলাল জগ থেকে দু'গ্লাস জল ঢালল। একগ্লাস নিজে খেল। এক গ্লাস মিঠুকে দিল। অবশ্য জল খাবার মত কোন বিয়োগই ঘটেনি মানিকলালের।

তুমি ঢাললে কেন? আমিই দিতাম তোমায়। তোমায় দিতে যে আমার কত ভাল লাগে।—তারপর জয়শ্রী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত মুখে জানতে চাইল, তোমার ভাল লেগেছে?

মানিকলাল বলল, খুব। তোমার?

মিঠু ঘাড় কাৎ করে বলল, খুব!

খাট থেকে নেমে—এই পূর্ণ রমণী মেঝেতে দাঁড়াতে মানিকলাল তার দিকে আগাগোড়া তাকাল।

এমন করে তাকাচ্ছো—যেন হলিউডের হিরো! কিন্তু মুখের জায়গায় শেতলা ঠাকুরের মুখ বসানো!

ও কথায় কান না দিয়ে মানিকলাল বলল, তুমি পিল খেলে পার। আমার যে কী কষ্ট করে কণ্ট্রোল করতে হয়—

লক্ষ্মীটি রাগ কোর না। আমার জণ্ডিস হয়েছিল। পিল খেলে লিভারটি যাবে—

থাকগে। দরকার নেই পিলে। নাহয় আমি কষ্টই করব।

জয়শ্রী তার গায়ে এসে লেগে গেল। পরম নির্ভয়ে। কষ্ট কর কেন? যা নরমাল তাই হোক।

তা হয় না মিঠু।

খুব হয়।

তুমি পৃথিবী জান না। এস—তোমায় বেগম আখতার শোনাই। বিনোদটা থাকলে ঠিক রেকর্ড চাপিয়ে দিত প্লেয়ারে—থাকবে কি করে! তুমিই তো তাকে বুদ্ধি করে সরিয়ে দিয়েছ। বেচারা এখন সোদপুরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আমাদের জন্যে। আহা!

গানের আগে এস কিছু খাই। যদি কিছু থাকে। খুঁজে দেখতে হবে।

আমার খিদে পাচ্ছে না। তার চেয়ে এস আমরা দু'জনে নাচি। হাত ধরাধরি করে। এখানে তো কেউ নেই। তুমি আমার ধর্ম নেবে?—এমন কথা বলে তোমার এক গল্পের ক্যারেক্টার নাচতে চেয়েছিল না?

সব গুলিয়ে গেল মানিকলালের। সে কোনদিন এভাবে নাচেনি। ভীষণ ভাল লাগছিল তার। একেবারে ডিপ মেলামিশি। ঠিক এখনই তারই লেখা গল্পের চরিত্রের কোন ডায়ালগ তার মনে পড়ল না। সে খতমত খেয়ে বলল, নাচের রেকর্ড তো নেই—

দরকার নেই কোন।

বেগম আখতার—

দেখ। কথায় কথায় তোমার ওই বেগম আখতার আমার আসে না। আমি কিন্তু কিছু ক্যাওড়া আছি। আমার গান হয় না। তবু গাইছি। আশার হিন্দি গান। তুমি আমার সঙ্গে নাচবে—মাজা দোলাবে—এইরকম—

বলতে বলতে মিঠু দুলে উঠল। সেই সঙ্গে গান। ফিরে ফিরে

এক আঁখ মারে তো

রাস্তা রুখ যায়—

বলতে বলতে মিঠু ডান চোখ টিপে মারল।

দুসরা আঁখ মারে তো

জামানা ঝুঁক যায়—

এবার মিঠু বাঁ চোখ টিপে মারল।

এমন একজন মানুষকে আবিষ্কার করে মানিকলাল আনন্দে বিস্ময়ে ভেতরে ভেতরে কোন খনিতে নেমে যাচ্ছিল। যে খনির কোন তল নেই। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—এগুলেন্স!

আর অমনি গ্রিলের তালায় শব্দ হল, দাদাবাবু ?

বিকেল হয়ে এসেছে। মানিকলাল বারান্দায় এসে দেখল, বিনোদ দাঁড়িয়ে ঃ চাপচুপ ভিজে।

আজই আসতে গেলি কেন ? একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে এলে পারতিস।

ঠাকুর তো বীরভূমে। আর তোমার সেই পারিজাত ও পেলাম না।

কেন ?

ঠাকুরের কারখানায় লক-আউট। পারিজাত তৈরি হচ্ছে না। তাই ভাবলাম থেকে কি হবে! চলে এলাম।

বেশ করেছিস। গা মুছে কিছু খা। আমাদের চা করে দে তারপর।

শ্যামবাজারে হোটেলে খেয়ে নিয়েছি।

তোর তো পুরনো হোটেল। পয়সা নিল ?

এখন যে আমি খদ্দের হয়ে সেখানে গেছি। পয়সা নেবে না ?

এমন সময় ঘর থেকে মাথা টাথা ঠিক করে জয়শ্রী বেরল। তাকে দেখে একগাল হাসল বিনোদ। ওঃ। তুমি এসেছ। তাই ভাবি। বসো চা করে দিচ্ছি এখুনি—

থাক্। তুমি আগে গা মোছ। মাথা মোছ। আজ আমি চা করব।

সন্ধ্যের মুখে ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস। বিনোদ বলল, কিচ্ছু ভেব না। খিচুড়ি চাপিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে আলুভাজা—বেগুন ভাজা। খেয়ে শুয়ে থাকবে। এই বৃষ্টিতে কেউ বেরয় ?

মিঠু বলল, তুই যে ঘুরে এলি—

আমি ? একগাল হেসে বিনোদ বলল, আমি যে চাকর! চাকর যখন তখন বেরয়। তার না বেরলে চলে কখন ও ?

খুব বিচক্ষণ গলায় বিনোদ কথা শেষ করতেই মানিকলাল আর জয়শ্রী একসঙ্গে হেসে উঠল।

রাতে গরম খিচুড়ি খেয়ে গ্রিল ঘেরা বারান্দায় বসল দু'জনে। সোফা কাম বেডে। পাশের ঘরে বিনোদ আজ তার আর দাদাবাবুর মশারি টানাচ্ছে। সামনের ঘরে মশারি টাঙানো সারা। সেখানে জয়শ্রী আজ একা শোবে।

বাড়িতে চিন্তা করবে না ? একটা ফোন থাকলে—

করবেই তো। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তো ফোন নেই।

কাছাকাছি ফোন আছে ?

আছে। কিন্তু সেখানে করা যাবে না।

আমি করে দিচ্ছি।

না তা হয় না। সুব্রতদের বাড়িতে ফোন এসেছে। ওর নতুন অফিস থেকে ফোন দিয়েছে।

আমি কথা বলব। বলব—মিঠুদের বাড়িতে একটু দয়া করে জানিয়ে দেবেন—নম্বরটা বল - মনে আছে ?

আছে। তুমি তো কিছুতেই করতে পার না। তোমাকে আমি নম্বরও দেব না।

কেন ?

সুব্রত তোমায় ঘেন্না করে।

কেন ? আমি তার কি করেছি ?

আমি সুব্রতকে সব বলেছি।—এখানে জয়শ্রীর গলা বুজে এল। রাস্তার লাইটপোস্টের আলো ওর মুখে। সেখানে জলের ফোঁটা। আমি তোমার--একথা বলার পর ও তো তোমায় ঘেন্না করতেই পারে।

তাই নিয়ম বুঝি !—এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না মানিকলাল।

পরদিন খুব ভোরে মানিকলাল জয়শ্রীকে রিকস করে বাস স্টপ অবধি এগিয়ে দিয়ে এল। জয়শ্রী ভোরের প্রথম S বাস ধরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে মানিকলাল দেখল, বিনোদ তখনও অঘোরে ঘুমচ্ছে। ঘুমোক। কাল যা বৃষ্টি ভিজেছে। আজ মনে হচ্ছে রোদ উঠবে।

চোদ্দ

রাতে সুপ্রভাত থেকে ফিরে মানিকলাল অবাক হল। বিনোদকে বলল, কি ব্যাপাব রে ? বউদির শরীর খারাপ নাকি ?

বিনোদ বলল ট্রেন জার্নি করে বিকেলে এল। বোধহয় মাথা ধরেছে। বলল, তুমি এলে খাবার দিতে। বউদিদি খাবে না।

তবু মানিকলাল ডাকল। ও বেলা খাবে এস। একা একা খেতে ভাল লাগে না।

বিরক্ত কোর না। আমার মাথা ধরেছে।

একা একা খাওয়া যায়—?

এখন থেকে তাই খাবে।

আর কথা বাড়ল না মানিকলাল। কোন্ ঝড় যে সামনে তার আন্দাজ পেল না। তবে একটা টকঝক যে ওত পেতে আসছে তা সে টের পেল। বিনোদ কিছু ফাঁস করেনি তো ?

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই মানিকলাল দেখল, বেলা জেগে মশারির বাইরে দু'চোখ খুলে তাকিয়ে আছে। কি ব্যাপার ?

সে ডাকল, বেলা—

কোন জবাব পেল না। এবার জানতে চাইল মাথা ছেড়েছে।

এবারও কোন সাড়া দিল না বেলা। তখন মশারি তুলে সে বেলার কাছে গেল। এ কি? তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে?

কোন কথা বলল না বেলা। মানিকলাল তার বুকে মাথা রাখল। রেখে বলল, আমায় বলতেই হবে—

বুজে আসা গলায় বেলা অনেক কষ্টে বলল, ক'দিন ছিলাম না আমি, এর ভেতর এত কাণ্ড হয়ে গেছে—

কিসের?—নিজের গলার স্বরই ভীষণ অস্পষ্ট লাগল মানিকলালের।

একটা তেইশ চব্বিশ বছরের মেয়ে কি বলে কাল রাতে এখানে এসে রাত কাটিয়ে গেল।

বৃষ্টি হচ্ছিল। ছাতা নেই। যাবে কি করে?

বাড়িতে কোন মহিলা নেই। এমন বাড়িতে এসে রাতে থেকে যায় কি করে?

আমি আর বিনোদ তো এঘরে শুয়েছিলাম।

বিনোদ ঘুমোলেই কাদা।

এটুকু বিশ্বাস যদি বিয়ের এত বছর পরেও না কর তো—

বিশ্বাস! বলে জলে ভেজা চোখে বেলা মানিকলালের দিকে তাকাল। সে তার চোখও দুই চোখ থেকে সরাতে পারল না।

বিনোদকে টাকা দিয়ে সোদপুরে পাঠিয়েছিলে?

পারিজাত আনতে—গলার স্বর ফিকে হয়ে এল মানিকলালের। পারিজাতের এত কি জরুরী দরকার ছিল?

এমনি। আমি কি জানতাম—জয়শ্রী আসবে—

ছিঃ! ছিঃ! বিছানা থেকে উঠে বসল বেলা। খাট থেকে নামতে নামতেই বলল, আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। এখন আমি কি করি—

কোন কথা বলতে পারল না মানিকলাল।

সেদিনই দুপুরে মানিকলাল ভাল করে শেভ করল। একটা পাটভাঙা শার্ট গায়ে দিল। তারপর শীতের প্রথম স্যুট—নীল রংয়ের গায়ে চাপাল। ঘি রঙের শার্টের ওপর কালো টাই।

বেলা দেড়টা নাগাদ সে এক বিখ্যাত কোম্পানির বাড়িতে লিফট থেকে সেভেন্থ ফ্লোরে নামল। ঝক্‌ঝক্ করছে চারদিক। সুন্দর সুন্দর টেবিল। একটা খোলা চাতালে বেশ কয়েকজনের মধ্যে গলা বন্ধ কোট গায়ে—চশমা চোখে—একজন ধারাল যুবক মন দিয়ে কিছু ঝুঁকে কাগজপত্র দেখছিল।

বেয়ারার কাছে নামটা বলতেই সে আঙুল দিয়ে ওদিকটাই দেখিয়ে দিয়েছে। ওখানটায় গিয়ে মানিকলালের মন বলল, এই-ই সে। এই-ই সে। চোখের চশমার কাচ খোলা।

বসতে পারি ?

অবাক হয়ে তাকাল যুবকটি। চশমার ওপারে আসল চোখ ধরা যায় না।

আপনি সুব্রত - ?

মজুমদার।

ঠিক জায়গায় এসেছি। আমার নাম মানিকলাল – মানিকলাল মিত্র।

ছেলেটির মুখে কোন রেখাই ফুটল না। মানিকলাল সেখানে ঘেন্নার সুতোও দেখতে পেল না। শান্ত গলায় সুব্রত বলল, আপনি রিসেপশনে বসুন। আর দশ মিনিট বাদেই তো রিসেস –

দশ মিনিট কাটেই না। চমৎকার বসবার জায়গা। শান্ত মুখে ম্যাগাজিন ঘাটছিল মানিকলাল। এক সময় সুব্রত এসে বলল, আসুন –

মানিকলাল লিফটের কাছাকাছি এসে বলল, বাইরে কোথাও কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে –

কাছাকাছি ?

এই ময়দানের আশপাশে। দশ মিনিটে ফিরে আসা যাবে।

চলুন।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে এসে সুব্রত বলল, চলুন – আমার স্কুটারের পেছনে বসতে পারবেন তো ?

চড়িনি অনেকদিন। পারব তো?

কোন ভয় নেই।

স্কুটার রেড রোডে পড়ে এরোপ্লেনের স্পিডে ছুটতে লাগল। মানিকলাল ভয় পেয়ে গেল। সে টাল সামলাতে সামলাতে সুব্রতর কোমর জড়িয়ে ধরল। চোখ বুজে এল।

চোখ খুলে দেখল – স্কুটার তাদের গোয়ালিয়র ঘাটের কাছে নিয়ে এসেছে। পাশেই সেকেণ্ড হুগলী ব্রীজ তৈরি হচ্ছে। তার খাম্বা গঙ্গার বুক থেকে ঠেলে উঠেছে আকাশে।

স্কুটার থেকে নেমে সুব্রত বলল, গোড়ায় আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।

কেন ?

যে ছবি ছাপা হয়—তার চেয়ে আপনি পাতলা হয়ে গেছেন।

আমি কিন্তু তোমায় দেখেই চিনেছি। বলতে বলতে মানিকলাল দেখল, পরিষ্কার আকাশের নিচে ঠাণ্ডা বাতাস আর জল কেটে একটা বড় স্টিমার খিদিরপুরের দিকে যাচ্ছে। তার ধোঁয়া বেশ শাদা।

আমায় অফিসে ফিরতে হবে –

বলছি। কথা একটাই। তুমি আমায় ঘেন্না কোর না সুব্রত।

একথা বলতে এতদূর এসেছেন ?—বলতে বলতে সুব্রত যেন দাঁতের তলা থেকে চুয়িংগাম অন্যদিকে সরাল।

দ্যাখো সুব্রত দার্শনিক আর খুনী সমান মাসিলেস। তুমি নিষ্ঠুর হলে চলবে না। আমায় দয়া কর।

দয়া তো আপনি করতে চাইছেন আমাকে।

আমি দয়া নয় সত্যি কথা বলতে এসেছি। ভালবাসা কোন যুদ্ধ নয় সুব্রত। বোঝার জিনিস। এখনও সময় আছে। খুব দেরি হয়ে যায়নি। তুমি জোর কর। জোর করে আঁকড়ে ধর জয়শ্রীকে। তোমার মিঠুকে। এটা অভিমানের ব্যাপার নয়। এটা অহমিকার জিনিসও নয়। একা একা কষ্ট পাওয়ার—সাফার করার ব্যাপার—

সে কি আপনার কাছ থেকে শিখতে হবে।

আমার তো হ্যাণ্ডিক্যাপ অনেক। আমি কি শেখাব ? আমার সময় তো গোণাগুনতি। তোমার সামনে লম্বা জীবন সুব্রত। আমি তোমার কাছে শিখতে চাই। তুমি জয়শ্রীকে নিজের কাছে টেনে নাও। মিঠু তোমারই—

নাটক করবেন না। এর চেয়ে একটা কুড়োল এনে এই নির্জনে আপনি যদি আমায় অ্যাটাকও করতেন—তাতেও আমি কোন বাধা দিতাম না।—বলতে বলতে সুব্রত মজুমদার তার স্কুটারে স্টার্ট দিল।

সুব্রত। শোন সুব্রত। আমার কথা শেষ হয়নি এখনও—

স্কুটার থেকে সুব্রত ফিরেও তাকাল না। সে কয়েক সেকেণ্ডে অনেক দূরে চলে গেল। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। বাস স্টপ সেই খিদিরপুরের দিকে। অনেক দূর। গোয়ালিয়র ঘাটের উঁচু উঁচু থাম শীতের নরম রোদে ফিকে ছায়া ফেলেছে চাতালে। সবকিছু কত তাড়াতাড়ি ঘটে যায়।

বাম অলিন্দ

আপনার স্ত্রী আপনার বন্ধু নন্।

নিশ্চয় বন্ধু। কিন্তু আমরা তো অনেকদিন এক সঙ্গে পাশাপাশি আছি। দু'জনকে দু'জন অনেকটা জানি। ভালবাসি। আমাদের ভেতর আবিষ্কারের জন্যে ডুব দেওয়ার আর কিছু নেই।—কথাগুলো বলে রঘু সেন ঠিক বুঝতে পারলো না, তার বলা জিনিসটি জয়শ্রী বুঝতে পেরেছে কিনা। সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো। তারই উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছে জয়শ্রী।

কিউবিকলটি এগজিকিউটিভ আর্কিটেক্টেরা ·বাইরে ঘষা কাঁচের ওপর ছোট একটি প্লেট লটকানো। তাতে লেখা—আর সেন, ই. এ.।

ময়দানের উল্টোদিকে 'দি কেভ' নামে ষোলতলা বাড়িটার এগারো নম্বর ফ্লোরের সবটাই সেনটার আর্কিটেক্টসের। ঢুকতেই ডান হাতে সামান্য ক'জনের মত রঘু সেন একা একটি কিউবিকলে বসেন। তারপর সারাটা ফ্লোর প্রায় সবটাই খোলামেলা। ঢালাও ড্রয়িং বোর্ড পাতা। কাচ ইনজিনিয়াররা সেট স্কোয়ার হাতে সেই বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাগজে দাগ টানে। সিগারেটে টান দিয়ে মাথাটা সাফ করার জন্যে দূরে নিচের ময়দানে সবুজ ঘাসের গালিচায় তাকায়। চোখ আরেকটু তুললে ভেড়ানো জাহাজ সমেত গঙ্গা। গাদা বোট। চির চির করে এগোনো লঞ্চ।

তোমার বয়স কত?

ডিসেম্বরে তেইশ হবে। এখন আমি বাইশ প্লাস—

আমার এখন ছাপ্পান্ন রানিং। বলতে পার পঞ্চান্ন প্লাস! এই অবস্থায়—

এই অবস্থায় কি?

আমার যা বয়স—তাতে কি তুমি আমার বন্ধু হবে জয়শ্রী।

জয়শ্রী ডান দিকে ঠোঁট কুঁচকে হাসলো। তাতে ওর মুখখানা রঘু সেনের আরেকটু ভাল লাগল। গলায় কোন গহনা নেই। কানেও নেই। বাঁ হাতে নেল পালিশ। ডান হাত শাদা। একজন আর্কিটেক্টের কোনো কিছুই এড়াবার কথা নয়। মাথার চুলটি বেঁধে রেখেছে রবারের গার্ডার দিয়ে। গালের ঝিক দুটি স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য উঁচু। নাকের পাটা দুটো চাপা। চোখের মনির বাইরেটা শামুক-ভাঙা নীলচে শাদা।

কেমন বন্ধু?

এই ধরো তোমার সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে তর্ক করবো। আমি তোমার খোঁজ নেব। তুমি আমার খোঁজ নেবে। এক সঙ্গে কোথাও গিয়ে খাবো। কোন বই পড়লে তোমায় তার ভেতরটা জানাবো,—ধরো দু'জনে খালের ওপর কাঠের একটা নড়বড়ে সেতু পার হলাম।

এ সব তো আপনার স্ত্রীও পারেন। তার সঙ্গেও হতে পারে আপনার।

পারেন না।

কেন?

তিনি একজন স্ত্রী জয়শ্রী। দুই ইনজিনিয়ার, এক ব্যারিস্টারের মা। গম্ভীর, সুখী। তার নিজের অধিকারে এলাকাগুলো পাহারা দিতে দিতে কবে ঘুমিয়ে পড়েছেন?

তার মানে? বুঝলাম না—

এই ধরো—আমার জামায় বোতাম লাগাতে পাঠানো, বড় বউমার পরীক্ষা হলে টিফিনে খাবার পাঠানো, বাড়ির হয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা, লকার থেকে গয়না তোলা কিংবা ধরো দোতলা থেকে একটা ছোট ছাদ বের করে ঢালাই করানো—এ সবই আমার স্ত্রী করান, এগুলো করানোও দরকারী, কিন্তু—

কিন্তু কি?

আমার সঙ্গে একখানা বই পড়ার আনন্দ, একটা কিছু দেখার সুখ, জানার আহ্লাদ, পরিশ্রম করেও হেরে যাবার দুঃখ কেউ যদি ভাগ করে নেয়, ভাবনায় ভাবে, হাসিতে হাসে—

তার মানে মোসাহেব গোছের তো।

আরে না না। মতে না মিললে ঘোর তর্ক হোক। তারপর হেরে গিয়ে তার মতে আমি সায় দেব জয়শ্রী। আমার জীবনে তো কিছুর অভাব নেই সবই আছে। সেটাই আমার অভাব জয়শ্রী। তুমি আমার এ-রকম জীবনে নুনটুকু হয়ে উঠতে পারো। নয়তো সবই কেমন আলুনি লাগছে।

পারি কি! আপনি আমার চেয়ে কত বড়। কত দিকে সফল—

তা ঠিক। আমার জীবনে অনেক কিছু হয়ে যাবার পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা। তোমার তো এখনো কিছুই হয়নি। বলা যায় জীবন শুরুই হয়নি। আর আমায় দ্যাখো—আমার ছেলেরাও ইনজিনিয়ার। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে সবে। আমার মেয়ে ব্যারিস্টার। তারও প্র্যাকটিস জমে উঠেছে—

আমারও কিছু কিছু হয়েছে। আমার মা চলে গেছেন। বাবা একাত্তরে বড় চাকরি করতেন এক সময়। এখন জনসেবায় মশগুল। ভাই ব্যাংকে আউট করে। আমি কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পড়ছি।

তোমার বয়ফ্রেণ্ড নেই?

থাকবে না কেন?

তাহলে কি আর তুমি আমার বন্ধু হবে?

হব না কেন? আমার মেজোকাকা—এই আটচল্লিশ, অনেকটা আপনার মত—তবে আপনি বেশি ভারি।

আমি কি সপ্তাহে দু' কেজি করে ওজন কমিয়ে ফেলবো।

অতটা দরকার নেই। এমনিতেই বন্ধু হতে তো কোন অসুবিধে নেই। জানেন, ছোটবেলায় এই আড়ি—এই ভাব লেগেই থাকতো আমাদের খেলা-ধুলোয়। বড় হয়েও দেখছি সেটা আছে তাহলে!

আমার তো মনে হয়—বড় হয়ে মানুষের কাছে আড়ি-ভাব আরও জরুরী। তোমার চিঠিখানা পেয়ে আমার ঝিমুনি কেটে গেল। আমি ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। একটি মেয়ে আমার তৈরি নানান বাড়ির স্থাপত্য দেখে আমায় চিঠি লিখছে—এটাই আমার কাছে জেগে ওঠার পক্ষে একটা থ্রিল।

কেন? আমার আগে কেউ চিঠি লেখেনি আপনাকে?

অনেকে লিখেছে। কোনদিন আমাদের বাড়ি গেলে তোমায় দেখাবো। আমি একটা ড্রয়ারে ও-সব চিঠি রেখেছি।

তাহলে?

তোমার চিঠিতেই সবচেয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা বলেছো। হাইকোর্ট এক্সটেনশনের নতুন আর্চ কীভাবে পুরনোর সঙ্গে মেশানো হয়েছে,—এ এক শুধু তুমিই বললে। তুমিই তুললে প্রশ্নটা।

আহা! আপনি আমায় লজ্জায় ফেলছেন। আমি আর্কিটেকচারের কিছু জানি?

তুমি আমার ঠিকানা পেলে কোথায়?

ফোন গাইড থেকে।

দি কেভ নামে অতিকায় বাড়িটার বারো তলায় অথবা ইলেভেনথ্‌ ফ্লোরে তখন সবে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। একটু বাদেই ছবির মত ভিক্টোরিয়া সমেত মায়াবী ময়দান জানলায় মুছে যাবে। পড়ে থাকবে হলুদ জল, হলুদ জাহাজ, হলুদ জ্যোৎস্নায়। হলুদ গঙ্গায়।

লিফটে নিচে নেমে এসে রঘু সেন বলল, আমার খানিকটা হাঁটাও দরকার। চল তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

আপনার গাড়ি কোথায়?

ডাক্তারের পরামর্শে তিন বছর হল বেচে দিয়েছি। পারলেই হাঁটি। জল খেলেও মোটা হচ্ছি।

তাতে কোন কষ্ট নেই তো আপনার? চলাফেরায়?

একদম না। তবে আগে দেখতে ভাল ছিলাম।

—দেখেছি।

কি করে দেখলে? তোমার তো দেখার কথা নয়।

ছবিতে দেখেছি। বেশ পাতলা ছিলেন।

চোখে চশমা তো। ট্রাউজারের ভেতর শার্ট গোঁজা ছিল।

হুঁ। সাত আট বছর আগেকার ছবিই হবে মনে হল।

না জয়শ্রী। আরও আগের। টোকিওর রাস্তায় তোলা। দেখো—তুমি আমার বন্ধু হয়েছো তো—এবার আমি আবার পাতলা হয়ে যাব। আমার আবার নানা ব্যাপারে ইচ্ছে জাগবে।

চলি আমি।

এখানে তোমার বাস?

মিনিবাস।

তুমি উঠতে পেরেছো দেখি আগে।

একটু বাদে একটি মিনিবাস এল। জয়শ্রী তাতে টুক করে উঠে গেল। মিনিবাসটা প্ল্যানেটোরিয়াম বাঁয়ে রেখে বাঁক নিল।

রঘু সেন—বিশদে রঘুনাথ সেন এই টুক করে ওঠা টুকু মন দিয়ে দেখলো। সে বহুকাল হলো কোন অল্পবয়সী মেয়েকে হরিণের মতো এমন তড়িতে ও শোভনভাবে বাসে উঠতে দেখেনি। দেখেনি - কোন মেয়ে তার সামনে চেয়ারে বসে ঠোঁট একদিকে টিপে সামান্য হাসছে আবার গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। যা কিনা জয়শ্রী এতক্ষণ তার সামনে চেয়ারে বসে করেছে। আর তা দেখে রঘুনাথ সেনের অজানা জিজ্ঞাসা মেশানো একটা কৌতূহল আগাগোড়া কাজ করেছে।

শরীরটা এই পৃথিবীতে পুরনো হয়ে আসায় রঘু সেনের মনের ভেতরটা অনেকদিন হল মেঘ করে থাকে। অনেকদিন সেখানে রোদ ওঠে না। কোন কিছুর ইচ্ছে হয় না। কৌতূহল জাগে না। আজ জয়শ্রী সেই কৌতূহল চনমনে করে তুলেছে। আগের চেয়ে অনেক জোরে পা ফেলেছে রঘু। তখন পাশে পাশে হাঁটছিল জয়শ্রী। যেন কতকালের সঙ্গী। অথচ আলাপ আজই।

শ্রদ্ধেয় রঘুনাথ সেন সমীপেষু,

মহাশয়,

আমি আপনার একজন অতি সাধারণ অথচ একনিষ্ঠ গুণগ্রাহী। কৈশোরের উন্মেষকাল হইতে অদ্য যৌবনের মধ্য পর্যায়ে আসিয়াও আপনার কাজ—তাহার মর্মের লিপি সমানভাবে পাঠ করিয়া আসিতেছি।

আমি বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক। বর্তমানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠনপাঠন করিতেছি। কিন্তু বাণিজ্য শাখার নীরস শুষ্ক মরুভূমিতে আপনার স্থাপত্যের উদার গঠনশৈলী কী পরিতৃপ্তি, কি নিবিড় আনন্দ আনিয়া দেয় তাহা ভাষায় কিরূপে বর্ণনা করিব।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অদ্য ত্রয়োবিংশ বয়স পর্যন্ত গোপনে এবং প্রকাশ্যে, শাস্তির বোঝা মস্তকে লইয়া অথবা সকলের সানন্দ অনুমতিতে আপনার প্রায় সকল কাজই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি, -যাহা আর কি কলিকাতায়

আছে। তন্মধ্যে তিনটি বিশেষ কাজের বিশেষ অংশের কথা আপনাকে না জানাইয়া পারিতেছি না। আমাদের গৃহে ভারতীয় স্থপতি ফেডারেশনের বার্ষিক স্মারক গ্রন্থটি আছে। তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তিন দরোজার ছবি রহিয়াছে —যাহা কিনা আপনার সৃষ্টি।

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ হইতে বইটি খরিদ করিয়া আনেন। যাহাই হোক, ছবিতে আছে তিন দরোজার মাথায় এক বিলোল যক্ষিণী। কি বলিব, আজও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ঢুকতে গেলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অনুভূতির চরমে না পৌছলে এমন স্থাপত্যের নিদর্শন দাঁড় করানো সম্ভব নহে।

ধন্য আপনার অনুভবশক্তি! এমত আরও কতশত উদাহরণ ছড়াইয়া আছে সারা শহরময় - সারা দেশে, আপনার দীর্ঘ জীবনের কত শত কাজে।

আমার মাতা ঠাকুরাণী আমার পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। তিনি বলিতেন, কাহাকেও ভালোবাসার অর্থ তাহার ভালোতে বসবাস করা। ইষ্টদেবের কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন শান্তিতে, স্বস্তিতে জীবন যাপন করেন। আপনার সুখেই আমার আনন্দ নিহিত থাকিবে।

পূজ্যপদে প্রণাম এবং কনিষ্ঠদিগকে স্নেহাশীর্বাদ জানাইলাম।

প্রণতা

কুমারী জয়শ্রী বসু

এই চিঠিখানি ডাকে পায় রঘু সেন। পেয়ে সাইকেল পিওনের হাতে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল জয়শ্রীকে।

কী আশ্চর্য। তোমার এত কম বয়স। আর লিখেছো কোন ভাষায়?

ইচ্ছে করে গুরুগম্ভীর ভাষায় ধরে ধরে লিখেছি। আপনার বয়সের সঙ্গে তাল রেখে লেখা চিঠি।

আমি কোন বাঁধনের বন্দী নই জয়শ্রী।

এ ভাষাটা খারাপ কিসের?

কেমন যেন কপালকুণ্ডলার ভাষা মনে হল। এই ভাষায় তো তুমি আর লেখো না।

না। তা লিখি না।

কাল সন্ধ্যেবেলা জয়শ্রীকে বাসে তুলে দিয়ে আসার পর থেকে বার কয়েক এই চিঠিখানা বার দশেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়েছে রঘু। একতলায় তার শোবার ঘর, স্ট্যাডি, স্টুডিও এক লপ্তে। গায়ে বাগান। বাগানে ছোট ছোট গাছে কিছু পাখি আসে। তাদের ডাকে ঘুম থেকে উঠে রঘু সেন আবার চিঠিখানা পড়ে দেখল।

তার এতই বয়স যে, জয়শ্রীকে সওয়াশো বছর আগের বঙ্কিমী ভাষা ধার করে চিঠি লিখতে হয়েছে ?

পুরনো দিনের সেনবাড়ি। তার একটা অংশ নিয়ে রঘু সেনের ফ্যামিলি। অংশটাও এই পুরনো বাড়িতে কম নয়। ভাগ করা যায় না—এখন এক তেতলা আর উঠোন, বাগান রঘুর ভাগে পড়েছে। রঘুর বসবাসকে কেন্দ্র করে বাড়িটা দু'ধারে স্কুল বাড়ির মত ছাড়িয়ে পড়েছে। বাড়ির সামনেই সি আই টির বাজার।

স্টুডিওর খানিকটা মেঝে টালির। তারপরই মাটি। ঘিয়ে রংয়ের টালির মেঝেতে বৌদ্ধযুগের একটি অলিন্দের প্লাস্টার অব প্যারিস পড়ে আছে। আর তার পাশেই মাটির মেঝে ফুঁড়ে উঠেছে একটি তেজী পেয়ারা গাছ। ওপথ দিয়ে যেতে গেলে প্রায় ঘরের ভেতর বেড়ে ওঠা গাছটাকে চোখে পড়বেই।

বাড়ির এই অংশটাই আলো বাতাসে ভরপুর। রঘু সেনেরও পছন্দ। ছেলেরা চেতলায়। মেয়ে দোতলায়—তার চেম্বার মেজানিন ফ্লোরে, এ সি লাগানো। গ্যারেজে এখন মেয়ের গাড়িই থাকে। পাড়াটা পুরনো। আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে নতুন হয়ে যাচ্ছে। রঘুদের শরিকরাও পাল্টাচ্ছে।

বেলা দশটা নাগাদ ভেতর বাড়ি থেকে সাবিত্রী সেন প্রবল বেগে স্টুডিও মাড়িয়ে রঘুর ঘরে এসে ঢুকলো। বালিশের ওয়াড়গুলো দাও—নোংরা হয়েছে, কাচতে দেব, বলতে বলতে রঘু সেনের হাতে চোখ পড়ল।

কার চিঠি ? দেখি দেখি—

হাত সরিয়ে নিল রঘু সেন। বুঝবে না। জবরজং ভাষায় লেখা। একটি মেয়ে লিখেছে আমার কাজ দেখে—

চিঠিখানা হাতে নিয়ে সামান্য পড়েই হোঁচট খেল সাবিত্রী সেন। রঘুকে ফেরৎ দিয়ে বলল, চেয়ারের ঢাকনাগুলোও দাও। এত নোংরা হয় কি করে ? বলতে বলতে সেই স্বরেই বলল, মেয়েটা তো এঁচোড়ে পাকা। গুরুগম্ভীর ভাষায় লিখে নিজের বয়সটা ভাঁড়াতে চেয়েছে—

ও কথা বলছো কেন সাবি ? নিজের বয়স লিখে দিয়েছে চিঠির ভেতর।

ওমা! চিঠিতেই এত টান ? কত বয়স লিখেছে ?

তেইশ—

তেইশ ? তাহলে তো আমাদের খুকার চেয়েও বেশ ছোট। বলে মনে মনে হিসেব কষলো, প্রথম সন্তান খুকীর এখন তেত্রিশ। সেই ব্যারিস্টারি করছে। তারপর দুই ছেলে। দু'জনই ইনজিনিয়ার। সাবিত্রীর বেশ কম বয়সেই কম বয়সী রঘুর সঙ্গে বিয়ে হয়। বাচ্চাও হয়েছিল কম কম বয়সে।

বিখ্যাত সেন পরিবারের এজমালি বাড়ির নানান ঘরে নানান রকমের চিড়িয়া। কোন ফ্যামিলি উন্নতি করে ভাগ্যের চাকায় ওপরের দিকে আছে। যেমন রঘুনাথ সেনের ফ্যামিলি। আবার কোন পরিবার তলিয়ে যেতে যেতে

ভাগ্যের চাকায় ঢালু দিকে—যে কোন সময় পিছলে পড়ে যেতে পারে। রঘুনাথ নিজে আর্কিটেক্ট, ছেলেরা ইনজিনিয়ার, তাই পুরনো বাড়ির অংশটুকু ভেঙে, ঢেলে রং করে বাহারি করে রেখেছে। তাতে জায়গায় জায়গায় লতাপাতা, তারের মিহিজাল, ঝুলন্ত টব-চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে পায়ের নিচে কার্পেট, মাথার ওপর ঝুলন্ত ঝাড় বাতি।

সাবিত্রী রঘুনাথকে বলল, মিশছো মেশো, দেখো—এই বয়সে মেয়ের চেয়েও ছোট একটা মেয়েকে নিয়ে ভীমরতি যেন না হয়।

রঘুনাথ কোন জবাব দিল না। সে তার এই একতলার শোবার ঘরে ঘুমোয়। স্টাডিতে পড়ে। পাশের টেবিলে সেট স্কোয়ার ফেলে লাইন টানে। স্টুডিওতে নানান আয়তনের কাঠের ব্লক সাজিয়ে কল্পনায় বানানো বাড়িগুলো প্রাথমিকভাবে এক চক্কর দেখে নেয়।

যে কোন বাড়িই যে আসলে ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে বানিয়ে তোলা দরকার—এটা অনেকের মাথাতেই আসে না। আলো হাওয়ার কথাও সেই সঙ্গে মনে রাখার। জয়শ্রী কী করে বুঝলো, পুরনো হাইকোর্টের খিলানের সঙ্গে, গম্বুজের সঙ্গে আমি সমতা রেখে এক্সটেনশনের অংশটুকু কল্পনা করেছি? ওর তো বোঝার কথা নয়। নিজে নিজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তিন দরোজা লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করেছে বিলোল যক্ষিণীকে।

জয়শ্রীর দাদার নাম জয়ন্ত। সামান্যই বড়। বছর তিন চারের। ভাইবোন দু'জন বাড়ির সামনের বারান্দায় বসে। পাশেই করপোরেশনের পার্ক। সকাল বেলা। জয়ন্ত চা খেতে খেতে বলল, বাবা কোথায় রে -

কোন্ ধোপার মাঠ আছে এখানে—

হুঁ। এল আই সি কোয়ার্টারের পরেই। এখন অবশ্য ধোপারা থাকে না। কোন একদিন থাকতো।

ওখানে কী একটা বাড়ি উঠছে। বাবা সবাইকে নিয়ে বাধা দিতে গেল সাত সকালে। ল্যাণ্ডস্কেপ নষ্ট হবে নাকি, খাবার জলে টান পড়বে, তাই—

ওঃ। নিজের এই বাড়িটি করার সময় যদি আরেকটু এগিয়ে বড় রাস্তায় করতেন, তাহলে বাস থেকে নেমে আমাদের এতটা হাঁটতে হত না।

জানিস দাদা-একজনের সঙ্গে আলাপ হল, তিনি আবার হাঁটবার জন্যে নিজের গাড়িটি বেচে দিয়েছেন।

জয়ন্ত চোখ তুলে তাকালো। কার কথা বলছিস? অনেকে ডাক্তারের পরামর্শে হাঁটেন।

কোন্ রঘু সেন?

কোন্ রঘু সেন?

বাড়ির ছবি ভর্তি বই কিনে এনেছিলি তুই—

ও তো লোকটার হাতের কাজ সারা কলকাতায় ছড়ানো। দিল্লিতে এশিয়াডের বড় স্টেডিয়ামটাও ওঁর পরিকল্পনা। কোথায় আলাপ হল?

ফোন গাইডে ঠিকানা দেখে আমিই চিঠি দিয়েছিলাম।

এর পর জয়ন্ত কী বলল শোনা গেল না। একটা দশ চাকার লরি সব কথা চাপা দিয়ে চলে গেল।

তখন ধোপার মাঠে লোকে লোকারণ্য। একদিকে ঠিকাদারের লোকজন, অপর দিকে লোকাল মানুষজন নিয়ে ঢ্যাঙা মত প্রায় বুড়ো এক লোক হাত তুলে চেঁচাচ্ছে। ওদের মাঝে পুলিশ দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবার মাথার ওপরে পাইলিংয়ের দুরমুস করার কপিকল ঝুলছিল।

এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল রঘু সেন। নেমেই দৌড়ে পুলিশের কাছে ছুটে এল। হাতে একখানা কাগজ।

এই যে, কোর্ট থেকে ১৪৪ ধারার অর্ডার হয়েছে। শান্তিভঙ্গ করা বন্ধ করুন। ডিউটি আফিসার কে আছেন?

রঘুর কথা শেষ হতেই ঢ্যাঙা লোকটি এগিয়ে এল। আপনিই তো অশান্তি করছেন।

রঘু সেন একটুও ঘাবড়ালো না। পরিষ্কার বলল সে কথা পুলিশ বুঝবে।

পুলিশ ততক্ষণে লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে এসেছে। ঢ্যাঙা লোকটি তখনো চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছে—আপনি একজন শিক্ষিত ইনজিনিয়ার হয়ে—

আমি আর্কিটেক্ট।

ওই হলো। এখানকার জলের সঞ্চয় ফুরিয়ে ফেলবেন, জরুরী স্পেসে টান পড়বে উঁচু বাড়ি হলে—আপনি কি বোঝেন না?

পুলিশ এসে ধস্তাধস্তি শুরু করলো। তার ভেতর রঘু সেন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, সব বুঝি। জানেন কম। ভাবেন বেশি আপনারা।

আর কথা এগোতে পারল না। পুলিশ টানতে টানতে ঢ্যাঙা মত সবজান্তাকে ভ্যানে তুলছে। লোকটার মাথা ভ্যানের ছাদে ঠেকে যাচ্ছে।

খেতে বসে জয়ন্ত জানতে চাইল, কী কথা বলাল লোকটার সঙ্গে?

জয়শ্রী বলল, আমি কথা বলার বিশেষ চান্স পাইনি। শেষে বলল, আমার বন্ধু হবে?

সে আবার কি? তোর চেয়ে তো অনেক বড়।

আমার সঙ্গে কথা বলে আর কি রিলাক্স করবেন। মাথার জট ছাড়বেন।

জয়ন্ত বলল, দিল্লিতে পার্লামেন্ট স্ট্রীটে একটা হিলকের মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়ে সেখানে একটা ফোয়ারা বের করেছেন একদিকে, আরেক দিকে অডিটোরিয়াম। ছাদের কোন কার্নিস নেই। জানলাগুলো রাজস্থানী পেইন্টিং থেকে নেওয়া

মনে হবে। দেখেই চিনেছি রঘু সেনের—

তোর সঙ্গেই আলাপ হলে ভাল হত দাদা।

তার কোন মানে নেই। এ সব জিনিয়াস তোদের মত মেয়ের সঙ্গে কথা বলে মাথার জট ছাড়াতে ভালবাসেন।

তার মানে ?

বেশ বোকাসোকা। যা বলবেন, চুপ করে গিলে যাবি।

ভাল হচ্ছে না দাদা

বাবা তো ফিরলো না এখনো।

একবার বেরিয়ে ত্থাখ না দাদা। এই রোদে ওঁকেই যে আন্দোলন করতে বেরোতে হবে তার কোন মানে আছে ?

খোলা দরজা দিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা সেই ঢ্যাঙা লোকটা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, পৃথিবীর অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই নিরঞ্জন বোস ছাড়া কে যাবে--

এ কি বাবা ? তোমার জামা ছিঁড়ে গেছে—

জুতোও ছিঁড়েছে। খিদিরপুর ব্রিজের ওখানে গিয়ে পুলিশের গাড়ি নামিয়ে দিল। পয়সা পড়ে গেছে। ট্যাকসি পাইনি। হেঁটে ফিরলাম। এ পাড়ায় এতগুলো নামী দামী লোক থাকে। সবাইকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর দিয়েছিলাম কেউ যায়নি। অথচ পৃথিবীতে দিনকে দিন অক্সিজেনে টান পড়ছে। আলো আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। জল ফুরিয়ে আসছে। কারও খেয়াল আছে ?

এ সব শুধু তুমি একাই খেয়াল কর বাবা ?

ছেলের এই ঠাট্টা মেশানো তেরিয়া ভাব দেখে জয়ন্তর মুখের দিকে তাকালো নিরঞ্জন। এগারো বছর হল রিটায়ার করা একজন পেনসনপুষ্ট সটান আধবুড়ো। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। সেই চোখ কথা বলার সময় ঝকমক করে ওঠে। নিরঞ্জন বোস বলল, অনেক কষ্টে হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষের ধারার পর ধারা একটা সভ্যতায় এসে পৌঁছায়। সেই সভ্যতাই মরে যেতে বসেছে। বাতাসে টান। আলো বাড়ন্ত। ধুলোয় ফুসফুস বুজে আসার জোগাড়। আর আমি চোখ বুজে থাকবো ?

জয়শ্রী বলল, খেয়ে নাও বাবা।

দাঁড়া। হাত পা ধুয়ে আসি আগে। কলকাতার বাইরে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখবি—কলকাতার আকাশে ময়লা ধোঁয়ার একটা রিং ভাসছে। এই হাঁসুলি একদিন নেমে এসে সারা শহরের গলায় ফাঁস দেবে। বাতাসের জন্যে এখুনি আমাদের ফুসফুস একস্ট্রা পাম্প করে। বিশ বছর আগে এতটা পাম্প করতে হত না। আর পাঁচ বছর পরে ওভারটাইম খেটে খেটে ফুসফুসগুলো ধ্যাড়ধেড়ে মাফলারের মত হয়ে যাবে। তখন ? তখন কি হবে ?

জয়ন্ত সভ্যতা, বাতাস এসব নিয়ে অত ধার ধারে না। তাই বলে তুমি এই বয়সে অ্যারেস্ট হয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠবে?

দরকার হলে ধর্না দেব। শুয়ে পড়ে আটকাবো ওদের। তার জন্যে পুলিশ মারলে মারবে। ফুসফুসগুলো শেষকালে আ-ছাঁকা রক্ত বমি করবে যে—

দাদা চুপ করতো। আর বকাস নি বাবাকে। খেয়ে নিক।

খেতে বসে নিরঞ্জন বোস ছেলে আর মেয়েকে দেখলো। আজ কী একটা ছুটির দিন—তাই দু'জনেই বাড়িতে। এদের সামনে এখনো লম্বা বয়স। কী করে বাঁচবে এই পৃথিবীতে? তার নিজের অনেকদিন বাঁচা হয়ে গেছে।

এখন নিরঞ্জন বোস পৃথিবীর গন্ধ পান। পুরনো বাড়ির গন্ধ পান। পাড়ার লোক আফিসে চলে গেলে শুনশান রাস্তাঘাট, পার্ক, বারান্দার, আলাদা একটা গন্ধ পান। যেন বাতাস শুকিয়ে আসার অদ্ভুত এক গন্ধ পান। তখন নিরঞ্জনের নাকের পাটার ভেতরেও যেন রুক্ষ এক খোচা এসে লাগে।

নিরঞ্জনের খাওয়ার মাঝামাঝি জল এগিয়ে দিয়ে জয়শ্রী বলল, বাবা—একজন আর্কিটেক্টও তো এই সভ্যতার অংশীদার।

খাওয়া থামিয়ে মেয়ের মুখে তাকালো নিরঞ্জন। কি বললি?

একজন স্থপতির হাতের ছোঁয়ায় সভ্যতা সুন্দর হয়ে ওঠে।

একসময় হয়তো উঠতো। এখন তেমন স্থপতি কোথায়?

কেন? এই যে এত সব নামকরা স্থপতি—

তারা তো আশপাশের মানুষকে মানুষই মনে করে না। শুধু সামান্য কিছু লোকের জন্যে আলোতে হাওয়াতে বড় থাবা বসাচ্ছে—এমনই তাদের ঘরবাড়ির প্ল্যান আর ডিজাইন। কলকাতার দিকে তাকা। বড় বড় পুরনো বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে মাটির ভেতর শালবল্লা গাদিয়ে দিচ্ছে। তার ওপর উঠছে দশতলা-বিশতলা। ওপরের ওজনটুকু—ওপরের ধুলোহীন আলো-টুকুতে ভাগ বসাচ্ছে সামান্য কয়েকজন ভাগ্যবান। বাকি আমরা তলায় বসে অন্ধকারে ধুঁকছি। বাড়ি করার অধিকার আছে বলে এজমালি আকাশ বাতাস লুটে-পুটে খাওয়ার লাইসেন্স তো কেউ দেয়নি জয়া—। সূর্যের আলো, উঁচুর বাতাস—এসবও রেশন করে দেবার অধিকার ওদের কে দিল? এই পৃথিবীতে আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি?

জয়শ্রী আর কথা বাড়াল না। সে বুঝেছে—নিরঞ্জনের সব চেয়ে নরম জায়গায় সে হাত রেখেছে। তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলের জন্যে বলল, আরেকখানা মাছ দেব বাবা?

সবার হবে?

আর কে? সবাই তো আমরা খেয়ে নিয়েছি।

'দি কেভ' বাড়টার ইলেভেন্থ ফ্লোরে বিকেলবেলা জরুরি বৈঠক বসল। রঘু

সেনদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলল, ধোপার মাঠে পাবলিক অ্যাটেনশন অতটা অ্যাট্রাক্ট না করেও কাজ করা যেত।

রঘু সেন জানতে চাইল, কেমন করে?

শালবল্লার পাইলিংয়ে না গিয়ে সিমেণ্টেশন করা যেত—

তাহলে আশপাশের কন্সট্রাকশনে ফাটল ধরতোই একদিন।

এখানে তো তা ধরা পড়তো না। এই যে কপিকল থেকে দুরমুশ মেরে শালবল্লা গাদাতে যাওয়া হল—তার রেজাণ্ট!—বিকট আওয়াজে আমরা সবার নজরে পড়ে গেলাম!! অ্যাজিটেশন শুরু হয়ে গেল। আলো বাতাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কলকাতার ফুসফুসে বাতাসের টান পড়বে!! ফিফথ্ ফ্লোরের ওপর থেকে প্রি-কাস্ট্ স্টিল বাড়িয়ে দিয়ে ফ্লোরের হাইট তো আমরা অনেকটা কমিয়ে আনতে পারি।

রঘু সেন হাসলো। তাতে বাড়টা কিছু বেঁটে দেখাবে ঠিকই। কিন্তু আলো হাওয়া ভাল খেলবে না।

এমনিতেও তো লোকাল পাবলিক একই অভিযোগ তুলেছে। তখন আর এগারো ফুট ছ'ইঞ্চি সিলিং রেখে লাভ কি সেন?

বাড়িটা বেঁটে দেখিয়ে আপনাদের লাভ?

বলতে পারবো আকাশকে অতটা ছেড়ে দিয়েছি।

রঘু সেন বলল, তখন বাড়িটা কেমন দেখতে হবে। একবারও ভেবেছেন? একদম গজকচ্ছপের মত দেখাবে। নিচেটা থ্যাবড়া। ওপরটা কে যেন হাতুড় মেরে থেঁতলে দিয়েছে। সে এক বিতিকিচ্ছিরি—

হোক না একটু বিতিকিচ্ছিরি। ধরছে কে আমাদের?

চোখই ধরবে। পাবলিক - সাধারণ মানুষ অসুন্দর জিনিস দেখেই চিনতে পারে জানবেন। প্রতিটি বাড়িরও একটা শরীর আছে। তার মুখ আছে। রূপ আছে। জেনেশুনে তা আমি কদাকার করতে পারবো না।

খানিক বাদে দেখা গেল আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজ থেকে একটা গাড়ি উঠে এসে তার পেটের ভেতর রঘুনাথ সেনকে তুলে নিল। ছুট লাগালো রেড-রোডের দিকে। রেডরোডে পড়েই রঘুকে ঘাসের ওপর উগলে দিল।

রঘু সেন হাসছিল আর মনে মনে অঙ্ক কষে দেখছিল—প্রত্যেক ফ্লোরে যদি এগারো ফুট চার ইঞ্চির জায়গায় সিলিং হয় দশ ফুট দু ইঞ্চিতে—তাহলে মোট সতের তলায় সতের খানা ছাদ সমেত আকাশ কতটা রেহাই পায়।

আবার এ-কথাও সে মনে করতে পারলো-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথা মত সিমেণ্ট পাইলিং করলে-সবটাই লোকচক্ষুর আড়ালে নির্জনে হতে পারতো ঠিকই—কিন্তু বাড়িটার নিজস্ব কোন ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা যেতো না। কেননা, সিমেণ্টেশন হলে মাটি খুঁড়ে পাইপ নামাবার জায়গাই পেত না।

এমন একটা বাড়ি বানাতে পারেন না,-যে বাড়ি আলো, হাওয়া আটকাবে না ? জয়শ্রীর এ কথায় রঘুনাথ বলল, তুমি তো সেদিনকার এক অ্যাজিটেটরের ভাষায় কথা বলছো !

কোন্ অ্যাজিটেটর ?

ধোপার মাঠ বলে এক জায়গায় একটা বাড়ি উঠছে। আমরাই তার আর্কিটেক্ট।

ওর কাছাকাছি আমাদের বাড়ি।

ওখানে একজন লম্বা মত,—বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের—লোক ক্ষেপিয়ে ধর্ণা দিয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন,—আমাদের কোম্পানিও সেকি হয়ে পড়েছে—

জয়শ্রী বলল, লম্বা মতন তো—

হুঁ। তুমি দেখেছো নাকি ?

ভদ্রলোক আমার বাবা। বলেছিলাম না,—জনসেবা বাবার নেশা—

রঘুনাথ সংযত হয়ে গেলেন। চাপা গলায় বললেন, রোজই মানুষের ভাঁড়ারে টান পড়ছে। কেননা রোজই নতুন নতুন মানুষ জন্মে চলেছে। তবু ওরই ভেতর জায়গা করে নিয়ে-বাতাস করে নিয়ে-আলোর সুবিচার করে কেউ যদি বাড়ি তোলে তাতে বাধা দিতে হবে ?

জয়শ্রী কোন কথা বলল না। সন্ধেবেলার অর্ডনানস ক্লাবের মাঠ। অল্প আলোয় মুখ দেখা যায় সামান্য। বেয়ারাদের আনাগোনা। কাছেই জেটি। সেখান থেকে সামান্য ভোঁ লোহার শেকল টানার শব্দ কানে আসে।

জয়শ্রী কোন কথা বলছে না দেখে রঘুনাথ জানতে চাইল, মিস্টার বোস কি করেন ?

এখন তো রিটায়ার্ড। জার্ডিনে ছিলেন—

কি করতেন সেখানে ?

ওদের চা বাগানের বিপদ হলে বাবা ছুটে ছুটে যেতেন আসামে। পাহাড়ি নদী তো সব। বন্যা হলে বালির সঙ্গে পাথর ঢুকে যেত বাগানে। তাছাড়া বাগানের কিছু হলে বাবাই কলকাতা থেকে ওষুধ সমেত টিম পাঠাতেন। চা-গাছ,—তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস—ওর কাছে একেবারে মনপ্রাণ ছিল।

এখনো ?

অনেকদিন হলো তো রিটায়ার করেছেন। এত ছেলেমানুষ বাবা,—কি বলবো আপনাকে। বাবা মনে করে টেবল-চেয়ার-ট্রানজিস্টর-হ্যাণ্ডব্যাগ-এদেরও প্রাণ আছে। সবকিছু প্রাণময়।

আচ্ছা ?—বলে খেয়াল হলো রঘুনাথের—সে যখন কোন বাড়ির নকশা কল্পনা করে—তখন জমিতে কোন ঢিবি থাকলে—তাদেরও উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে তবে সে বাড়ির ছবি তৈরি করে। এমনকি কোন্ দিকে মেঘ উঠবে আকাশে

—বাড়ির কোত্থেকে সে-মেঘ চোখে পড়বে, তাও ভাবতে হয় তাকে। রঘুনাথ বলল, আলাপ করতে হয় তোমার বাবার সঙ্গে—

বেশ তো। আসবেন। বাবা বেরিয়ে না গেলেই হল। আপনার ভালই লাগবে আলাপ হলে। এত বিষয়ে ইণ্টারেস্ট—

শোন জয়শ্রী। তুমি আর আমি বন্ধু। সর্বক্ষণ যদি আপনি আপনি কর তো মনে হয় অফিস সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছি।

জয়শ্রী অন্ধকারে হাসলো। আপনি আমার চেয়ে এত বড—জয়শ্রী বলে আপনি ডাকতে পারেন—আমি কি রঘু রঘু বলে ডাকতে পারি? না, ভাল শোনায়?

রঘুনাথ বলো।

লোকে ভাববে—কোন ভক্তিমতী তরুণী প্রকাশ্যে ভগবানকে ডাকছে! সে এক হাসাহাসির ব্যাপার হবে।

তাহলে কিছু বলে অ্যাড্রেস কোরো না। সিধে তুমি বলবে।

শর্ত করে এসব হয় না। বুঝলেন? হলে আপনা-আপনি একদিন হয়ে যাবে।

মানুষের ভেবে রাখা কাজ মানুষের হাতের ভেতর থাকে না। তা বেহাত হয়ে যাবেই। নিরঞ্জন বসুর ধোপার মাঠ বাঁচাও আন্দোলন কী করে যেন গড়াতে গড়াতে একেবারে বিরোধী দলের হাতে গিয়ে পড়ল।

আসলে বাড়ি নয় বিশাল এক কমপ্লেক্সের পরিকল্পনা করেছে পুরসভা। টাকা দিচ্ছে ব্যাঙ্ক। প্রমোটার প্রাইভেট পার্টি। সবকিছুর গ্যারাণ্টার রাজ্য সরকার ওরফে ক্ষমতাসীন দল। তাদের লাভ-যে-জায়গা, ঘর, দোকানপাট বুকিং হবে তার মোটা সেলামীটা।

প্রাইভেট প্রমোটারের হয়ে বাড়িটা করতে নেমেছিল রঘুনাথ সেন। তার প্রতিষ্ঠান। এখন সে প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল বিরোধী দল। শুরু করেছিল নিরঞ্জন ছোট্ট একটা নাগরিক কমিটি নিয়ে। এখন সে কমিটি কোথায়?

স্থায়ী পুলিশ পাহারা। হাইকোর্টের ইনজাংশন। আর তার সামনে বিরোধী দলের রিলে করে ধর্ণা দেওয়া চলছে। কাগজ খুললেই ধোপার মাঠের কথা।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রঘু সেন জয়শ্রীকে বলল, আজই তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।

তা কি করে হয়? আগে তাঁকে বলে রাখি।

কিছু বলতে হবে না। সোজা গিয়ে পরিচয় দিয়ে কথা বলব।

বাবা খতমত খেয়ে যাবেন।

অত নরম লোক নন তিনি। তাহলে ওভাবে পুলিশের সঙ্গে—আমার সঙ্গে তর্ক করতেন না।

আমার বাবার বাইরেটা শক্ত। ভেতরে বাবা ভীষণ নরম।

সে তো আলাপ পরিচয় হলেই জানতে পারবো। চল,—আজই আলাপ করিয়ে দেবে—

বাড়িতে তোমায় বসাবার—চা করে খাওয়াবার কিন্তু কেউ নেই এখন। ঠিকে লোক অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে। যা করার আমার গিয়ে করতে হবে।

জয়শ্রীর মুখে 'তোমায়' কথাটা শুনে গা শিরশির করে উঠলো রঘুনাথ সেনের। 'আপনি' থেকে জয়শ্রী 'তুমিতে' নামায় কলকাতার রাস্তাঘাট অন্যরকম হয়ে গেল রঘুনাথের কাছে।

বাবা যদি কোন জনসেবায় বেরিয়ে না পড়ে তো এখন গেলে দেখা হবে।

পরম উৎসাহে রঘুনাথ হাত তুলে একটি ট্যাক্সি থামালো। অনেক-অনেকদিন পরে একই ট্যাক্সিতে অনাত্মীয় অথচ কথা বলতে ভাল লাগে এমন একটি মেয়ের পাশে বসে কথা বলতে বলতে যেতে রোমাঞ্চ হচ্ছিল রঘু সেনের।

তার ইচ্ছে হচ্ছিল-একবার জয়শ্রীর ডান হাতখানা ধরে। আবার মনে হচ্ছিল-ও এখনো পুরোপুরি নারী হয়ে ওঠেনি মনে মনে—এই অবস্থায় ওর হাত ধরলে বিপরীত ফল হতে পারে। এমন কিছু সুন্দরী হয়ে ওঠেনি এখনো,— তবু ঠোঁটের একদিক টিপে হাসা, ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা পেছনে হেলানো এসব নিয়ে জয়শ্রী মাঝে মাঝে মনোহারি হয়ে ওঠে।

বাবা। এই যে সেই স্বপতি যার কথা তোমায় বলেছি।

নিরঞ্জন বসার ঘরে বসে সকালের কাগজ দেখে সম্পাদককে চিঠি লিখছিল। লেখা থামিয়ে চশমাটা নাকের ওপর মুছে নিয়ে বসালো। বসিয়ে বলল, আমাদের তো আগে দেখা হয়েছে। তাই না?

হুঁ অদ্ভুত অবস্থায়।

আমার আর আপনার মাঝখানে পুলিশ ছিল।

পুলিশ আপনাকে ভ্যানে তুললো।

সেই পর্যন্তই জানেন আপনি—

আমার নাম রঘুনাথ সেন—

পুলিশ আমায় ছেড়ে দিল। কিন্তু আমাদের আন্দোলনটা চলে গেল রাজনীতির হাতে। আমরা চেয়েছিলাম—জলের সঞ্চয় ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে যেন ফতুর না করে ফেলা হয়—

ফতুর হতো না মিস্টার বসু। কি বর্ষায় জল গিয়ে সঞ্চয় বাড়ায় মাটির নিচে।

কি বছর বর্ষা হয় না রঘুবাবু।

সে জন্যে বোম্বাইয়ের মত পাহাড় কেটে বর্ষার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হোক। প্রয়োজনের কনস্ট্রাকশন বন্ধ হবে কেন? ধোপার মাঠে ধোপারা কাপড় কাচতো হয়তো ষাট সত্তর বছর আগে। তারও আগে ওখানটায় নাকি বৃটিশ আমলের কোন্ গভরনর জেনারেলের নামে পার্ক ছিল। সাহেব—মেমরা বেড়াতে আসতো তখনকার কলকাতায়। এখন মশার ডিপো। সে জায়গা ঢেলে সাজালে বহু মানুষের রুজি-রোজগার হবে। দোকানপাট বসবে। অডিটোরিয়াম হবে। রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট থাকবে।

কলকাতার গায়ে পাহাড় নেই রঘুবাবু।

বড় করে জলাধার হোক।

সেকথা তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা ছোট্ট এক নাগরিক কমিটি বাড়ন্ত আলো বাতাসের ওপর চাপ কমাতে যে মুভমেণ্ট করতে গেলাম,—তা যে আজ আমাদের হাতছাড়া। ব্যাপারটা শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোর্ট, কাছারি, পুলিশ, ধর্ণা-আইন অমান্যে সারা লোকালিটির জেরবার দশা।

ওদের থামিয়ে দিয়ে জয়শ্রী বলল, এসো—এবার আমাদের বাড়িটা দেখবে। আলো বাতাসের অতবড় উপাসক আমাদের বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটা করেছিলেন—ওঁর কম বয়সে। শীতকালে একটু রোদ পাই না। গরমে বাতাস অন্য পথ দিয়ে চলে যায়।

বাড়িটা দেখাতে দেখাতে জয়শ্রী একটা ঘরের সামনে এসে থামলো। এটা আমার ঘর।

তুমি একা থাকো?

কে আবার থাকবে সঙ্গে! মা থাকলে আলাদা কথা ছিল।

ঘরখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ভালই লাগল রঘুনাথের। বহুকাল কোন মেয়ের ঘর সে এমন দেখেনি। ছোট পালঙ্কের সামনে ছোট টেবল। তাতে নতমাথা টেবলল্যাম্প। কলম পড়ে আছে খোলা। দু'খানা মোটা মোটা বই। বিছানায় মাথার বালিশটিও ছোট।

এসো। বাবার সঙ্গে বসে চা খাবে।

তোমার দাদা কোথায়?

অন্যদিন তো এসে পড়ে এতক্ষণে—

চায়ে মুখ দিয়ে নিরঞ্জন বসু ভাল করে দেখলো রঘু সেনকে। এমন মিহিন চামড়ায় মানুষরা ছায়ায় বসে অনেক টাকা রোজগার করে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে কল্পনা,—বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধি মিশিয়ে। তার সঙ্গে থাকে ব্যবসার বুদ্ধি। রঙিন স্বপ্ন দেখানোর ক্ষমতা।

চায়ে মুখ দিয়ে নিরঞ্জন বলল, আজকাল তো লক-আউট সমে কারখানাও কিনে নিচ্ছেন আপনারা!

কথায় যেন কেমন ঠাট্টা। তাই রঘুনাথ জানতে চাইল, কি রকম?

কারখানা কিনলেন। লক-আউট খুললো। ইউনিয়ন হাত করে আবা বন্ধ করে দিলেন কারখানা। চিরকালের মত। মেশিনপত্র, বাড়িঘর বেচে যা এ তা বেশ মোটারকম। তারপর তো রইল বিরাট দামের বিরাট জমি। তাে প্রমোটার এসে বাড়ির প্ল্যান করে বিজ্ঞাপন করলো। অমনি বৃষ্টির মত টাব আসতে লাগল।

এসব হয়তো কোথাও সত্যি। কিন্তু আমরা এমন কাজ করিনি কখনো।

দু'জনকে এভাবে কথা বলতে দেখে জয়শ্রীর বুকের বাঁ দিকে চিনচিন ক উঠলো। একজন তার বাবা। অন্যজনের সে গুণগ্রাহী। দু'জনই দু জাতের ভালো লোক। কিন্তু এ কী কথার শ্রী? যেন ভোঁতা তলোয়াে যুদ্ধ হচ্ছে। কেটে বসে যাচ্ছে না। কিন্তু ধ্যাবড়া মত একটা আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে। আর সেই আওয়াজ গিয়ে জয়শ্রীর বুকের পাঁজরে গুঁতো খাচ্ছে যেখানটা একটু খুললেই রক্ত যাতায়াতের রাস্তাটা চোখে পড়বে। হাড়ে মাং চাপা আছে। ওখানে হৃদয়ে যাবার হাঁটা পথ—রক্তের পক্ষে। একটা গা চলে গেছে ডাইনে, আরেকটা বাঁয়ে। বামআনন্দ বরাবর রক্তগলির ভেতর জয়শ্রী একটা চিনচিনে ব্যথা টের পেল। যা কিনা প্রিয়জনের বিরোধে ক্ষতবিক্ষত হয়

দুটো কাপেই সমান চা তখন। নিরঞ্জন কিংবা রঘুনাথ—কেউই আর চুমু দিতে পারছিল না।

আজ তুমি কার সঙ্গে হেঁটে ফিরছিলে বাবা?

একথায় রঘুনাথ চমকে তাকালেন। তার সামনে ড্রইং বোর্ডে ট্রেসিংপেপারের ওপর একটি বহুতল বাড়ির পিলারগুলোর নানান সেকসন আঁকা। কোথায় কতটা ইস্পাত দিয়ে বাড়ির ওজন কমানো যাবে—তাই নিয়ে তিনি মাথা ঘামাচ্ছিলেন একমনে। কলকাতার ভিত, বলতে এমনতেই জমা জায়গা। মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে এখানে সমুদ্রের জল বয়ে যেত। এখনো সেই সমুদ্র-তীরের বনাঞ্চলের গাছ কয়লা হওয়ার পথে—মাটি খুঁড়লে উঠে আসে, যাকে মাটি কাটার মানুষজন বলে—পাণ্ডব মাটি। কলকাতার মাটির নিচেই এক শৃঙ্গ গণ্ডারের মাথা পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে সমুদ্রে যাবার বড় নৌকোর গলুই।

এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই নিজের ব্যারিস্টার মেয়ে ছন্দার মুখে তাকালো রঘুনাথ সেন। কার কথা বলছিস?

একটি অল্পবয়সী মেয়ে। কাঁধে ঝোলা। টি বেরিয়ে আছে সেখান থেকে। মনে হল তোমারই ঝোলা বইছে। কোন অ্যাপ্রেন্টিস?

না, না। মেয়েটির নাম জয়শ্রী। ভাল মেয়ে। মা নেই। বাবা দেশসেবা করে বেড়ান—

ত. তোমার সঙ্গে ?

এসেছিল অফিসে। ছুটির পর একসঙ্গে হেঁটে ফিরছিলাম।

তোমার যতটা হাঁটা দরকার যতটা তুমি হাঁটতে পারো,—ওরকম একটি মেয়ে কি অতটা হাঁটতে পারে ? না তার হাঁটা উচিত ?

তুই কোথায় ছিলি ?

গাড়িতে। হাইকোর্ট থেকে ফিরছি। ট্রাফিকের রো ভেঙে তো বেরোতে পারি না। তাই এগিয়ে যেতে হল। নয়তো তোমাদের তুলে নিতাম গাড়িতে।

আমাদের হাঁটতেই ভাল লাগছিল।

বল—তোমার লাগছিল। মেয়েটি ছিপছিপে। আর হাঁটলে তো বাতাসে মিলিয়ে যাবে!

চোখের চশমা খুলে টেবলে রাখলো রঘুনাথ। তারপর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ত্যাখ্ ছন্দা—কী করে জানলি যে মেয়েটিরও ভাল লাগছিল না ? জয়শ্রী কলকাতা জুড়ে আমার বেশিরভাগ কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। স্লেপটি নয়। লে-ম্যানের চোখে ও যা বলে তা আমার কাজে লাগে। স্থপতির কল্পনা সাধারণ মানুষের মনের ভেতরে গড়িয়ে যেতে যদি না পারলো তো সে স্থপতি ব্যর্থ। জয়শ্রী নানান বাড়ির গঠন নিয়ে কথা বলতে বলতে হাঁটে,—হাঁটতে ওর মত বোঝাবুঝিটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে।

ওঃ! স্থপতির কাজও বোঝে নাকি! বেশ নেকু আছে তো মেয়েটা।

আইনে পসার জমে ওঠা নিজের মেয়ের ভেতর থেকে অনাদিকালের হিংসুটে একজন নারী বেরিয়ে পড়ায় মনে মনে খুশিই হল রঘু সেন। মুখে সে খুশির ভাব না এনে বলল, আমরা দু'জনে এক একদিন এক একদিকে হাঁটি। গাড়িতে বসে কলকাতাকে আমি অ্যাতো অ্যাঙ্গেলে আগে কখনো দেখিনি। জয়শ্রী যে কত রাস্তা চেনে—খিদিরপুরের দিক থেকে ময়দানের এপারে টল বাড়িগুলোকে মনে হবে গম্ভীর,—ধোঁয়ায় ঘেরা। আবার আকাশবাণী ভবনের ওখান থেকে উঁচুর নেতাজী মূর্তিকে বড় বেশি ভারি লাগে। সেই তুলনায় দেশবন্ধু হালকা। এসব দেখে বেড়াবার। মেয়েটির দেখবার চোখ আছে। আনন্দ করতে পারে। কল্পনা উসকে দিতে পারে—

অনেক গুণ তো জয়শ্রীর। তোমার কল্পনাও উসকে দিতে পারে ওইটুকু পুঁচকে একটি মেয়ে ?

কিসের আইন ব্যবসা করিস ? কোন্ জিনিস কোন্ জিনিসের কাজে লাগে কেউ বলতে পারে ? আমি তোমার বাবা,—তুমি আমার মেয়ে ছন্দা—

সে জন্যেই তো কাল থেকে আমার গাড়ি সন্ধেবেলা তোমাকে অফিস থেকে নিয়ে আসবে।

আমার কথাটা শোন আগে। আমিও একজন মানুষ। আমারও চা[ই]
কথা বলতে ইচ্ছে করে। শুনতে মন চায়, আবার জানা জিনিস কাউকে বল[তে]
ইচ্ছা হয়—এটা বুঝিস না কেন?

মাকে নিয়ে কাল সন্ধেবেলা থিয়েটার দেখে এসো।

এখন আর হয় না ছন্দা। তার জগতে তো আমি নাক গলাই না।
ওই দ্যাখ—

ছন্দা তার বাবার কথামত জানালা দিয়ে ভেতর-বাড়িতে তাকালো। শ্রীমত[ী]
সাবিত্রী সেন একজন খোকামতো মিস্ত্রিকে দিয়ে জানলার শিকে রেড অক্সাই[ড]
মাখিয়ে নিচ্ছে। পরে রং চড়বে।

দৃশ্যটি দেখে ছন্দা বলল, তোমারই তো সংসার দেখছে মা।

সংসার কারও নয়। আবার সবার। তোমার ভাইয়েরা বড় হয়ে গেছে
একই বাড়িতে থেকেও তারা প্রায় পেয়িং গেস্ট। তুমি আমার প্রথম সন্তান
তুমিও অনেকদিন হল সাবালিকা। তোমার ছোট দু'ভাই বিয়ে করেছে
উপযুক্ত পাত্র পেলেই তুমিও বিয়ে করবে।

আমার কথা বাদ দাও।

আসলে আমাদের সবারই একা একা চলার জীবন শুরু হয়ে গেছে।

আগের মতো সবাই মিলে আনন্দ করা যায় না বাবা? বৃষ্টি হলে তু[মি]
রেকর্ড বাজাতে। মা পাঁপড় ভাজতো।

এক এক জনের কাছে আনন্দ এখন এক এক রকম। তখন তোমরা ছো[ট]
ছিলে। বৃষ্টি একটা বড় ব্যাপার। গান সুরেলা। পাঁপড় বিরাট। বি[...]
দাঁত বসালেই মুট মুট করে ভেঙে যায়,—তাই তোমার মনে আছে ছন্দা।

মায়ের কথাটাও ভুলে যেও না বাবা।

সব মনে রেখেই আমি জয়শ্রীর সঙ্গে মিশি। এখানে তোমার মায়ের স[ঙ্গে]
আমার কোন বিরোধ নেই। আবার আমি যা করি,—যা ভাবি—তা থে[কে]
তোমার মা অনেক দূরে।

হাইকোর্টের করিডোরে নিরঞ্জন বসু ঘুরছিল। বলা যায় ঘুরঘুর করছিল
লম্বা করিডর। তাতে রোমান আমলের লতাপাতার কাজ সিমেন্টে। লো[ক]
জনের দৌড়োদৌড়ি। টাইপ মেশিনের অবিরাম খটাখট। ফুলহাতার শা[...]
ব্লাউজের ওপর গলায় স্টিক কলার,—কাঁধে কালো গাউন, ছন্দার মুখোমুখি হ[...]
নিরঞ্জন। আপনি ছন্দা সেন?

হুঁ। আসুন।

পেছন পেছন প্রায় ঢুকতে হল নিরঞ্জনকে। ছ নম্বরে 'গয়েছিলাম,—আপনাকে ধরতে পারিনি।

পাবেন কি করে? আমায় দু জায়গায় অ্যাপিয়ার হতে হল পর পর। কাগজপত্তর এনেছেন?

দুলালবাবু যা যা বলেছেন সব এনেছি।

সেই ধোপার মাঠের বাড়িব কেস দেখছ। একটা তো স্টে অর্ডাব অপোজিশান পার্টি পেয়েছে।

সেটা বেশ নড়বড়ে। ভেকেট হয়ে যাবে। আমরা একটা ক্ষুদ্র নাগরিক কমিটি। আমাদের কথা হল, এই এলাকায় অত বড় কমপ্লেক্স হলে পাতালের জলে টান পড়বে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি।

লড়তে পারবেন? অতবড় আর্কিটেক্ট ফার্ম।

আমবা তো ন্যায়েব পথে মিস সেন। লিগাল এইড ফোরামের দুলালবাবু আপনাব কথা বললেন।

কাগজপত্র রেখে যান। আমি দেখবো।

নিরঞ্জন বসু চলে যেতে ছন্দা কাগজপত্রগুলো মেলে ধরলো নিজের টেবলে। এসব কাগজ তারই বাবার মাথার কল্পনা থেকে বেরিয়েছে একসময়। কলকাতার মাটির স্তর সম্পর্কে লম্বা এক ফিরিস্তি। শহরটাই কাঁচা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে। এখানে প্রতি ছ'শো বছর অন্তর নিরন্তর মাটির স্তব পালটে যাচ্ছে। তাতে জলের জাতও বদলাচ্ছে। কোন্ জলে ক্ষাব বেশি। কোনটায় নুন। কংক্রিট পাইলিং য়র আয়ু প্রায় পাঁচশো বছব। সুতবাং ভবিষ্যতে কী হবে তা দেখতে এখনকাব কেউই থাকছে না।

রেসপনডেন্ট নিরঞ্জন বসু অ্যাণ্ড আদার্স। ছন্দা বুঝলো, জনসেবায় মেতে ওঠা কিছু লোকের এ এক শেষ চেষ্টা। আর তার নেতিব সে নিজে। তার কাছে অনেক আশা নিয়ে এদেব আসা।

এই কাগজগুলো ছন্দাব কাছেও একটা জেদের সামগ্রী। সে জানে তার বাবার স্বপ্নের আত্মা এইসব ডিজাইন। সেকসন আঁকা এইসব কাগজ। বাবার বিবাদীদের জিতিয়ে দিতে পারলেও কি বাবা তার মেয়ের চেয়েও কচি একটা ছিপছিপে মেয়েকে বন্ধু বলে আঁকড়ে থাকবে? এর একটা শেষ দেখতে চায় সে।

কদিন বাদে 'দি কেড্'-এর ইলেভেনথ্ ফ্লোরের কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এ রঘুনাথ সেন। এম ডি এ-বছর ধোপার মাঠের কাজটাকে কোম্পানি চাঙ্গা করে তোলার বিশল্যকরণী বলে ঠিক করে রেখেছিলেন। এত বড় কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে পারলে প্রতিষ্ঠানে রক্ত সঞ্চার হয় খানিকটা।

এই অবস্থায় এম ডি আজ জানালো, নাগরিক কমিটিও কোর্টে গেছে।

রঘুনাথ বুঝলো,—তার মানে জয়শ্রীব বাবা নিরঞ্জনবাবুও বসে থাকেননি।

যে যেদিক থেকে পারে তীর ছুঁড়ে চলেছে। সে বলল, ওসব জেনে আমি কি করবো। আমি এগোই—

নিচে নেমে রঘুনাথ দেখলো—জয়শ্রী রাস্তা পেরিয়ে এদিকেই আসছে। রঘুনাথের ব্লাডপ্রেসার নিচেরটা পঁচানব্বই। সুগার ফাস্টিংয়ে ছিয়ানব্বই আর ক্লোরোস্টেরোয়েল দু'শো বাহান্ন। বারো কেজির মত ওভারওয়েট। ডান চোখে বেশি করে কম দেখে। কাবলি পায়ে দিলে আরাম পায়।

চল। কোথাও কিছু একটা খাই জয়শ্রী।

তুমি খাও। আমি আজ বেলায় খেয়েছি—

চলো তো! ওই তো গঙ্গার গায়ে দোতলা রেস্তোঁরা আছে। ওখানে—

ওরে বাবা। ওখানে আমি যাচ্ছিনে। মসলা দেওয়া ভারি ভারি রান্না সব। তার চেয়ে যদি ফুচকা পেতাম—

ফুচকা খাবে? বেশতো।

খানিক পরে দেখা গেল—এক ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে অনেকের সঙ্গে শালপাতার মোড়ক হাতে রঘুনাথ আর জয়শ্রী দাঁড়িয়ে। জয়শ্রীর প্রবল উৎসাহ। রঘুনাথের কিন্তু কিন্তু ভাব।

জয়শ্রী বলল, কোন ভয় কোরো না। খেয়ে নাও। শেষে একটা জল দেবে, সেটাই সব হজম করিয়ে দেয়।

বিকেলের আলোয় পংক্তিতে দাঁড়িয়ে এই সরল ফুচকা-ভোজন ভীষণ ভাল লাগল রঘু সেনের। এতদিন হালকা খাবার বলতে সে জানতো—চিকেন স্যাণ্ডউইচ আর ব্ল্যাক কফি। অথচ পৃথিবীতে এত সুন্দর খাবারও আছে।

ফুচকার পয়সা দিয়ে দু'জনে গোয়ালিয়র ঘাটে গিয়ে বসলো। বিরাট বিরাট থাম। নির্জন উঠোন মত সিমেণ্ট করা জায়গা। সিঁড়ির ধাপ জোয়ারের জলে একটা করে ডুবে যাচ্ছিল।

জয়শ্রী বলল, এখানে একটা চোরা ঢেউ আছে!

যে কোন কনস্ট্রাকসনের নিচেই বা লাগোয়া। চোরাগোপ্তা স্রোতের টান তৈরি হয় জয়শ্রী। তাই নিয়ম।

তা হবে। আমাদের পাড়ার ছেলেরা সরস্বতীর ভাসান দিতে এসে ফিরল যখন, দেখা গেল, একজন ফেরেনি, সবার অজান্তে শেষ ধাপের কাছাকাছি ঢেউ তাকে তলিয়ে নিয়ে গেছে।

মাটির স্তরেরও একটা সুপ্ত ঢেউ থাকে। কোন বহুতল বাড়ি উঠলে—কমপ্লেক্স গড়ে উঠলে,—ভিতের নিচের মাটির স্বাভাবিক স্তর ঘা খায়। তখন স্তরে ফাটল দেখা দেয়। সে-পথে ভূমিকম্পই প্রথম চৌচির করে ঠেলে ওঠে। প্রকৃতির স্বভাব জয়শ্রী, মানুষেরই মতো।

সেখান থেকে উঠে ময়দানে ঘাসের ওপর এসে বসে রঘু বলল, একদিন

তোমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে,—তাকে নিয়েও এমনি ঘাসে এসে বসবে।

বিয়ে আমি শিগগির করছি না। বিয়ে হলেই অধিকার জিনসটা চাগাড় দিয়ে ওঠে পুরুষদের। এই তো ভাল। দু'জনে কেমন বন্ধুর মত মিশি।

আমি এখানে এসেছি কত আগে। জীবনে যা যা করে সবাই,—সবই করেছি। তোমার তো জয়শ্রী কিছুই করা হয়নি। ভাল কথা,—তোমার বাবাও আমাদের বিরুদ্ধে মামলা এনেছেন।

বাবা। ছোটবেলা থেকে তোমায় অন্য মানুষের চেয়ে অন্যরকম জানি। তার সেই তুমি রঘুদের বিরুদ্ধে মামলা করে দিলে? ব্যাপারটা কি এতটাই ওসপার ওসপার ছিল? বাড়ন্ত আলো বাতাস জল নিয়ে তোমার ভাবনা যতখানি— তার চেয়ে রঘুর ভাবনা কম কিছু নয়। কলকাতা আসলে আকাশের নীচে একটা কলতলা। পাতালে জল যথাসময়ে জমছেই। নইলে মেট্রোরেল করতে এত কষ্ট হয়?

এরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই জয়শ্রী ফাঁকা বাড়িতে বসার ঘরে একা একা এটা-ওটা গোছালো খানিকক্ষণ। তারপর এক জায়গায় বসে পড়ে মায়ের ফটোতে চোখ রাখলো। দেখলো - ফটোর মা তার দিকে তাকিয়ে।

এ বাড়ি থেকে মা চলে যাবার পর তারা তিনজন তিন দিকে ছুটে চলেছে। নিরঞ্জন বসু নামে মানুষটি জনসেবায় মেতে আছে। দাদা জয়ন্ত ব্যাঙ্কের সময়টা ব্যাঙ্কে—তারপর তুলকালাম আড্ডা। কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পড়তে আর মন বসে না জয়শ্রীর। বিচ্ছিরি খটোমটো লাগে।

সে নিজে এই কিছুকাল রঘু সেনের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে তার চোখ দিয়ে অনেক কিছু দেখতে শিখেছে। পুরুষ বসে থাকলে অবয়ব একরকম। নারী শুয়ে থাকলে আরেক রকম অবয়ব। একটা বাড়িও যেন তার চারপাশের জিনিস-পত্তর ঘরবাড়ি, গাছপালা, রাস্তা ঘাটের ভেতর আরেকটা মানুষ। সটান দাঁড়িয়ে। কিংবা বিশ্রামের ভঙ্গিতে। অথবা অনেক মানুষকে আশ্রয় দেবে বলে গর্ভাধার খুলে বসে আছে।

এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে তার একরকম লাগে। প্রিন্সেপ ঘাটকে লাগে আরেক রকম। কোন বাড়িতে বৃক্ষের অদৃশ্য জলছাপ। কোন বাড়িতে বা ঢুকতেই জোয়ারি লাগানো চমক। যেন গান বেজে উঠবে এখুনি। সিংহ-দুয়ারে অদৃশ্য রোশনচৌকি।

একা একা বসে মা?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জয়শ্রী। নিরঞ্জন মাথায় হাত রাখায় জেগে উঠল।

এমনি বাবা। কোথায় গিয়েছিলে?

আর বলিসনে। কোর্ট থেকে। নাগরিক কমিটির সবাইকে জড়ো করাও আমার দায়।

কে বলেছে তোমায় জড়ো করতে ?

জয়শ্রী ফুঁসে উঠে দাঁড়ানোয় অবাক হলো নিরঞ্জন। কি হল ?

তুমি শেষে মামলা করলে রঘু সেনের বিরুদ্ধে !

আমাদের স্ট্রাগল্ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। রঘুনাথও আসলে একটি প্রতিষ্ঠান। সে ওই প্রতিষ্ঠানের সদর দরজা মাত্র ! কোথায় যাচ্ছিস ?

এ বাড়ি আমার ভাল লাগে না বাবা।

তাই বলে যাচ্ছিস কোথায় ?

এখানে আর থাকবো না।

জয়শ্রী ?

রিটায়ারের আগেই নিরঞ্জন বসুর ছোট্ট করে বানানো দোতলার মেজানিন ফ্লোরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল জয়শ্রী। উঠে ছোট দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করলো। দরজা বন্ধ করে জয়শ্রীর স্থির বিশ্বাস হল, এ পৃথিবীতে তার কেউ নেই। সে একটা অজানা জায়গায় শুধুই ঘুরে মরছে। এখানে ফোন থাকলে সে রঘুনাথ সেনকে ফোন করতে পারতো।

বিকেলের দিকে দি কেড্-এ গিয়ে হাজির হল জয়শ্রী। কাঁধের ব্যাগে কয়েকখানা শাড়ি, জামা, একটা ক্রিম, চিরুনি। সঙ্গে অ্যাটাচিতে আর কিছু জামা-কাপড়। রঘু সেন গম্ভীর হয়ে লিফট্ থেকে জয়শ্রীকে দেখে বলল, এই যে বন্ধু. - কি খবর ? কোথায় যাচ্ছো ?

তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা বলতে এলাম।

কোথাও বসে বলবে। আমার তো গাড়ি নেই। হাঁটতে হাঁটতে ?

বেশ। হাঁটতে হাঁটতেই বলছি। মন দিয়ে শুনবে।

দু'পাশে অফিস ভাঙা এলোমেলো ভিড়। বিড়লা তারাঘর ছাড়িয়ে আকাদেমির কাছাকাছি এসে জয়শ্রী শুরু করতে যাবে,—এমন সময় রঘু সেন বলল. মনটা ভাল নেই জয়।

আমারও। জনসেবার জন্যে বাবা শেষে মামলা ঠুকে বসলো ?

আর সে মামলা কে নিয়েছে জানো !

অবাক হয়ে তাকালো জয়শ্রী। রঘুনাথ বলল, সে মামলারও ব্যারিস্টার আমারই মেয়ে ছন্দা সেন বার-অ্যাট-ল !!

এতে তো কোন দোষ দেখছি না।' এটা তোমার মেয়ের পেশা।

জনসেবাও তোমার বাবার নেশা। তাই মামলা। ফলে তাকেও দুষছি না।

দোষ আমিও কাউকে দিচ্ছি না। কিন্তু কী অবুঝ। বড় বাড়ি নাহলে,—বড় কমপ্লেক্স না হলে মানুষই ভুগবে। মাটির নিচের জলে টান পড়লে দরকারে বৃষ্টির জল ধরে রাখতে হবে। কোন কল্পনা শক্তিই কাজ করছে না ওদের।

আমি আর তুমি বন্ধু, আমরা একসঙ্গে ঘুরি,—গল্প করি বলেই ছন্দা তোমার বাবার কেস নিয়েছে আমার মেয়েকে তো আমি চিনি। আমাদের নিয়ে তার কল্পনাও চেনা পথের বাইরে যেতে পারছে না।

সেকথা তো আমার বাবার বেলাতেও খাটে।

হাঁটতে-হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ল রঘুনাথ। কেমন?

মেয়ে ভীষণ মিশছে রঘু সেনের সঙ্গে। দাও ঠুকে মামলা। চেনা পথের বাইরে আমার বাবাও কল্পনা করতে শেখেনি।

'তাই তো' বলে মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল রঘু সেন। জীবনের এ জায়গাটায় এসে কোথায় যাবো—তাই ভাবছি। সব দিক ধোঁয়াটে লাগে জয়শ্রী।

এক জায়গায় যাবে? আমার ছোট মাসীর ওখানে। খাস গোবিন্দপুরে?

সেটা কোথায়?

হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ে ছিল একসময়। সেই পথে। হাওড়া ময়দান থেকে মিনিবাসে আধ ঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট। বিরাট পুরনো আমলের বাড়ি। দিঘি,—নারকেল বাগান।

ছোট মাসী থাকতে দেবেন?

লুফে নেবেন। কেউ যায় না। হা পিত্যেশ করে বসে থাকেন। ওখানে ছাত্র পড়ান। বিয়ে-থা করেন নি।

যেমন কথা, তেমন কাজ। ওরা দু'জনে হাওড়া ময়দানের মিনিবাস ধরলো।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে খাস গোবিন্দপুরে ইলেকট্রিক লাইট, টেলিফোন, ব্যাংক এসে গেছে। মিনিবাস স্ট্যাণ্ড থেকে অল্পই রাস্তা। গুণ্ডা মস্তানরা যাতায়াত করে যেমন-তেমনি গেরস্থরাও করে। লেদ মেশিনও বসেছে। আবার পানা পুকুরেও থই থই। গোলাঘরের মটকায় যেমন হাঁড়ি উল্টে বসানো, তেমনি অনেকটা স্ট্যাটাস সিম্বলের মতই চালাঘর, টালির ছাদ, পাকা বাড়ির মাথায় টি-ভির অ্যান্টেনা।

গাছপালার ভেতর দিয়ে রাস্তা করে রঘুনাথকে নিয়ে জয়শ্রী বিশাল একটা বারান্দায় উঠলো। উঠে খোলা ঢাকা বারান্দার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ডাকলো-ও ছোটমাসী? ছোটমাসী? সন্ধ্যে রাতেই ঘুমোলে?

কে?—বলে একজন মহিলা বেরিয়ে এল। ও জয়া! মনে পড়ল তাহলে!!

আমার সঙ্গে এক বন্ধু আছে।

বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়ে ছোটমাসী অবাক চোখে দেখল রঘুনাথ সেনকে। কোন্ বয়সের মেয়ের কী বয়সের বন্ধু? রঘুনাথও মন দিয়ে দেখল—জয়শ্রীর ছোটমাসীকে। সিঁথির একটা দিকে পাক ধরেছে। পায়ে হাওয়াই। মাঝারি পাড়ে তাঁতের শাড়ি।

দেখে ছোটমাসী বলল, উনি তো সেনমশায়—তাই না?

তুমি জানলে কি করে?

জানি! জামাইবাবুর মুখে শুনেছি। কত বড় আর্কিটেক্ট।

কলকাতায় গিয়েছিলে?

ও মা! দু হপ্তা হল ঘুরে এলাম তোদের বাড়ি। তুই ছিলিস না। জামাইবাবু কিছু বলেন নি!

এ সঙ্গে অনেক কথা মনে এল জয়শ্রীর। বাবা তার শালীকে কী বলতে কী বলেছে—কে জানে? হয়তো ছোটমাসীর মনটাও বিষিয়ে আছে তার ওপর। কিন্তু জয়শ্রীর সে ভয় তখন তখনই কেটে গেল ছোটমাসীর কথাবার্তায় হাসিঠাট্টায়।

আসতে আজ্ঞা হোক সেনমশায়।

সংকোচে এতটুকু হয়ে গিয়ে রঘুনাথ বলল, অমন করে বললে আমি কোথায় দাঁড়াই বলুন তো!

এই সন্ধ্যে রাতে তো ঘাটলায় গিয়ে পা ধুতে পারবেন না। আমি এখানেই জল এনে দিচ্ছি।

বলেন কি? আপনি এনে দেবেন কেন। চলুন,—পুকুর কোনদিকে আমায় দেখিয়ে দিন।

জয়শ্রী বলল, চল—আমিও পা ধোব।

চারিদিকের গাছপালার ভেতর বিশাল এক দীঘি। বাঁধানো ঘাটের মাথায় হেমন্তের সন্ধ্যে রাতে একটুখানি চাঁদ। বেশির ভাগই ছায়া। ঘাটের উঁচুতে দাঁড়িয়ে ছোটমাসী। হাতে টর্চ।

কী কয়েকটা সবজি তুললো ছোটমাসী। অন্ধকার বাগান থেকে। সম্ভবত কাঁচ ঢ্যাড়স আর কাঁচা লঙ্কা। সামান্য ডাল ভাত। গরম গরম। খেতে বসে অনেকদিন পরে খাবার ইচ্ছে টের পেল রঘু। ডালে, ভাতের দানায়, কাঁচালঙ্কায় এখানকার লোকাল গন্ধ।

ঢাকা বারান্দায় বিরাট তক্তপোষে বিছানা হল রঘুর জন্যে। মশারি। বেশি রাতে কামিনী ফুলের গন্ধ সারাটা বারান্দা দখল করে নিল। রঘুর অপরিচিত একটা পাখি সারা রাত ডেকে চলল।

পরদিন ভোর হতে সারা পৃথিবী ওদের দু'জনের চোখের সামনে হেসে উঠল।

ছোটমাসী বলল, সেনমশায় যখন থাকতেই চান, তো আমায় একটা ভাড়া ধরে দেবেন। তাতে আমার সংসারে সুরাহাই হবে। জয়ী আমার সঙ্গে থাবে থাকবে।

আইডিয়াটা বেশ ভাল। মনে ধরলো রঘুনাথের। তার জন্যে জয়শ্রীর ছোটমাসী সামনের দিককার দু'খানা ঘর, বাঁধানো পুজো মণ্ডপের খোলা চত্বর

আর দূর্বা ঢাকা বাগানটুকু ঢেকে দিল। দিয়ে বলল, এত বড় বাড়ি। কোনদিন ভাড়াটে আসেনি। সেন মশায় এলেন। তাই খেলা খেলা একজন ভাড়াটেও হল আমাদের।

পুরো ব্যাপারটাই খেলা খেলা ধাঁচে জমে উঠলো। বাগানের পরেই দীঘি। বিরাট ঘাটলা সেখানে পা ডুবিয়ে বসে জয়শ্রীর বলল, কাল এখানে তুমি আর আমি পা ধুয়েছি।

বড় সুন্দর জায়গাটা।

আমার দাদামশায়ের দুই বিয়ে। মা আর ছোটমাসী দাদুর শেষ দিককার মেয়ে। দাদু বিয়ে করে এসব সম্পত্তি পান। ছোট দিদুকে আমার ছোটবেলায় এই ঘাটলায় দেখেছি। সোনার প্রতিমার মত গায়ের রঙ ছিল।

তোমার কোন মামা মাসী আর নেই এ পক্ষে ?

নাঃ! সবকিছু পেয়েছে ওই ছোটমাসী। সব দেখতে পারে না। বারো ভুতে লুটে পুটে খায়। পাড়ার ছেলেরা আছে। পাতানো দাদারা আছে। সব আসে। দেখতে পাবে একে একে

জয়শ্রীর সঙ্গে ঘুরতে ভালই লাগছিল রঘুনাথের। বলল, ভাড়াটা ঠিক করে দাও। আমি এখানে পাকাপাকিই থাকব। পারবে ?

তুমিও তো বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছো জয়শ্রী

এলেও। এটা তো আমার দাদুর বাড়ি।

জায়গাটা আমার ভাল লাগছে। আগেকার চাতাল। কতটা খোলামেলা দেখেছো। একজন কাজের লোক জুটিয়ে নিতে হবে আমায়। কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড।

হ্যাঁ। ঘর ঝাঁট দেবে। রাঁধবে। পারলে রিকসা সাইকেল চালাবে

দি আইডিয়া জয়শ্রী। একটা রিক্সা-সাইকেল কিনতে হবে। তার আগে কলকাতায় গিয়ে এদিক ওদিক পাওনা যা পাবো, তা কুড়িয়ে নিয়ে এসে এখানে জমা দিতে হবে।

হ্যাঁ। একটা অ্যাকাউন্ট খুললে তোমার সুবিধেই হবে।

আমার মনে হয় জয়শ্রী - বাকি জীবন আমি এখানেই থেকে যাবো।

সে অনেক দেরি। এখন তো আমি সাঁতার কাটবো।

জানো-

অনেকদিন আগে শিখেছিলাম।

দেখো। অনেক গভীর কিন্তু দীঘি।

তুমি নামবে ?

রঘুনাথ মাথা নেড়ে বলল, অনেকদিন সাঁতার কাটিনি। কী হয় বলা যায় না। বরং ঘাটে বসে আমি তোমার সাঁতার দেখবো।

ব্যাপারটা প্রায় রাজা রাজড়াদের মত হয়ে গেল। বুকের কাছে কলসী

উপুড় করে মুখে জলের ফোয়ারা তুলতে তুলতে বিশাল দীঘিতে জয়শ্রী ভেসে উঠলো। মাথায় শক্ত করে চুল বেঁধেছে। হাঁটু অব্দি ভিজে পা ভাঁজ হয়ে জল কাটতে লাগলো। রঘুনাথ সেন যেন ফ্রান্সের কোন নির্জন ভিলায় বসে আছেন, এমনিই তার মনে হল। এই অভিনব দৃশ্যের নির্জন সাক্ষী। যেন তাঁর স্থাপত্যবিদ্যা শেখার কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি ছাত্রজীবনে ফ্রান্সের গ্রাম-গঞ্জে কোন দুর্গঘেরা ভিলায় বসে একাকী এ ছবি দেখছেন। জয়শ্রীর জলে ভেজা অ্যানাটমিকে এই প্রথম রঘুর গর্বিত, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ বোধ হল।

ঘাটে উঠে একটিও কথা না বলে জয়শ্রী ভিজে কাপড়ে কলসী কাঁখে দুর্বা ঘাসের ভেতর এক একখানা ইট খুঁজে খুঁজে তাতে পা দিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

ক'দিন পরে কলকাতায় গিয়ে রঘুনাথ সেন নিজের বাড়িতে গেল না। গেল না দি কেভ-এ নিজের অফিসেও।

বড় বড় বাড়ি, কমপ্লেক্স ছাড়াও এর-ওর অনুরোধে রঘু সেন অনেক ছোট-খাটো কাজও অবসরে করে দিত। তার পাওনাগণ্ডা জোড়া দিলেও তাঁর কয়েক লাখ টাকা হবে। তার কয়েকটা তাগাদা দিয়ে তিনখানা চেক পেল রঘুনাথ সেন। সাঁইত্রিশ হাজার, একচল্লিশ হাজার আর একখানা সাতচল্লিশ হাজার টাকার। শেষ চেকের সঙ্গে খুচরো আরও কয়েক হাজার টাকাও পেল রঘুনাথ। এটা সে-বাড়ির শেষ দিককার হ্যাবিটেশন স্থখ বাড়াবার জন্যে রঘুনাথ সেনের দামী পরামর্শ বাবদ।

ট্যাক্সিতে খাস গোবিন্দপুরে ফেরার পথে হাওড়ায় পারিজাত ছবিঘরের সামনে গাড়ি থামাল রঘুনাথ। রুপোর গয়নার দোকান

একজোড়া পাঁইজোর দিন তো। রুপোর—

দানা কাটা?

বড় দানার। শেষে রিঙ্ হবে।

এর আগে পথে গাড়ি থামিয়ে আরও দুটো জিনিস কিনেছে রঘুনাথ। একটা পোর্টেবল্ টি ভি। ছোট সাইজের। আর একটা টু-ইন-ওয়ান। গাছপালা, জ্যোৎস্না, দীঘির বড় জলের পাশে বসে ছোট পর্দায় ছবি দেখতে কিংবা বোতাম টিপে গান শুনতে ভাল লাগে। নয়তো অনেক সময় কথা ফুরিয়ে যায়। বিশেষ করে জয়শ্রীর তো যায়ই। রঘুনাথ কতদিন হল পৃথিবীতে এসেছে। কত দেশ দেখেছে। বিয়ে করেছে। তাঁর আঁকা নকশা ধরে কত বাড়ি উঠেছে। আর সেই তুলনায় জয়শ্রীর তো কথা ফুরিয়ে যাবারই কথা। সেখানে এই দুটি যন্ত্রের ছবি আর কথা খুব কাজে আসবে রঘুনাথের।

প্রায় বাগানের সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নামলো রঘুনাথ। এমপ্টি

করে যাবার ভাড়া দেবে এই কড়ারে ট্যাক্সিওয়ালা এসেছে। ভবা ছুটে এসে মালপত্র নামাল। বলল, আপনি বলে রাখলে মিনিবাসের ওখান থেকেই আপনাকে নিয়ে আসতাম।

অ্যাতো সব নিয়ে মিনিবাসে আসা যায় না। তাড়াতাড়ি ভাত চাপা। খিদে পেয়েছে।

ছবি দ্যাখবেন না?

ও আমি লাগাচ্ছি—বলে রঘুনাথ পোর্টেবল টি ভিটা চালু করতে বসলো।

ক'দিন হল ভবা কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড হিসেবে উদয় হয়েছে। রাঁধে মন্দ না। চাতালের একদিকে রঘুর নকশার মতে চ্যাচাড়ির ঘর উঠেছে ভবার জন্যে। কাল চেকগুলো জমা দিয়ে লোকাল ব্যাঙ্কে ক্যাশ হলেই ওকে একটা সাইকেল-রিকশা কিনে দিতে হবে। তাহলে রঘুর এদিক-ওদিক ঘোরা ফেরা ফ্রিতেই হয়ে যাবে। আর ভবা রান্না ছাড়াও ঘরদোর ঝাঁটপাট দেয় জুতোয় কালি করে। বাসন মাজে। জামাকাপড় কেচে দেয়।

বহু বছর পরে এই খাস গোবিন্দপুরে নিজেকে স্বাধীন লাগে রঘুর। টি ভি চালু হতেই কোত্থেকে জয়শ্রী এসে গেল।

কোথায় ছিলে?

ছোট মাসী একটা জায়গা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। যদি তুমি কোনো—

আমি! আমি জমি কিনতে যাবো কোন্ দুঃখে? এই তো বেশ আছি একশো কুড়ি টাকা ভাড়ায়।

ছোট মাসী বলছিল—চিরকাল কি এমন ভাড়াটে হয়েই থাকবে!

চিরকাল জিনিসটা কতবড় তুমি জানো জয়শ্রী? আমার এই বয়সে চিরকাল তো আর বেশিদিনের না! তার চেয়ে এই টি ভি দ্যাখো। ছোট মাসীকে দেখাও।

জমি দেখতে গিয়ে হেঁটে হেঁটে কোমরে ব্যাথা উঠেছে মাসীর—

তাহলে তুমি বোসো। পাশেই বোসো। সারাদিন কি নিয়ে কাটাবে? তাই টি.ভি-টা নিয়ে এলাম। টু-ইন-ওয়ান এনেছি—ইচ্ছে হলে ক্যাসেট বাজাতে পারো।

আমায় গান শোনানো,—ছবি দেখানো তোমার কাজ! তুমি না রঘু সেন—আর্কিটেক্ট। এই তোমার কাজ?

বোসো। স্থির হয়ে বোসো। তোমার অল্প বয়স। মাথা গরম করে না। আরও একটা জিনিস এনেছি—

কি?

স্থির হয়ে বোসো তো জয়শ্রী।

আমি কি খুকি নাকি? দেখাবে তো কী জিনিস? ও কি? পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

উঠো না। একজোড়া পাইজোর কিনে এনেছি। রূপোর।- বলে মনোযোগ দিয়ে দু'পায়েই পেছন দিকে আংটা আটকে দিল রঘুনাথ। দিয়ে বলল, সেদিন সাঁতারের সময় পা দাপাচ্ছিলে,—এত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তাই বলে— ?

ও কি ? উঠে দাঁড়ালে এরই ভেতর ? সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি আরেকটু দেখতাম।

উঠে দাঁড়াতে অস্বস্তি কাটলো জয়শ্রীর। তারপর সহজভাবে উঠে গিয়ে টি ভি'র কন্ট্রাস্ট ঠিক করে নিল। নিয়ে বলল, আমার কথায় এখানে এসে তোমার বড় জীবনটাই শেষে আঁকপাক করবে।—

তা কেন ? এই তো বেশ। সুন্দর দেখাবার জিনিস,—তুমি। থাকবার আশ্চর্য এক প্রাসাদ বলা যায় এটাকে। কতখানি বাঁধানো চাতাল। সামান্যই ভাড়া। ভবাও কাজকর্মগুলো শিখে নিচ্ছে। দেখেছো জয়শ্রী এসব বাড়ির খিলান কত বড়-- অথচ এতদিনেও একটু চিড় খায়নি।

এ-বাড়ি আমার দাদামশায়ের ঠাকুর্দা বানান।

দাদামশায়ের ঠাকুর্দার কীর্তি বলতে গিয়ে জয়শ্রীর সারা মুখে একটা চাপা গর্ব ছড়িয়ে পড়ল। বয়সের সঙ্গে মানানসই এই গর্বের সঙ্গে অনেকদিন কোন পরিচয় ছিল না রঘুর। সেই কোন্ এককালে,—তার যখন নতুন বিয়ে হয়েছে, - তখন সম্ভবত সাবিত্রীর মুখে এমন আভা ছড়িয়ে পড়তো।

খাস গোবিন্দপুরের মত জায়গায় একসঙ্গে তিনখানা চেকে লাখ টাকার ওপর দিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলাটা চাপা থাকার কথা নয়। ব্যাঙ্ক থেকেই চাউর হল কথাটা। তারপর চেক ক্যাশ হতেই নগদ চৌদ্দশো টাকায় নতুন সাইকেল-রিকশা এল ভবার জন্যে। সাইকেল-রিকশাটাই যেন রঘুনাথের সচ্ছলতায় চলন্ত শ্লোগান।

ভবা রাধে। দীঘিতে সাঁতরায়। কাপড় কাচে। আবার রঘু আর জয়শ্রীকে নিয়ে প্যাডেল করে কাঁহা কাঁহা মুলুক টহল দিয়ে ফেরে। ফলে চেহারাটাও রঘুনাথের চেনা হয়ে গেল লোকাল মানুষজনের কাছে। জয়শ্রীকে তারা বলে দত্ত বাড়ির নাতনি।

দীঘি ঘিরে জয়শ্রীর দাদামশায়ের বাগানটাও বিশাল। তার বাইরেই বাস রাস্তা। সেখান থেকে চলন্ত বাস একটা বিজ্ বিজ্ মতো শব্দ এখান দিয়ে যাবার সময় বাগানে পাঠিয়ে দেয়।

এই খোলামেলা অলস গাছপালার ভেতর সকাল আসে। জয়শ্রী টু-ইন-ওয়ানে ক্যাসেট চাপিয়ে ছোট পিঁড়িতে বসে। মাথা পেছন দিকে হেলানো। ছোট মাসী আদর করে বাড়িতে তৈরি নারকেল তেল মাখাচ্ছে জয়শ্রীর লম্বা চুল।

চুলে। ভবা তার নতুন রিকশা-সাইকেলে তেল দিচ্ছিল। আর বড় ড্রইং পেপারে কী এক বাড়ির নকশা আঁকতে আঁকতে রঘুনাথ দেখলো—অনেকটা তোলা শাড়ির বাইরে জয়শ্রীর পায়ে মোটা দানার রূপোর পাইজোর চিকচিক করছে। যেন ওখানটার জগৎ সংসার স্থির হয়ে গেল রঘুনাথের।

তার চার বছর বাদে তার ষাট হবে। সে জানে না, তার এই নতুন বন্ধু জয়শ্রীর মনের দুয়ারে কী করে কপাট খুলতে হয়। এও এক শিল্প। তার রীত্‌ প্রকরণ আছে। হয়তো বা বয়সে এক সময় তা জানতো রঘুনাথ। কিন্তু এখন সে ভালভাবে মনেও করতে পারে না,—কীভাবে কী সুবাদে সে জয়শ্রীর ওষ্ঠে একটি চুম্বন স্থাপন করতে পারে। এর চেয়ে যেন কান্টিলভার ছাদের ভেতরকার লোহার খাঁচা বসানো অনেক সোজা, - ঢালাইয়ের আগে, - মশলা নামিয়ে দেবার পূর্ব মুহূর্তে।

অবিবাহিতা ছোট মাসার চুয়াল্লিশ—পঁয়তাল্লিশ হবে। দেখায় আরও কম। সে ভাল করে জয়শ্রীর একটা তেল চুকচুকে বিড়ে খোঁপা বেঁধে দিয়ে বলল, দিদি বেঁচে থাকলে তুই এখন টই টই করে ঘুরে বেড়াতে পারতিস্‌ ?

ঘুরাছ কোথায় মাসা ? তোমার এখানেই তো থিতু হয়ে আছি।

আগানে-বাগানে ঘুরাছস। আর তোর জন্যে মানুষটা খাস গোবিন্দপুরে এসে পড়ে আছে।

ও কথা বলতে নেই মাসা। ও তো আমার বন্ধু।

কেমন বন্ধুরে! বলেই ছোট মাসা রঘুনাথের কাছে উঠে গেল।

ওসব কা আঁকা হচ্ছে ?

রঘুনাথ বলল, চুপটি করে বসে দেখুন না। আপনার জন্যে আঁকাছ।

বাড়ি মনে হচ্ছে—

কোন জবাব দিল না রঘুনাথ। খানিক বাদে বলল, এবার দেখুন তো। চিনতে পারেন কি না। এটা অবশ্য প্রিলিমিনারি—

খানিকটা উল্টে পাল্টে দেখে ছোট মাসা বলল, আমাদের দাঘর পাড় ধরে বাংলো বাড়ির মতো—

এগজাক্টলি।

কে বানাবে ?

আপনি।

পয়সা কোথায় ?

পয়সা বেশি লাগবে না ছোট মাসী। আর বেশি পয়সা দিয়ে বানালে এ জিনিস জবড়জং হয়ে পড়বে।

রঘুনাথের এ-কথায় পিঁড়ি থেকে উঠে এল জয়শ্রী। চানের আগে তেল চুকচুকে বিড়ে খোঁপা। তুলে পরা শাড়ির বাইরে পা কামড়ানো পাইজোর।

জয়শ্রী জানতে চাইল। এগুলো কিসের বাংলো?

দীঘির চারদিক ঘিরে চারটে বাংলো বাড়ি। এখানে অঢেল বাঁশ রয়েছে। রয়েছে বাজে-পোড়া তাল খেজুরের বাতিল গাছ। সেগুলো চেরাই করে আলকাতারা মাখিয়ে নিতে হবে। মাটির অভাব নেই। কয়েকটা ঢিবি দেখলাম। মাটি কেটে টালি পুড়িয়ে নেওয়া চলবে। ভিতের মাটিও হবে। দেওয়ালেও চলবে বেশ।

সেনমশায় বাংলো বানাতে চান। বুঝলাম। কার জন্যে? একসঙ্গে চার চারখানা?

আপনার জন্যে, আপনার জন্যে ছোট মাসী। কলকাতার এত কাছে—কত লোক ছুটি কাটাতে আসবে। বনভোজনের হালকা বাসন রাখবেন। আমি মিস্ত্রি দিয়ে বাঁশের চৌকি, সোফা সব ডিজাইন মতো বানিয়ে দেব। আপনার একটা পার্মানেন্ট আয় হবে।

দি আইডিয়া—বলে এক পায়ের তিন চক্কর খেল জয়শ্রী। খেয়ে বলল, স্বরস্বতী লক্ষ্মী দুইই তোমার মাথায় একসঙ্গে খেলে।

ছোট মাসী বলল, তাহলে তো বিজনকে ডাকতে হয়।

বিজন কে?

সরকারি কোন্ স্কুলে পাশ দিয়েছিল। কোনো কাজ পায়নি। গোবিন্দপুরেই এর-ওর ঘর ছায়। বাড়ির কাঠামো দুর্বল হলে বাঁশ কাঠ দিয়ে প্যালার ব্যবস্থা করে।

জয়শ্রী বলল, আমি বাবা এখন চান করিগে।

বাংলো হয়ে গেলে ওখানে তো এমন চান করা যাবে না—!

মাছির মতো রঘুনাথ গিয়ে ঘাটলায় পা ডুবিয়ে বসলো।

খাস গোবিন্দপুরের বাইরেই ধানের মাঠ। পাশেও ধানের মাঠ। বসতি বাড়ছে আর চাষের জায়গা বাস্তুভিটে নয়তো ইটখোলা হয়ে যাচ্ছে। মিনিবাসের প্যাসেঞ্জাররাও দেখতে পায়, জলদি জাতের কার্তিকরাঙা ধান কেটে গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে চাষী বা গেরস্থ বাড়ি ফিরছে। নিজের উঠোনে খামার করতে। অথচ এখান থেকে মিনিবাসে আধ ঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট এগোলেই হাওড়া ময়দান।

এখন জয়শ্রী পোস্টকার্ড লিখছে।

শ্রীচরণেষু বাবা,

তোমার পাঠানো গরম চাদর পেয়েছি। এখানে এখনো তেমন শীত পড়েনি। কোন চিন্তা কোরো না। রঘুবাবু আছেন তোমার শ্বশুরমশায়ের বৈঠকখানাটি ভাড়া নিয়ে। দাদুর এই বিশাল বৈঠকখানা রঘুবাবুর হাতে পড়ে

নতুন চেহারা পেয়েছে। ছোট মাসী আগামী সপ্তাহে তোমার ওখানে গেলে মায়ের আলমারি খুলে আমার স্কার্ট আর দু'খানা সিল্কের শাড়ি পাঠিয়ে দিও।

জনকল্যাণের নেশায় মামলায় আর নিজেকে জড়িও না। দ্যাখো তো রঘুনাথ সেন কেমন বেরিয়ে এসেছেন। আমার প্রণাম নিও। —ইতি জয়শ্রী।

ছোট মাসীর জড়তা কম। এই দেড় দু মাসে সেনমশায় তার ঘরের লোক হয়ে উঠেছে। অসম্ভব স্বাধীন স্বাধীন ভাব বলে ছোট মাসীর আর বিয়ে করা হয়নি। এখানকারই স্কুলে পড়েছে কলেজে দু'বছর গেছে হাওড়ায়। গান শিখেছে একসময়। তারই একটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছিল নিজের বারান্দায় বসে। হারমোনিয়ম বাজিয়ে। তার ওপর একখানা ছোট ছাপা বই।

সখী। তারে ভুলব কেমনে।
মন সঁপিয়াছি যারে আপন জ্ঞানে॥

গাঢ় গলা। সুরেলাও বেশ। গান থামিয়ে ছোট মাসী বলল, বাবা গান ভালবাসেন। এই বইখানা তখনকার। ছোট্ট বইখানার মলাটে লেখা—

বড়দিনের নূতন রেকর্ড সঙ্গীত
ডিসেম্বর ১৯২১
এম এল সাহা
৫।১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম 'বাগ্‌যন্ত্র কলিকাতা'। টেলিফোন নং ২২৯০।

আশ্চর্য! এতদিনকার বই রয়ে গেছে?

বাবার বইপত্তর সবই প্রায় রাখা আছে সেনমশায়।

রঘুনাথের চোখ এক জায়গায় আটকে গেল। এককালীন এক হাজার 'কুকুর' মার্কা পিন লইলে উহা পাঠাইবার ডাক ও প্যাকিং খরচ আমরা বহন করিয়া থাকি। আপনার আদেশের অপেক্ষায় রহিলাম।

এর পরেই লেখা—মানদা সুন্দরী দাসী। ঝিঁঝিট—

সখী। তারে ভুলব কেমনে।
মন সঁপিয়াছি যারে আপন জ্ঞানে॥

ছোট মাসীর কাছে তুমি শিখলে পারো জয়শ্রী।

আমি তো ওকে নিয়ে বসতে চাই। ও কি বসবে!

জয়শ্রী চাতালের এক ধাপ নিচে বসে ছিল। সেখানে বসে এইমাত্র চিঠি লেখা শেষ করেছে। বলল, শিখে কি হবে? আমি এমনি খালি গলায় গাইতে পারি।

রঘুনাথ বলল, এ কলি গাও তো।

এখন কি গানের সময়? বলেই ধাই ধাই করে পা ফেলে নিচের বাগানে

নেমে গেল। সেদিকে তাকিয়ে ছিল রঘুনাথ। ছোট মাসীর কথায় তার সে ঘোর কাটলো।

পঁচাশিটা নারকেল গাছের ডাব-নারকেল বেচে তবে ডাকঘরে জমানো টাকা। সেই টাকা ভেঙে আপনার নকশামতো হলিডে হোম বানানো হচ্ছে। টাকা উঠবে তো সেনমশায় ?

একই বছরে উঠবে না। কিন্তু বছর বছর আপনি টাকা পেতেই থাকবেন। যত নাম ছড়াবে হসপিটালিটির —ততই খদ্দের আসবে। দেখবেন।

ছোট মাসী দীঘির পাড়ে তাকালো। সেখানে বিজন পয়লা বাংলোটার আড়াকাঠামোয় লোক তুলে হাতুড়ি পেরেকের কাজ সারছিল। দীঘির পাড়ের বাগানে হাতুড়ি মারার শব্দে পাখির দল উড়ে উড়ে গাছ পালটে বসছে।

ঠিক এই সময় চাতালের লাগোয়া বাগানের সামনে একখানা চকচকে মারুতি এসে থামল। ভবা ছুটে গিয়ে একদম সামনে। দরজা খুলে প্রথমে একজন বয়স্ক লোক বেরোলো। এখানে রঘুনাথ সেন ?

ওই তো বাবু বসে—

লোকটি গাড়ির দরজায় মুখ রেখে ভেতরে সেকথা বলতেই উল্টোদিকের দরজা খুলে যে বেরিয়ে এল তাকে দেখে রঘুনাথ সেন উঠে দাঁড়ালেন। ছন্দা, —তুই ?

হ্যাঁ বাবা। আমার মক্কেলই তোমার এ ঠিকানা দিল। ভদ্রলোকের এটা শ্বশুরবাড়ি।

আয় বোস ?

ছোট মাসী তটস্থ হয়ে একখানা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে গেল।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করে ছন্দা সেন বলল, তোমায় নিতে এসেছি বাবা। কলকাতা তোমায় ডাকছে। তোমার মত একজন প্রোফেশনালের জায়গা এটা হতে পারে না।

আমার প্রফেশন মতো ওই বাংলাগুলো তৈরি করছি। দীঘির পাড়ে।

দূরে তাকাতে গিয়ে জয়শ্রীর ওপর চোখ পড়ল। সেখান থেকে চোখ সরিয়ে ছন্দা সেন দীঘির পাড়ে তাকালো। ওই বাঁশের ঘরগুলো ?

হ্যাঁ। ওখানে হলিডে হোম হবে। নেচারের সঙ্গে ব্যালান্স রেখে বানানো।

এই তোমার কাজ বাবা!

আমার কাজ তো ছিল ধোপার মাঠে নতুন কমপ্লেক্স। সেখানে তুমি আমার এগেনেস্ট্ পার্টির কেস নিয়েছো ছন্দা।

এটা আমার প্রফেশন বাবা।

আমিও আমার প্রফেশনের বাইরে যাইনি মা।

তুমি তাহলে যাবে না।—বলে গট গট করে ছন্দা সেন নেমে গিয়ে গাড়ির

দরজা খুলে স্টিয়ারিংয়ে বসলো। নিমেষে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি বেরিয়ে গেল।

জয়শ্রী রঘুনাথকে বলল, তোমার মেয়ে সাজতে জানে। রীতিমত জবরদস্ত।

রঘুনাথ কোন জবাব দিল না। ছোট মাসী বলল, হবে না—ব্যারিস্টার তো! এবারও রঘুনাথ কোন জবাব দিল না।

খাস গোবিন্দপুরে সূক্ষ্ম কাজে বিজনের ডাক পড়ে থাকে। এখানে তারই দেখাশোনায় জয়শ্রীর দাদামশায়ের বাগান থেকে মোটা গুঁড়ির বাঁশ কাটানো হয়েছে। সে-ই রঘুনাথের নকশা মতো জনমজুর দিয়ে গর্ত খুঁড়িয়েছে মাটি ফেলিয়েছে—আবার টালি ছাদের আড়া ফেলেছে। দেখে বয়স বোঝা যায় না। ছোট মাসী এখানকার লোক বলে সবই জানে। সে বলে, বিজন তো? তা তিরিশ হয়েছে।

এই বিজনের মাথাটি টাক হলেও শরীরটি সুন্দর। স্থপতি হিসেবে রঘুনাথ সেন চোখ বুজে একটা আন্দাজ পায়। জামা-প্যান্টের নিচে আদ বিজন কেমন। বেঢপ নয়। সুগঠিত। একটা সিমেট্রি আছে হাড়ে মাসে। ওর শরীরে যেমন বিনয়,—তেমনি রাগ, খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। রঘুনাথের এক এক সময় মনে হয়,—বিজন বুঝি বা জীবনেরই ট্রেস পেপার। আবার রঘুনাথেরও খুব ভক্ত। ডাকলেই বলে, যাই স্যার।

রঘুনাথ জানতে চেয়েছে—তুমি কতদূর পড়েছো।

আমি টেকনিক্যাল স্কুলে কাঠের কাজ--রং পালিশ এইসবে পাশ।

কোথাও কাজ করেছো?

সরকারি কারপেন্টার ছিলাম। পোষায় নি। ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।

সেই বিজন এই এক দু মাসে এখন দিব্যি সেট স্কোয়ার ধরে। নকশা ধরে সরেজমিনে দাগ দেয়। চাতালে বসে রঘুনাথ দেখতে পায় বিজন কাজের ঘোরে নতুন বাংলোর কাঁচা বারান্দা থেকে জয়শ্রীকে নেমে যেতে বলছে। জয়শ্রী যেন টেনে তাকিয়ে রাগে রাগে নেমে এল।

রান্নাবান্না, ঘরের কাজ করে ভবাকে এখন খাস গোবিন্দপুরে রিক্সা-সাইকেল চালাতে হয়। কেননা, দেশ থেকে ভবার বউ এসেছে। তার খরচ আছে।

খরচ এখন এখানে সবারই। রঘুনাথের পরামর্শে বাঁশ বাগানের গোড়াতেও সার ঢালা হচ্ছে। নারকেল গাছগুলোর পুষ্টির জন্যে আগাছা উপড়ে ভাল করে গাছ ছেয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-ঠাকুর্দার আমলের গাছ ভাঙিয়ে চার চারটে আপ-টু-ডেট হলিডে বাংলো উঠছে। চারদিক মাথা ঘামাতে হবে না।

আর রঘুনাথ? তার টাকা এখানকার ব্যাঙ্কে ডিম পাড়ে। নইলে এখন যা তার সংসার তা চলতো না। দুটো বাচ্চা সমেত ভবার বউ এসেছে

দেশ থেকে। ভবার বউই কেমন রান্না করে। হাঁড়ি একই। তা বোঝে রঘুনাথ। তার মনে হয়—থাক না চাট্টি। তাতে হয়েছে কি? আমার তো আছে। বাচ্চা দুটোর অক্ষর পরিচয় হয়নি। সন্ধে হলে ভবার বউ সে দুটোকে রঘুর কাছে এনে মাদুর পেতে দেয়,—বর্ণ পরিচয় সুদ্ধ।

রঘুনাথ পড়ায়···· অ-আ।

বাচ্চা দুটো পিঠোপিঠি। একসঙ্গে নামতা পড়ে যেন। অ-আ—।

রঘুনাথের মন্দ লাগে না। এ তার এক নতুন সংসার। জয়শ্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে পাওয়া। আর এই সন্ধেবেলাতেই সারাদিন পরে চাতালে বসে হিসেব নিকেশ। মজুর পরিষ্কার। বিজনের হিসাব কিতাব। সব। এই নিয়েই এখন রঘুনাথ সেনের নতুন খাস গোবিন্দপুর।

নতুন শীতের বাতাস। দুপুরের দিকে গাছ থেকে পেড়ে আমলকি খাওয়ার ইচ্ছে হল রঘুনাথের। সে দীঘির উল্টোদিকের নির্জন দিক ঘেঁষে গাছতলায় যাচ্ছিল। হঠাৎ প্রায় সাপের মতো তার চোখের সামনে দিয়ে জয়শ্রী ছুটে গেল। একটুবাদে পেছন পেছন বিজন।

রঘুনাথ এগিয়ে যেতে বিজন পথ পালটে নতুন বাংলোর দিকে চলে গেল। তখনো বিচে কলার ঝাড়ের সামনে নতুন মাটিতে জয়শ্রী পড়ে আছে।

রঘুনাথ গিয়ে হাত ধরে ওঠালো। কি হয়েছিল?

ও কিচ্ছু না।

শাড়ি সরে যেতে নজরে পড়লো রঘুনাথের। বাঁ পায়ের পাঁইজোর কোথায়?

কোথায় পড়ে গেছে—জানি না।

ঠক্ করে বুকের ভেতর লাগল রঘুনাথের। জানো না মানে? আমি অত কষ্ট করে নিয়ে এলাম—

চান করতে গিয়ে দীঘিতে পড়তে পারে।

দীঘিতে?

কিংবা ছোটো মাসীর ঘরে।

ছোটো মাসীর ঘরে?

কিংবা বাগানেও পড়তে পারে। বলে চলে যাচ্ছিল জয়শ্রী।

দাঁড়াও। বিজন এদিকে এসেছিল না?

কী বলব। সবসময় খুনসুটি করে।

তুমি করতে দাও বলে

ওঃ! অমনি পুরুষমানুষ জেগে উঠল ভেতরে।

আমি তোমার বন্ধু। আমি তোমার সম্পত্তি নই।

এ কথা বললে কেন জয়শ্রী?

মনে এল, তাই বললাম।

রঘুনাথ বুঝলো, বন্ধুত্ব, ভালবাসা আকাশের মেঘের মতো। সবসময় জায়গা বদলাচ্ছে। সে থরো থরো পায়ে নিজের চাতালে ফিরে এল জায়গাটা তার নতুন স্টেশন। এখানে তার নতুন ঘর সংসার। ভবা-ভবার বউ-বাচ্চা জুটো, সাইকেল-রিকশা, পোর্টেবল্ টি ভি, টু-ইন-ওয়ান থাকে। ভবা সাইকেল-রিকশার মতোই টি ভি আর টু-ইন-ওয়ান হ্যাণ্ডেল করে। যেমন ওর বউ কড়ায় ডাল সেদ্ধ চাপায়।

সন্ধেবেলা হিসেব নিতে বসে বিজনের গোলমাল ধরা পড়ল। প্রতি আড়ায় একজোড়া করে বেশি মজুর ধরে আসছে। কদিন ধরে এরকম করে আসছে কে জানে! এভাবে চললে তো ছোট মামার হাউসিং স্কিমের কস্ট এসক্যালেশন ঠেকানো যাবে না। আরও কোথায় মেরেছে—বা মেরে চলেছে—কে জানে।

এভাবে চললে হবে বিজন?

কন্সট্রাকশনে এমন একটু-আধটু তো হবেই স্যার।

এটা একটু-আধটু হল বিজন? এর ওপর তুমিই দেখছো টালিখোলা। টালি পুড়বে তোমারই সুপারভিশনে। সেখানেও যদি এমন হয়?

ঘরদোর বানাতে গেলে এসব সহ্য করতে হয় স্যার।

কী বলে ছেলেটা, ভেবে পায় না রঘুনাথ সেন। দি কেভ্-এর অফিসে বসে এমন কথা কোনদিন শুনতে হয়নি তার। এসব কেসে সিধে ছেঁটে বাদ দেওয়াই তো রেওয়াজ। কিন্তু এখানে সে উপায় নেই। টালিখোলার টালি পোড়ানো সবটাই দেখাশুনো করছে বিজন। টালিগুলো ছাঁচ থেকে বের করে রোদে শুকনো সারা। এখন পোড়ানোর আগে একটা বৃষ্টি হলেই চিত্তির। সব মাল গলে ফের মাটি হয়ে যাবে। এই অবস্থায় বিজনকে বিদায় দেওয়ার বিপদ অনেক।

নিজের তোলা কিল নিজে গিলে খেল রঘুনাথ। ভেতরে ভেতরে তার মন তখন ভারি হয়ে উঠেছে।

টালিখোলার টালি পোড়াবার গুঁড়ো কয়লা এল এক লরি। সাঁইত্রিশশো টাকা গুণে দিয়ে ছোট মামা বলল, তরা ঘাটে ভিড়বে তো সেনমশায়?

দেখুন না। কাঠামো তো দাঁড়িয়ে গেছে। ছাদে লাল টালিটা পড়বে। আর চ্যাচারের দেওয়াল তুলে ইয়েলো রংটা মারতে হবে। মেঝেতে কলকাতা থেকে দড়ির কার্পেট এনে বসাবো।

আলো?

এখনকার মতো এখান থেকে, লাইন টেনে দেব। টয়লেট মডার্ন। ছোট সিনটেক্স জলের ট্যাঙ্ক ঘরের পেছনে বসবে। একটু উঁচুতে। বিজন কোথায়?

এই তো ছিল।

রঘুনাথের আসল প্রশ্নটা ছিল, জয়শ্রী কোথায়? কিন্তু তা তো সরাসরি করতে পারে না। চোখে আটকায়। লরি চলে যাবার পর বিকেল যেন বড় তাড়াতাড়ি চলে আসছিল। হাঁটতে হাঁটতে নতুন বাংলোর হাতায় গিয়ে বিজনের খোঁজ করল রঘুনাথ।

হেডামাস্ত্র বলল, বিজনদাদা তো সার্কাসে গেছেন।

সার্কাসে? কোথায় হচ্ছে?

কেন? আপনি জানেন না? সরকার মাঠে।

ফিরে এসে ভবার খোঁজ করল। ভবা নেই। সাইকেল-রিকশা নিয়ে মিনিবাস স্ট্যাণ্ডে ট্রিপ ধরতে গেছে ভবার বউ টু-ইন-ওয়ানটা বাজাচ্ছিল। আর কুটনো কুটছিল। বাচ্চা দুটো খেলছে।

পাজামার ওপর পাঞ্জাবী গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল রঘুনাথ সেন। খাস গোবিন্দপুর এমন কিছু বড় জায়গা নয়। ব্যাঙ্কের দোতলা বাড়ি পেরিয়েই সরকার মাঠ। শীতের মুখে অন্য বছরের মত এবারও সার্কাস এসেছে।

দুপুরের ট্রিপ প্রায় শেষ। একটা দুর্গন্ধ যুক্ত বাঘের সামনে ছাগল ছেড়ে দিয়ে খেলা দেখানো হচ্ছিল। সঙ্গে কেটেল ড্রাম আর ক্ল্যারিওনেটের বাজনা ওপরে মাস্তুল থেকে ফ্লাড লাইট। ভেতরে দর্শকদেব মুখ চেনা যায় না। শুধু কালো কালো মাথা। এর ভেতর বিজনের সলিড টাকে আলো পড়ে যেন ফিরে আসছিল। পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিয়েই বিজনকে চিনলো রঘুনাথ। পাশে বসা জয়শ্রীকেও চিনতে কষ্ট হল না কোন। জয়শ্রী যে কোন জিনিস দেখে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায়। এখানেও তাই করছিল।

রঘুনাথ বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে সারাটা খাস গোবিন্দপুর তার বিলকুল ফাঁকা লাগল সে কোনদিন আগ বাড়িয়ে জয়শ্রীর হাত দু'খানা ধরেনি। একবারও ডান হাতে জয়শ্রীকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট লাগায়নি। কেননা তেমন ইচ্ছে হয়নি। তাছাড়া ওসব তো বহু বছর হল সে করেনি। সাবিত্রী সেন নামে তার স্ত্রীর সঙ্গে রঘুনাথের একসময় এসব কিছু কিছু হয়। কিন্তু সেটাই তার জীবনে প্রধান ছিল না।

সন্ধ্যার আলোয় শীতকালে একটা আলাদা মজা থাকে বিশেষত খাস গোবিন্দপুরের মত জায়গায়। ধান উঠছে। সার্কাস চলছে। সাইকেলের দোকানের সামনে ছাঁকা তেলে আলুর চপ ডাঁই হয়ে ভেজে উঠছে। এ কোন্ অজানা পৃথিবীকে আত্মীয় ভেবে আমি মজে আছি? আমি কারও নই। কেউ আমার নয়।

আমি কিছুটা এগোলে জয়শ্রী শান্ত হত? এগোনো মানে কি? তা কি ভালবাসার চেয়েও বড়। আমার নিজের শরীরটাই টোল খেয়েছে। আমি

তো আর তেমন নেই। আমি কী করে জয়শ্রীর শরীর শ্রীতে হাত রাখি। ভালবাসতে গিয়ে এসব ইচ্ছেও তো আসে না মনে।

বাড়ি ফিরে দেখলো— ছোট মাসী গাইছে

বাঁধা যার কাছে মন।
সে করে অযতন ॥
যতন করিয়ে হৃদে ধরি যারে
সে যদি গো মোরে অযতন করে—

চাতাল গড়িয়ে মাসীর গলা দীঘির ঘাটলায় গিয়ে পড়ছে। রঘুনাথ কোন শব্দ না করে চাতালের এক কোণে বসলো। ছোট মাসীর মন কার কাছে বাঁধা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না রঘুনাথ। এই মহিলার যেন অতি অল্প বয়সেই তার বাবার আমলের দীঘি, নারকেল গাছ, বাঁশ বাগানের সঙ্গে মালা বদল হয়ে গেছে। তারা তো ছোট মাসীকে অযত্ন করেন। সেই বাঁশ কেটে বাংলো। বাজে-পড়া নারকেল গাছ চিরেই বাংলো ঘরের আড়ামুড়ো হয়েছে। দীঘির পাড়ের মাটির ঢিবি উড়িয়ে দিয়েই নতুন বাংলোর ভিত। এখন দীঘি ঘিরে যখন রঙিন বাংলো চারটে দাঁড়াবে,—তখন তারাই তো বেড়াতে আসা পার্টি ধরে ধরে ছোট মাসীর আয়ের একটা পাকা রাস্তা করবে।

ছোট মাসীর তুলনায় তার নিজের অবস্থা একদম ভিন্ন। সে নিজে একজন প্রফেসনাল। সেই প্রফেসন— তার জেদ তার মামলা, নকশা সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে এখানে জয়শ্রীর বন্ধু হতে আসে। এই বয়সে ভরভরাট সংসার পেছনে রেখে বন্ধু হওয়ার জন্যে রঘুনাথ খাস গোবিন্দপুরে ঝাঁপ দিয়েছিল। এখন রঘুনাথের মনে হচ্ছে কী যেন হারিয়ে গেছে। ওই দীঘিতে। নয়তো ঘরে, কিংবা বাগানে।

আচমকা গান থামিয়ে ছোট মাসী বলল, অসময়ে আকাশ কেমন কালো করে এসেছে না?

এখন মেঘ কোত্থেকে আসবে? ও এমনি শীতের অন্ধকার করে আসা কালো।

উঁহুঁ। আমার মনে হয়-রাতে বৃষ্টি হবে সেনমশায়।

তাহলে তো ভাবনায় ফেললেন। খোলায় সবে টালি চেপেছে।

এই যে রাজনন্দিনী! ঘোরা হল?

ছোট মাসীর এ-কথার জবাব দিতে দিতে চাতাল ভেঙে জয়শ্রী বারান্দায় উঠল। জবাবটা অনেকটা এরকম জন্তু-জানোয়ার-মানুষজনের কী বোটকা গন্ধ তাঁবুর ভেতর। শুধু বিজনদার উৎসাহের জন্যে—

এর বেশির ভাগ কথাই কানে গেল না রঘুনাথের। সে যেন কোন মন্দির

চাতালে হত্যে দিয়ে বসে আছে। কোন মানসিক নিয়ে। তার মনের ভেতরটা বিজনের নাম শুনেই হু হু করে উঠলো।

রাত আটটা নাগাদ ছোট মাসীর কথাই ফলে গেল। হিমেল বাতাসের সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এল। টালিখোলার মাথার ওপর আগুনের হলকা গুঁড়ি বৃষ্টিতে থেতলে যাচ্ছে। থাক থাক টালির ভেতর দিয়ে উঠে আসা গুমসানো আগুন ওপরের বাতাসে পৌছেই ভিজে যাচ্ছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। সেদিকে তাকিয়ে রঘুনাথ বলল, নিচের দিকের টালিগুলো বেঁচে যাবে। বৃষ্টি বাড়লে অবশ্য অন্য কথা—

রাত দশটা নাগাদ জোরে বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি। বাতাসে বাঁশ বাগানে মড় মড়। ছোট মাসী খাওয়া ফেলে চাতালে এসে দাঁড়াল। চোখ টালিখোলায়।

রঘুনাথ ডাকলো, ভিজে কী করবেন। উঠে আসুন। কিছু করা যায় না সেনমশায় ?

কী আর করা! বিজন থাকলে—

বিজনকে ডেকে পাঠান না ভবাকে দিয়ে।

কাছাকাছি ভবা রঘুনাথের জন্যে রুটি করছিল। ভবার বউ একটা পাঁচামশেলী তরকারি নামাবে উনুন থেকে। নামাবার আগে জিরের গুঁড়ো ছাড়িয়ে দিচ্ছিল। দিতে দিতে বলল এখন বিজন দাদার আসতে বয়েই গেছে। সরকার মাঠে তাঁবুর ধারে ধোরে তাকে এখন পাবেন নিশ্চিত।

খাওয়া সেরে ছোট মাসীকে ডাকতে উঠে এল জয়শ্রী। হাতে এঁটো। এসে দেখল, রঘুনাথ চাতাল মাড়িয়ে বাগানের রাস্তা ধরছে। মাসী ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মাসীর দিকে তাকিয়ে জয়শ্রী জানতে চাইল, কোথায় যাচ্ছে ?

বিজনকে ডাকতে,—যদি কিছু টালি বাঁচানো যায় ঢাকাঢুকি দিয়ে—

এত রাতে ? বিজনদাদাকে পাবে কোথায় ? বলে জয়শ্রীও বাগানের অন্ধকারে মিশে গেল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। যেমন বাতাস-তেমনি বৃষ্টির তোড় সেই সঙ্গে অন্ধকার।

রঘুনাথকে সরকার মাঠ অব্দি যেতে হল না।

ভিজে পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার কানে চেনা গলা গেল। দিশা নিয়ে বসা আড্ডায় বিজন তড়পাচ্ছে। চ্যাচারির বেড়ার বাইরে সব শোনা যায়।

রঘুনাথ চমকে থেমে দাঁড়াল অন্ধকারে।

খাস গোবিন্দপুরের কোন খাস দোস্তকে বিজন গল গল করে বলছে, আর্কিটেক্ট না ছাই! দেব বুড়ো ভামের খুলি ফাটিয়ে। দু দুটো মেয়েছেলেকে নিয়ে ফস্টিনস্টি! তারপর জুটেছে ভবার বউটা। তার বাচ্চাদেরও উনি অ আ শেখাবেন। বিদ্যেসাগর! ভবাকেও সাবধান করে দিয়েছি—

রঘুনাথের কানের ভেতর আস্ত ডেঁয়ো পিঁপড়ে ঢুকে গেল। সে কল কল করে বৃষ্টি-ভেজা সরকার মাঠে চরকি খেতে লাগল। যে পায়ের কুকুর সারাদিন স্যার স্যার করে,—ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকে—সেকি না এতটা মাথায় উঠেছে। তাকেই রঘুনাথ কলকাতার সুপারভাইজার খেটে পয়সা দিয়ে এসেছে এতদিন। আসলে বিজনেস ক্লাস একটা কাঠের মিস্ত্রি বই তো কিছু নয়। তার এত চোট?

বেশি রাতে রঘুনাথ সেন যখন ফিরল, তখন বাতাস ধরে এসেছে। কিন্তু বৃষ্টি ধরেনি। রীতিমত ঠকঠকানো শীত। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির ভেতর টালি-খোলার আগুনের ডগা থাকে বলে কুকুরের জিভ হয়ে বাতাস চাটছিল।

চাতালে কেউ নেই। ঢাকা বারান্দাতেও কেউ নেই। একটা খুব কম পাওয়ারের আলো নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। এর চেয়ে ধোপার মাঠে কমপ্লেক্স গড়ে তোলা যে অনেক সোজা ছিল। ছোট মাসার হালদে বাংলো বানাতে গিয়ে ছোট মাসাকে না দেউলিয়া হয়ে পড়তে হয়। সুইস কটেজের আদলে বানিয়ে তোলা নতুন বাংলো এখন অন্ধকারে ভিজছে।

বিছানায় শুয়ে গলা অব্দি লেপ টেনে তবে শীত গেল রঘুনাথের। কিন্তু অন্ধকারে ঘুম কিছুতেই আসতে চাইল না।

ভোর রাতে ভেজানো দরজা ঠেলে সড়াৎ করে একটা ছায়া রঘুনাথের বিছানায় এসে পড়েই লেপের ভেতর সেঁদিয়ে গেল।

কে-কে?

আঃ! বোকার মত চেঁচিও না। একটু সরে শোবে তো। কতদিন দাড়ি কামাওনি?

রঘুনাথের ঘোর কাটার আগেই জয়শ্রী তার গালের এদিক ওদিক ডবল ডবল চুমো বসিয়ে দিল। নিজের মাথা তুলে, অনেকটা ঠিক ক্রেনের মত।

এটা কি ঠিক হচ্ছে জয়শ্রী?

কি?

এইসব? আগে তো কোনদিন এমন করনি জয়শ্রী?

কাল সন্ধের মুখে যখন দেখলাম—তুমি সার্কাসের ভেতর পর্দা তুলে আমায় খুঁজছো—

মোটেই না।

হ্যাঁ। আমাকে খুঁজতেই তুমি ওখানে গিয়েছিলে। তোমায় ওভাবে দেখতে পেয়ে আমি মরে গেলাম। কতটা তোমায় টেনে নামিয়েছি আমি।

জয়শ্রী কাৎ করে রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরলো। ধরে বললো এমন করেই তুমি কাল সন্ধেয় চাতালে বসে ছিলে। যেন কত কি তোমার হারিয়ে গেছে।

গেছেই তো। আমার জয়শ্রীর সেই নির্মল মুখখানা। সেই আবিষ্কারের গম্ভীর ভাব।

আমি? আমি কবে থেকে তোমার হলাম?

জবাব দিতে সাহস হল না রঘুনাথের। সে এই পৃথিবীতে প্রায় ষাট বছরের কাছাকাছি এসেছে। তার কাছে নবীন নবনার মত জয়শ্রীর এই ধরা দেওয়া স্বপ্ন বই কিছু নয়। সে জানে এই স্বপ্ন তার ভাঙলো বলে।

রঘুনাথ আস্তে আস্তে বলল, আমি আর যুবক নেই জয়শ্রী। শরীর তার গ্রাম্বর ধর্মের বাইরে বেরোতে পারে না। আমি হয়তো তোমায় পেয়েও কিছু করতে পারবো না।

কিছু করতে হবে কেন? এমনিতেই তুমি আমার যথেষ্ট। এর বেশি আর তুমি কি করবে?

আমার মাথায় এখনো কালো চুলই বেশি। আমি সেদিক থেকে এখনো বিজন হয়ে পড়িনি।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে কুয়াশা মাখনো ভোররাতের এই অন্ধ ঘরে জয়শ্রী লেপ সরিয়ে বিছানায় সিধে হয়ে বসলো। বসেই গুম গুম করে দু'খানা কিল বসিয়ে দিল রঘুনাথের বুকে। বিজনদা আমার কাছে কোন ব্যাপারই নয়।

তাহলে তার সঙ্গে সার্কাসে যে যাও?

বাঃ! সারাদিন ঘরে পড়ে থাকবো? আর ছোট মাসীর হলিডে বাংলো গড়ে উঠতে দেখবো? আমি কোথাও বেরোবো না? আমার কোন উপাসক থাকবে না কাছাকাছি? কোন চরণদার?

তোমরা মেয়েরা বড্ড নিষ্ঠুর। বিজন তোমার এই মন বোঝে?

একজন কার্পেন্টার কতটা বুঝতে পারে! কতদূর বুঝতে পারে?

জেনে শুনে ওকে বিষ খেতে দিচ্ছো?

সে ভাবনা তোমায় নয়। বলেই রঘুনাথের বুকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল জয়শ্রী।

চিৎ হয়ে অনেককাল শোয় না রঘুনাথ। নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হয়। নিজের বাড়িতে তার ডবল বেডের গদি বিছানায় সে ঘুমোবার আগে কাৎ হয়ে নেয়। সে আস্তে বলল, নেমে শোও জয়শ্রী।

উহুঁ।

আমার কষ্ট হচ্ছে।

ওঃ!—বলে উঠে বসল জয়শ্রী। লাগলো?

না। অত বুড়ো হইনি।

আমরা তোমাদের বুড়ো না কাঁচ ভাবছি—এইটেই বোধহয় সারাদিন ভাবো তোমরা!

একদম না। আসলে তোমার মত মেয়ের সঙ্গে আমি প্রায় চল্লিশ বছর মিশিনি। আমি তোমার কিছুই জানি না।

না জেনে কত মানুষ জীবন কাটিয়ে দেয়, বল তো।

তা বটে। বলে চুপ করে গেল রঘুনাথ। একবার ভাবলো— কোন যুবক প্রেমিকের কায়দায় সে এখুনি জয়শ্রীকে পেড়ে ফেলবে। এই মেয়েটির শরীরের যেখানে সেখানে সে হাত রাখবে,— ঠোঁট রাখবে,—যেখানে জয়শ্রী শিহরণ উঠে আসা টের পাবে।

আমি কি আরেক জোড়া পাইজোর কিনে আনবো

না না। কখন খুলে পড়ে যায় টের পাই না। দরকার নেই।

আমার যেন পাইজোরের দশা।

ইস।

তোমার কাছে আছি ? না, নেই ? টেরও পাই না জয়শ্রী।

সঙ্গে সঙ্গে জয়শ্রী দু হাতে জড়িয়ে ধরলো রঘুনাথকে। আবার।

সকাল থেকে ভবা সাইকেল-রিকশায় থাক দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা কাঁচা টালিগুলো তুলে এনে এনে রাখলো। বারান্দায়। ছাদের নিচে। তার অনেকটাই পুড়ে উঠেছে। বৃষ্টির ফোঁটায় একেবারে বরবাদ হবে না। তবে জলদাগী হয়ে যাবে। তাতে খুব একটা এসে যাবে না। কিন্তু বিজন কোথায় ? বিজনের দেখা নেই।

বিজন এল বেশ বেলায়। এসেই বলল, তিনশো টাকা চাই।

কি বাবদে ?

রঘুনাথের এ-কথায় বেশ তিরিক্ষি গলায় বিজন বলল, মোটা টাকা তো ছোট মাসীর সরিয়ে নিয়ে নিজের নামে ব্যাঙ্কে তুলেছেন। সেখান থেকেই দিন।

শাট আপ। কোন্ টাকায় কোন্ অ্যাকাউন্ট তা বোঝার মত বুদ্ধি তোমার হয়নি বিজন।

মেলা বকাবেন না। মোটে তো তিনশো টাকা। দিন—

ছোট মাসীর কানে যাওয়ায় সে এগিয়ে এল। ঠাণ্ডা চাপা গলায় বলল, তোমায় রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলেন সেনমশায়। কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখো। আমার এত বড় একটা ... হয়ে গেল ঝড়-জলে,-একবারও তুমি এলে না ?

কেন ? বেশ তো সামলে গেছেন বোনঝি-মাসীতে, দিন। এবার টাকার ব্যবস্থাটা করে দিন।

জয়শ্রী কাছাকাছি ছিল। সে এবার বলল, কাজ না করে টাকা চাইতে লজ্জা করে না ?

ভগবান তো তোমাদের দু'হাতে দিয়েছেন। এত পেয়েও দিতে পারো না কেন? অমন যে আমার মাথাটা—সেটাও টাক করে ফাঁকা করে দিল ভগবান।

ভগবানকে দুষছো কেন? বল—জুয়োয় হেরেছো কাল রাতে,—তাই টাকা দরকার।

ভাঁজ করা তিনখানা একশো টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে রঘুনাথ বলল, আজ থেকে আর কাজে এসো না।

টাকাটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে বিজন কঠিন করে হাসলো। সে আমি বুঝবো। বকেয়া কাজ তুলে না দিয়ে কাটি কি করে!

বিজন চলে যেতে রঘুনাথ শেকলে বাঁধা বাঘের মতই চাতালে বেতের মোড়া পেতে বসলো। এ তো মহা মুস্কিল! কাজ করবে না টাকা দিয়ে যেতে হবে। কাজ থেকে ছাড়ালেও ছাড়বে না!

ছোটমাসী এগিয়ে এসে বলল, একটা দু'টো দুষ্টু গরু গোহালে পুষতে হয় সেনমশায়। কাজটা ওঠা অব্দি সহ্য করুন। তারপর আমি নিজেই গ্রাম পঞ্চায়েতে নালিশ ঠুকবো।

তার আগে যে ও দুয়ে নিয়ে যাবে!

তা সহ্য করতে হবে সেনমশায়—

খাস গোবিন্দপুরের বাতাসে এখন বিষাদ ভাসে। তাই তো মনে হয় রঘুনাথ সেনের। হলিডে বাংলো বানিয়ে তোলার ভেতর কোন শৃঙ্খলা নেই। আগেকার অনুগত বিজন এখন আস্ত একটি উটকো বিশৃঙ্খলা।

বাজারে বেরোতে পারে না রঘুনাথ। ভবার রিক্সা থামিয়ে লোকে তার কাছে নগদ টাকার সাহায্য চায়। বলে—আপনার তো ব্যাঙ্কে অনেক টাকা দিন না কিছু—

খাস গোবিন্দপুর যেন খয়রাতির খোলা মাঠ।

ভবার বউ অব্দি এসে বলল, আমার ছোট বোনটার বিয়ে হচ্ছে না টাকার অভাবে। যদি হাজার টাকা দিয়ে দিতেন—আমরা গতরে খেটে শুধে দিতাম।

রঘুনাথ বলেছে—আগে সাইকেল রিক্সার দামটা শোধ কর। তারপর দেখবো।

গ্রামদেশ বলতে এতকাল রঘুনাথ জানতো—গাছপালার সবুজ, দীঘির কালো জল, মাঠের দিগন্ত। এখন দেখছে সবচেয়ে বড় হল—চাহিদার হাতখানা। সবসময় তা দাও দাও করছে।

এর ভেতর জয়শ্রী যেন গায়ে আঁচটি লাগতে না দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। কোন কোনদিন নতুন বাংলোর সামনেকার বাগান থেকে কাঁচপোকা ধরে জ্যান্ত। তার পিঠটা কেটে নিয়ে টিপ পরে। এমনকি রাম তেড়িয়া বিজনের সঙ্গে হাসি মস্করায় চাপান উতোরও কাটে।

রঘুনাথ কিছু বলে না। সে টালিখোলা থেকে টালি বের করা দেখছিল। এই টালি বের করে কয়েকভাগে থাক দেওয়া হবে। দামী ছাই আলাদা বস্তায় উঠছে। পরে গাঁথুনিতে লেগে যাবে।

এমন সময় ছোটমাসী বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ভবা কোথায়? দেখছিনে তো ভোর থেকে। ওর বউ বাচ্চাই বা কোথায় গেল?

রিক্সায় করে বেড়াতে গিয়েছে।

রঘুনাথের একথায় ছোটমাসী বলল, তাহলে তো ভালই ছিল! কোন কথাই থাকতো না। মাঝে মধ্যে বউটাকে পিটতো।

কোথায়! আমি তো কিছু টের পাইনি।

আপনাকে বলে সব করবে না'ক! দেখুন তো এখন—ভবা কোথায় গেল?

দুপুরের দিকে ভবা না ফেরায় রঘুনাথের রান্না না বসায়—খোঁজ শুরু হল অগত্যা।

ভবার কাহিনী খুব সরল।

ভোরে উঠে চা না পেয়ে রঘুনাথ ছোটমাসীদের ঘর থেকে চা আর জিলিপি পেয়েছে। কেননা অনেকদিন ভবা আর তার বউ দা কুড়ুল কাঁধে ভোর ভোর জঙ্গলে চলে যায়। মেটে আলু, চই, শেকড় বাকড় এসব মাটি খুঁড়ে তুলে আনে। দু'টো বাচ্চা নিয়ে সংসার। তারপর সাইকেল রিক্সা চালিয়ে ভবার বেদম খিদে পায়। তাই খায় বেশী তাই ওদের নিজেদের খাবার যোগাড়ের একটা চেষ্টা সব সময়েই চলতে থাকে। ভোরে ওদের দেখতে না পেয়ে রঘুনাথ ভেবেছিল,—ওরকমই কোন খাবার যোগাড়ের অভিযানে বেরিয়েছে হোল ফ্যামিলি—বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে।

ভবা ফ্যামিলি নিয়ে শেষরাতে কেটে পড়েছে।

তার আগে সে তিনটি কাজ করেছে। সাইকেল রিক্সাটি হাফদামে বেচে দিয়েছে। বেচেছে টু-ইন-ওয়ান আর পোর্টেবল টি ভি.টা। ভবার ঘরে সার্চ করে জয়শ্রীর পায়ের একপাটি পাঁইজোর পাওয়া গেল। সঙ্গে নিয়ে গেছে রঘুনাথের স্টোভ আর প্রেসারকুকার। আর একটা গোল নেটের ডবল বেডের জাপানী মশারি। হোল ফ্যামিলি আরামে শুতে পারবে।

একে দুপুরে খাওয়া নেই। তারপর এই সর্বস্ব চুরি। রঘুনাথের মাথায় আগুন। কিন্তু শরীর বইছে না।

ছোটমাসী বলল, চান করে আসুন। এখানেই দু'টি খাবেন।

খেতে বসে জয়শ্রীর গিন্নিবান্নি ঢঙে এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া মন্দ লাগছিল না রঘুনাথের। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ছিল—যা যা এখানে করতে চেয়েছি,—সবই তো দেখছি পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াল। আমি আবার ভবার বাচ্চাদের এডুকেশনে মন দিচ্ছিলাম! ভবাকে করতে গেলাম কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড। আর

ঘুরে বেড়াবার রিক্সা সাইকেল ড্রাইভার ও নিল সোজাপথ। কত তাড়াতাড়ি মূলধন গড়েতোলা যায়! দাও বেচে টু-ইন-ওয়ান, টি. ভি সাইকেল রিক্সা।

খাস গোবিন্দপুর থেকে থানা পাঁচ মাইল। আন্দুল রোডের ওপর। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর দুপুর জয়শ্রীকে নিয়ে বাসে উঠল রঘুনাথ। বাজারে কেনাবেচা করে ব্যাপারীরা এ বাসে ফেরে। বড় বড় খালি ডালা। থানায় বড়বাবু সব শুনে বললেন, ওসব মাল এতক্ষণে হাওড়া মার্কেটে এসে হাতবদল হয়ে গেছে। কিছুতেই হদিশ পাবেন না। তবে সাইকেল রিক্সাখানা আমরা উদ্ধার করে দিতে পারি। লোকাল মার্কেটে কেউ কিনেছে। আপনি বাড়ি যান। সব লিখে দিয়ে যাবেন—

ফেরার পাঁচ মাইল শীতের দুপুরে বাসখানা যেন রাজহাঁস হয়ে ফিরলো। ভিড় নেই। গন্ধ নেই। শীতের পড়ন্ত বিকেল। ব্যাপার ঢাকা জয়শ্রীর পিঠটা বারবার সুন্দর লাগছিল রঘুনাথের।

জয়শ্রী বলল, ভবা যে এমন করবে ভাবা যায়নি।

কে-ই বা ভাল ব্যবহার করল জয়শ্রী। তোমাদের বিজন তো বসে বসে মাইনে পিটছে। কাজের নামে অষ্টরম্ভা!

ও তোমায় হিংসে করে।

কেন?

কারণ। কারণ আমি।

কারণ আমি—কথাটুকু বলার সময় জয়শ্রীর চোখের সাদার ভেতর সারাটা বিকেল চলকে উঠলো। সেখানে না ছিল দম্ভ—না ছিল বিনয়। শুধু ছিল এক সরল নিরুপায় স্বীকারোক্তি।

বাস থেকে নেমে বাড়ি ফিরে চা করলো জয়শ্রী নিজে। নিজেই ঘুরে ঘুরে চা দিল রঘুনাথকে। ছোটমাসীকে। ছোটমাসী চায়ে চুমুক দিয়ে দেখতে পেল—তার নতুন বাংলোর এক ছাদে টালি পড়েছে। এরপর চ্যাচারির দেওয়ালে বার্নিশ পড়বে। সে চায়ের স্বাদের সঙ্গে বাংলো হয়ে যাবার স্বাদও পেল জিভে। প্রশংসা করবে বলে সেনমশায়কে কী বলতে গিয়ে মুখখানা দেখে ছোটমাসী দমে গেল। চায়ের কাপ হাতে ফাঁকা বারান্দায় এমন করেই বসে আছে রঘুনাথ সেন,—যেন স্টিমারে উঠতে গিয়ে তার সব পয়সা নদীতে পড়ে গেছে। এমনকি টিকিটখানাও।

আপনি এত সুন্দর বাড়ি বানাতে পারেন,—এমনকি বাঁশ, টালি দিয়েও—আর আপনি সামান্য ও ক'টা জিনিসের জন্যে ওভাবে বসে থাকবেন না। আপনার ওভাবে বসে থাকা মানায় না মোটেই।

বাড়ি দেখে ডগমগ ছোটমাসীকে দেখতে ভালই লাগল রঘুনাথের। বলল, দেখুন—ও ক'টা জিনিসও যেতো না—যদি যার জন্যে আনা সে ব্যবহার করতো।

একথা শুনে ঝেঁঝে উঠলো জয়শ্রী। আমি কি সারাদিন সাইকেল রিক্সা চালিয়ে বেড়াবো?

চালিয়ে বেড়াতে বলিনি। চড়ে বেড়াতে বলেছিলাম। বলেছিলাম টি ভি-টা দেখো। টু-ইন-ওয়ানটা বাজিয়ে শুনো।

আমি কি বাচ্চা মেয়ে? আমাকে ওসব দিয়ে ভুলিয়ে রাখা?

আহা! তাই বলেছি? একটু বেড়াবে। একটু দেখবে। একটু শুনবে। তাই চেয়েছিলাম।

টি.ভি দেখতো আর গান শুনতো তো ভগার বউ। ওর কাছ থেকে চাইতে আমার লজ্জা করতো। আমি অত ছেদো নই।

কথাটা শুনে মনে মনে জয়শ্রীকে ভালই লাগল রঘুনাথের।

পুলিশ এল সদলবলে। জিপগাড়িতে। সন্ধের মুখে। এসে এক প্রস্থ চা খেয়ে প্রথমেই বলল ডাকুন আপনাদের বিজনকে।

বিজন তখনো সন্ধের আবছা অন্ধকারে একটা একটা ঘরে টালি বসাচ্ছিল।

অসময়ে ডেকে আনায় বিজন বারান্দায় উঠেই ঝন ঝন বেজে উঠলো। আমি একজন টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড আপনার। আমার নামেও ডাইরি করেছেন? এ কিন্তু ভাল হবে না -

রঘুনাথ আমতা আমতা করে বলল, পুলিশ যা যা জানতে চেয়েছে,—আমি লিখেছি। বলেছি। এতে অন্যায় কিসের। কে কে আমাদের কাছে কাজ করে তা বলতে হবে না।

এর ফল কিন্তু ভাল হবে না মিস্টার সেন—

যেই না কথা শেষ হয়েছে বিজনের, অমনি দারোগাবাবু বিজনকে একটি পাকা আধমনি চড় মেরে বলল, কী ভাল হবে তা আমরা বুঝবো। তুমিই তো বিজন। গত মাসে সরকার মাঠে জুয়োর আড্ডায় ধরা পড়েছিলে--চল—আগে তোমার বাড়ি সার্চ হবে—

আমার বাড়ি? বেশ তো চলুন।

এবার বিজনের গলা একদম নরম। দারোগাবাবু খাস গোবিন্দপুরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রঘুনাথকে বলল, এই পাকা ক্রিমিন্যালটিকে কাজে নিয়েছেন —আর লোক পাননি!

রঘুনাথ বলল, কাজ খারাপ করে না।

মাটির রাস্তা দিয়ে গাছপালার ছায়ায় সন্ধেবেলা যখন পুরো দলটা বিজনদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছাল, তখন সার্চের ইচ্ছে নষ্ট হয়ে গেছে রঘুনাথের। চারদিকের সব বাড়িতে ইলেকট্রিক এসেছে। শুধু বিজনদের মাটির বাড়িতেই কুপি জ্বলছে। ঢলে পড়া পচা গোলপাতার চাল। তাতে বিচি রাখার একটি পাকা লাউ। ভাঙা মরাই। ফাটা উঠোনের অর্ধেকটা ধুঁধুলের মাচায় ঢাকা।

রঘুনাথ পুলিশকে বলল, চলুন ফিরে যাই। কি হবে সার্চ করে।

আপনি চুপ করে থাকুন তো। পুলিশ দেখে বিজনের বিধবা মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। তাকেও পুলিশ ধমকে থামালো। রঘুনাথের মনে হল, ভাগ্যিস জয়শ্রী আসেনি। কেন মনে হল,—সে জানে না।

বেশি খুঁজতে হল না। সাইকেল রিক্সা পাওয়া গেল ধুঁধুলের মাচার নিচে। খড়ের তড়পা দিয়ে ঢাকা ছিল। রঘুনাথ তো অবাক। বলল, যাকগে যাক। পাওয়া গেছে যখন একে ছেড়ে দিন।

তা কি করে হয়? আপনি কমপ্লেন করেছেন। ডাইরি লিখেছেন।

ও পাতাটা ছিঁড়ে ফেলুন আপনারা।

হাসালেন। শিক্ষিত মানুষ হয়ে এসব কথা কি বলছেন? ডাইরি ছেঁড়া যায় না।

যাবার সময় পুলিশ বিজনকে নিয়ে গেল। বিজনের মায়ের সে কি কান্না। পুলিশ বলে গেল,—কাল ভোরে থানায় আসবেন। ভোরবেলাতেই ভবাকে ধরবো। পাতিহাল গাঁ কাছেই। জিপ যাওয়ার রাস্তা আছে। আসবেন কিন্তু।

সাইকেল রিক্সা ফিরে পাওয়ায় বিশেষ আনন্দ হয়নি রঘুনাথের মনে। পিটুনি খেয়ে বিজন বলছিল,—বেচে দেবার জন্যে ভবা রেখে গেছে। আর পুলিশ বলছে,—নিশ্চয় সস্তা দরে বিজন কিনেছে। রং পাল্টে রাস্তায় ছাড়বে।

বিজনের যে এমন হতশ্রী দশা, তা জানতো না রঘুনাথ। জানার পর তার নিজেরই অপরাধ লাগছে। বিজন একই সঙ্গে একজন প্রেমিক, দরিদ্র, চোর, বদরাগী আর জুয়াড়ি। তার এমন হাটে হাঁড়ি ভেঙে, দেওয়া যেন পুলিশের উচিত হয়নি। কাজটা যেন পুলিশেরই অন্যায়।

রাতে রঘুনাথের মুখে সব শুনে যখন জয়শ্রী বলল, বিজনদা চোরও তাহলে!

তখন জয়শ্রীকেই নিষ্ঠুর লাগল রঘুনাথের। বলল, কাল সকালে ভবার গাঁয়ে যেতে হচ্ছে পুলিশের সঙ্গে। কী ঝামেলা। কেন যে ডাইরি লিখতে গেলাম!

পুলিশ না হলে বিজনদা কাবু হতো ভেবেছো? পিটুনির চোটে ভবার মতলবও ফাঁস করে দিয়েছে।

অতটা কঠিন হওয়া তোমায় মানায় না জয়শ্রী।

কঠিন সহজের কিছু নেই এর ভেতর। চুরি গেছে—পুলিশ ডেকেছো। এখন সব ফেরৎ পাচ্ছো। এই তো ইজি পিকচার। এই আমি বুঝি। কাল সকালে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

পরদিন ভোরবেলা থানায় যাবার সময় বাস স্টপে চা খেতে খেতে শীত মালুম হল রঘুনাথের। নিজে গুছিয়ে চাদর জড়িয়ে জয়শ্রীকেও ভাল করে জড়িয়ে দিল। দিয়ে বলল, আমরা যেন ভোরবেলা দূরের মন্দিরে পুজো দিতে চলেছি!

পুলিশ যে এত তাড়াতাড়ি চোর ধরে জানতাম না।

ছোট্ট জায়গা। চোর পুলিশ—সবাই সবাইকে চেনে জয়শ্রী। আজ গিয়ে বিজনকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কেন ?

বিজনকে আগের মত অত খারাপ আর লাগছে না আমার।

তোমার মেয়ে যে আমার বাবার মামলা নিয়েছিলেন—তারাও তো কেউ খারাপ নন।

বসে বসে রঘুনাথ বলল, পৃথিবী জায়গাটা আসলে খারাপ নয়। মানুষগুলোও কেউ খারাপ নয়।

বিজনদা যে ধমকে টাকা চাইতো। সেই বেলা ?

বিজনও খারাপ নয় জয়শ্রী। ওর ঘরদোরের যা দশা। বুড়ি মা। গোল-পাতার চাল পচে গেছে। তার ভেতর ধুঁধুল মাচার তলা থেকে সাইকেল রিক্সাটা বেরোতেই পুলিশ অ্যায়সা এক চড় কষালো—বিজন গিয়ে ছিটকে পড়ল গোয়ালের কাছে—

আজ এসব দেখতে হবে নাকি আমায় ? আমি একদম দেখতে পারি না এসব।

আমিও পারি না জয়শ্রী। এখন বুঝি—পৃথিবীর দু'এক জায়গায় ছবির মত কমপ্লেক্স গড়ে তোলা যায়। কিন্তু পৃথিবীটাকে আগাগোড়া ছবি করে তোলা যায় না। এর যে মস্ত গণ্ডগোল জয়শ্রী।

থানায় নেমে পড়তেই হাবিলদার এগিয়ে এসে বলল, মেজোবাবু আজ যাবেন। আপনাদের জন্যে বসে আছেন।

ঘরে ঢুকতেই মেজোবাবু বললেন, আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তো ?

তা পারবো। আমাদের একটা কথা ছিল।

কি ?

ডাইরিটা আমি উইথড্র করতে চাই।

সে কি ? তা হয় নাকি। ফোর্স রেডি। চালান সই করে মালখানা থেকে বিশ রাউণ্ড অ্যামুনিশন নেওয়া হল। যদি কোন রেজিস্টান্স হয় পাভিহালে—। চলুন তো। পরে দেখা যাবে।

রোদ ওঠার মুখে মুখে জিপগাড়ি এসে দাঁড়াল ভবার উঠোনের মুখে। গাঁয়ের মানুষই রাস্তা চিনিয়ে এনেছে। মেজোবাবু বলল, লোকটা বড় সরল চোর। দেখুন রঘুবাবু—আপনার জিনিসপত্র থেকে যে টাকা পেয়েছে- তাই দিয়ে কালই গাই কিনেছে। গাঁয়ের লোকই বলছে। ওই যে সেই গাই—হাঘরে লোক গাই কেনার টাকা পাবে কোত্থেকে রাতারাতি -

সামান্য জমিতে কিছু মরা ঢ্যাড়স গাছ। জলের অভাবে জ্বলে গেছে। কাৎ হওয়া মাটির বাড়ির ছাদে কোনক্রমে খড়ের চাল। একটা গাইগরুর গলায় নতুন

দড়ি। তার মুখের সামনে জাবনা দেবার নতুন চাড়ি। আর সিড়িজে গাইটার গলায় আমপাতার মালা। কপালে সিঁদুর।

জয়শ্রী চাপা গলায় বলল, আমি তাকাতে পারছি না। তাড়াতাড়ি ফিরে চল।

আমিও পারছি না জয়শ্রী। আমার শরীর খারাপ লাগছে।

আসলে দু'জনই একটা সুখী সংসার গড়ে তোলার প্রাথমিক আয়োজন আমপাতার মালা দেখেই বুঝেছে। বিশেষ করে এই দগ্ধানো ট্যাড়স ক্ষেতের সামনে। ঢসে পড়া মাটির ঘরের পায়ের কাছটায়।

জিপগাড়ি ভর্তি পুলিশ দেখেই ভবা সপ রবারে এসে দাঁড়াল। সবে ওদের ঘুম ভেঙেছে। কাল গাই কেনা নিয়ে নিশ্চয় উৎসব গেছে এই ভিটেয়। এখন গাইগরুর দড়িটা অব্দি ভবার হাতে।

কোথায় যেতে হবে বলেন।

ভবা বলছিল আর নিষ্পলক চোখে জিপে বসা রঘুনাথ আর জয়শ্রীকে দেখছিল। জয়শ্রী বুঝতে পারছিল,—ওরা অন্য গ্রহের লোক। আর সে নিজে আর রঘুনাথ আরেক গ্রহের মানুষ। হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে মেজোবাবুর জিপগাড়ির সামনে।

রঘুনাথ বেশ দৃঢ় গলায় বলল, শুধু শুধু ওদের এতটা পথ হাঁটাবেন কেন?

তাহলে কী ওরা গাইগরু সমেত জিপে চড়ে থানায় যাবে!

তা বলছি না। আমি তো থানায় গিয়ে কেস উইথড্র করে নিচ্ছি।

সে কি করে হয়। ক্রিমিন্যাল নিজে সব স্বীকার করছে।

ওর কী আছে যে স্বীকার করবে মশাই। ওই তো ঘরবাড়ি। না হয় আমার জিনিসপত্র বেচে একটা গাই কিনেছে। রুগ্না স্ত্রী। রিকেটি দুটো বাচ্চা—

বলছেন?

আমি তো গোড়া থেকেই বলছি।

আপনাদের মত লোকরাই আমাদের হয়রান করান। নিন—গাড়িতে উঠুন।

আর যেতে হচ্ছে না দেখে গরুর দড়ি হাতে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ভবা। জিপ ব্যাক করার সময় জয়শ্রী গলা তুলে বলল, একদিন এসো। এতদিনের সম্পর্ক ক'দিনে ভুলে গেলে ভবা—

ভবা রীতিমত অবাক হয়ে চমকে চেঁচিয়ে বলল, নিশ্চয় যাবো। এই হাটবারেই যাবো দিদিমনি—

জিপের ভেতরটা অন্ধকার। অথচ বাইরেই পথের ওপর কাঁচা রোদ্দুর। চলন্ত গাড়ির দুলুনির ভেতর জয়শ্রী আলগা করে রঘুনাথের হাতের ওপর হাত রাখল।